মুসলিম বাংলা-সাহিত্য ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক

মুসলিম বাংলা-সাহিত্য

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক



মুসলিম বাংলা-সাহিত্য

[বাংলা-সাহিত্যে মুসলিম অবদানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস]

Md. Shafiul Alam

পড়া শেষ করলাম
29-01-2025

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক

মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

পঞ্চম মুদ্রণ
জুলাই ২০২১
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২-৪৭১১১৭৪৯, ০১৯৩৮২৬১৬৪৯
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com
ওয়েবসাইট : mowlabrothers.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এম বি প্রিন্টার্স
২৮ টিপু সুলতান রোড ওয়ারী ঢাকা ১১০০

দাম
তিনশত টাকা মাত্র

ISBN 984 410 100 X

MUSLIM BANGLA SAHITYA : by Dr. Muhammad Enamul Huq. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka Three Hundred only.

উৎসর্গ

(একখানী 'রুবীয়া'-তে)

কাদির, তোমার কদর করিনি, ভাবিনি তোমায় কবি;
তোমার মুকুরে আমার মূরতি ফেলিত মদির-ছবি।
সে-মোহিনী-মায়া-মথন-বেদনে আঁকিনু আঁখির লোরে;
আমার বেদনা তোমার হইয়া ভাতুক প্রভাত-রবি॥

চট্টগ্রাম
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫

তোমার বৈদগ্ধ্য-বিমুগ্ধ
মুহম্মদ এনামুল হক

ভূমিকা

জাতির সাংস্কৃতিক-ইতিহাসের যে-দিক এই পুস্তকে উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এতকাল একরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে মশাল-বর্তিকার (torch-light) সাহায্যে এই অন্ধকারে কেহ কেহ আলোকপাত করিবার চেষ্টা পাইলেও, আমাদের এই সাংস্কৃতিক-কক্ষে কখনো কোন স্থায়ী প্রদীপ প্রজ্বালিত হয় নাই; বিজলী-বাতি বসাইবার কথা না বলাই ভালো।

আমি ইহার দ্বারদেশে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলাম মাত্র। কেহ ভুল করিয়া জাতির এই সাংস্কৃতিক-কক্ষের দিকে পদক্ষেপ করিলে, তিনি অন্ততঃ কক্ষটির প্রবেশ-পথ দেখিতে পাইবেন, ইহাই আমার একমাত্র আশা। কেহ যেন মনে না করেন, আমি এই প্রদীপের সাহায্যে জাতির এই অন্ধকার সাংস্কৃতিক-কক্ষ আলোকিত করিয়াছি। ইহাকে পূর্ণরূপে আলোকময় করিয়া তুলিতে আরও দুই যুগ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

বাংলার খ্যাতনামা মৌলিক গবেষক মৌলবী আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদই আমার এই মাটির প্রদীপের একমাত্র না হইলেও, মূল নির্মাতা। তাঁহার নির্মিত দীপ-বর্তিকা আজ প্রজ্বলিত হইয়াছে, এই দৃশ্যটি যদি তিনি জীবিত থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিতেন, তবে কতখানি আনন্দিত হইতেন, বলিতে পারি না। আমি দিব্য-দৃষ্টিতে আজ তাঁহার আনন্দের মাত্রা অনুধাবন করিয়া, সাশ্রুনয়নে তাঁহার আত্মার 'মাগ্‌ফিরাৎ' কামনা করিতেছি।'

এই প্রসঙ্গে আমি বন্ধুবর জনাব আবদুল কাদির সাহেবের কথাও স্মরণ করিতেছি। তাঁহার অবিরাম তাগিদ ও পত্রাঘাতে জর্জরিত হইয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত না হইলে, মরহুম আবদুল করীম সাহিত-বিশারদের নির্মিত প্রদীপ কখনও জ্বালাইতে পারিতাম কি না, জানি না; হয়তো বিগত ২৫ পঁচিশ বছরের সাধনাই ব্যর্থ হইত। এই কথা স্মরণ করিয়া গ্রন্থটি তাঁহারই নামে উৎসর্গ করিলাম।

এই পুস্তকটির মুদ্রণ-কার্যে ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে যাঁহারা বিশেষ যত্ন লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'মাহে-নও' অফিসের জনাব কবি তালিম হোসেন, জনাব কবি মাহফুজউল্লাহ, জনাব ইজাব উদ্দীন আহমদ ও জনাব এনায়েত মওলা সাহেবানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের এই কাজ ও কষ্ট স্বীকার শুধু চাকুরির খাতিরে বলিয়া বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। বিশেষ করিয়া 'নাম-সূচী' প্রণয়নে জনাব কবি তালিম হোসেন সাহেব যে-কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কবি-জনোচিত না হইয়া,

পণ্ডিত ব্যক্তির পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। আমি ইঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বলিতে কি, এই পুস্তকের সমস্ত দোষ আমার এবং সমস্ত গুণ ও শোভা 'মাহে-নও' অফিসের প্রবীণ ও তরুণ বন্ধুদেরই।

অতঃপর, প্রাঠকের হাতে ইহার বিচার-ভার সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

চট্টগ্রাম
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫

নিবেদক—
মুহম্মদ এনামুল হক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্‌-তুর্কী যুগ

(প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ১২০০ খ্রী:)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ ও বাঙালী

বাংলা অতি প্রাচীন দেশ। ঋগ্বেদের (আনুমানিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর) শাখা 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে 'বঙ্গ' নামে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গভূমি 'বঙ্গ', 'পুণ্ড্র', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'সুহ্ম', 'ব্রহ্ম' 'তাম্রলিপ্ত' 'সমতট', প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক এই জনপদগুলিকে 'গৌড়' নামে একতাবদ্ধ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। শশাঙ্কের পর হইতে 'পুণ্ড্র', 'গৌড়' ও 'বঙ্গ'—এই তিন জনপদ যেন বাংলাদেশের সমার্থক হইয়া উঠে। 'বঙ্গ' নামে বাংলার বিভিন্ন জনপদকে একতাবদ্ধ করিয়া তুলিবার কাজ হিন্দু আমলে যে সাধিত হয় নাই, ইহা একরূপ সর্বস্বীকৃত মত। এই কাজ সাধিত হইয়াছিল মুসলমান আমলে।

বঙ্গে তুর্কী শাসন-কালে ইহার সূত্রপাত হয় এবং মুঘল-আমলে আকবরের শাসনকালে ইহার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। সম্রাট আকবরের সময়েই সমগ্র বঙ্গদেশ 'সুবহ্‌-ই-বঙ্গালহ্‌' নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ আমলে আসিয়া ইহার বিশাল আয়তন (বিহার ও উড়িষ্যাসহ) কতকটা খর্বীকৃত হইয়া বাংলাদেশ সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। অতএব, যে 'বাংলাদেশ' বলিতে আমরা নিজেদের দেশ বলিয়া মনে করি, তাহার স্রষ্টার কৃতিত্ব মুসলমানদেরই প্রাপ্য।

এই প্রসঙ্গে 'বাংলা' নামের উৎপত্তির কথাও জানিয়া রাখা ভাল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা শশাঙ্কের (খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) সময় অবধি বাংলাদেশ 'বঙ্গ', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'পুণ্ড্র' প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত জনপদের অধিকাংশের নাম যে স্থানজ্ঞাপক না হইয়া গোষ্ঠিজ্ঞাপক ছিল, তাহা প্রাচীনতম সংস্কৃত-সাহিত্যের একাধিক সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারা যায়। এই সমস্ত সংস্কৃত-সাহিত্যে 'বঙ্গাঃ', 'গৌড়াঃ', 'রাঢ়া', 'পুণ্ড্রাঃ' প্রভৃতি গোষ্ঠীবাচক বহুবচন শব্দ দেশ বুঝাইবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ কথা সর্ববাদীস্বীকৃত যে, 'বঙ্গাঃ' অর্থে 'বঙ্গজনাঃ', 'গৌড়াঃ' অর্থে 'গৌড়জনাঃ' ইত্যাদি বুঝায়। এখন দেখা যাইবে যে অঞ্চলে 'বঙ্গ'-গোষ্ঠীর মানুষ বাস করিত, তাহাই তখন 'বঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং, সংস্কৃত ভাষার 'বঙ্গ' শব্দ মূলতঃ 'বং' বা 'বঙ' গোষ্ঠীর নাম।

এই 'বং'-গোষ্ঠীর নাম হইতেই 'বাংলা', 'বাঙলা', 'বাঙ্গলা', 'বঙ্গালা' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি। 'আইন-ই-আকবরী'তে আবুল ফজল 'বাংলা' শব্দের যে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন, নানা কারণে তাহাই ঠিক ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে 'বং' শব্দের সহিত তদ্‌ভব 'আল্' [সংস্কৃত 'আলি' (অল ইন্, ক); এই 'আলি' শব্দ স্বরতাত্ত্বিক নীতিতে 'ই'-স্বরের অপিনিহিত অবস্থায় 'আইল্' রূপে পূর্ববঙ্গে এখনও বিদ্যমান] শব্দ যুক্ত হইয়া 'বংগাল্' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। ফারসী ঢঙে দেশ বুঝাইবার জন্য এই 'বংগাল্' শব্দ 'বন্‌গালহ্' হইয়া (যেমন–মুল্‌ক-ই-বন্‌গালহ–) এখন 'বাংলা' রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে 'আল্' <সংস্কৃত 'আলি' (জমিতে জল বাঁধিয়া রাখিবার বাঁধ) দিয়া বাঁধা 'বং'-গোষ্ঠীর বাসভূমি। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে বেশ ভালো করিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে যে, 'বং'-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বাসভূমি বাংলাদেশ বর্তমান ভাগীরথী (প্রাচীন গঙ্গার বঙ্গবাহিনী ধারা) নদীর পূর্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া আসামের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল অঞ্চলই খর্বীকৃত হইয়া বর্তমান 'পূর্ব-বাংলা' বা 'পূর্ব-পাকিস্তান' গঠিত হইয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলিম অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত– এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেই বাংলাভাষা ও বাঙালী জনসমষ্টির মূল কাঠামো গড়িয়া উঠে। এই সময়ের বঙ্গদেশ এক বিশাল ভূ-ভাগ। তাহার সীমা বর্তমান আরাকানের পশ্চিম ভাগ এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে সমুদ্রবিধৌত সমগ্র অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, এই বিশাল ভূখণ্ডের জনসমষ্টি প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রধানত আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) ও আলপাইনীয় (Alpinus) এই দুই প্রধান জনসমষ্টির সংমিশ্রণ।

উক্ত দুই জনসমষ্টির সহিত প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মঙ্গোলীয় (Mongoloid) জনসমষ্টিভুক্ত মানুষের রক্তেরও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। বাংলার কোচ, পলিয়া, রাজবংশী, চাকমা, জুমিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিভুক্ত মানুষ। এখনও তাহাদের সংখ্যা বাংলায় খুব কম নহে।

ইহার পর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে বাঙালীর রক্তে এক নূতন মানবগোষ্ঠীর রক্ত মিশিতে লাগিল। এই সময় হইতে সেমীয় (semitic) গোত্রের লোক বাংলায় আসিতে থাকে। খলীফা হারুনু-র-রশীদের (৭৮৬-৮০৯) একটি মুদ্রা রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়া এই তথ্য প্রকাশ করিয়া দিতেছে। দেখা যায়, সেমীয় গোত্রের আরবেরা বাংলায় ধর্ম ও পণ্য প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন; আমীর বা সুলতানের অধীনে চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাহাদের একটা ক্ষুদ্র শাসন-ব্যবস্থাও (Principality) স্থাপিত হইয়াছে। সুলতান বায়িজীদ বিস্‌তামী (মৃত্যু ৮৭৪ খ্রী:), মীর সৈয়্যিদ সুলতান মাহমুদ মাহী-সওয়ার (১০৪৭ খ্রী:), শাহ মুহম্মদ সুলতান রুমী (১০৫৩ খ্রী:), বাবা আদম শহীদ (১১১৯ খ্রী:), শাহ নিয়ামতুল্লাহ্ বুৎশিকন প্রভৃতি দরবেশ বাংলাদেশে ধর্ম প্রচার করিতেছেন।

এই পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত কতিপয় ইংরেজী শব্দের জন্য যে বাংলা পারিভাষিক শব্দ গৃহীত হইল, তাহা এইরূপ : philology = ভাষাতত্ত্ব, Nation=জাতি, people = জনসমষ্টি, Race = গোত্র; Caste = বর্ণ, Tribe = গোষ্ঠী, Anthropology = নৃতত্ত্ব।

সেমীয় গোত্রের লোককে অনুসরণ করিয়া আফ্রিকার নেগ্রিটো (Negrito) রক্তবাহী হাবশীরাও অতঃপর এদেশে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জনকয়েক হাবশী সুলতান বাংলাদেশে রাজত্বও করেন। দিল্লী ও আগরার অনুকরণে এদেশে হাবশী প্রহরী রাখার প্রথা চালু হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীরও বহু আগে। ইহারাও বাঙালী রক্তের সহিত নেগ্রিটো রক্ত মিশাইয়া দিয়াছে। ফলে বাঙালীদের মধ্যে এখনও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, প্রশস্ত নাসা, কোঁকড়া চুল ও পুরু উল্টা ঠোঁটের মানুষ দেখিয়া নেগ্রিটো রক্তের কথা মনে পড়ে।

নৃতাত্ত্বিক পরিভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া সহজভাবে ভাবিতে গেলে স্বীকার করিতে হয়, আধুনিক বাঙালী অনার্য, আর্য, মঙ্গোলীয়, সেমীয়, নিগ্রো প্রভৃতি নানা গোত্রভুক্ত মানবের রক্ত-সংমিশ্রণজাত এক বিচিত্র জনসমষ্টি (People)। এই বিচিত্র রক্তসঙ্কর জনসমষ্টির ভাষার আধুনিক নাম 'বাংলা'।

বাংলাভাষার আগে বাংলাদেশে
অসুর ভাষা বা অষ্ট্রিক ভাষা ছিল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা-ভাষা

আমরা দেখিয়াছি 'বাঙালী' একটি রক্তসঙ্কর জনসমষ্টি। এই জনসমষ্টির মৌখিক ও লৈখিক রূপের আধুনিক নাম 'বাংলা-ভাষা'। আধুনিক বাঙালীর পরীক্ষা ও নিরীক্ষার দ্বারা বাঙালীর উৎপত্তি নির্ণয় করা হইয়াছে, আধুনিক বাংলা-ভাষার বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তেমনই এই ভাষার ব্যুৎপত্তি ও উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে। ফলে, আমরা দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি যে, বাঙালীর রক্ত-সাঙ্কর্যের ন্যায় ভাষা-সাঙ্কর্যও একটি বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান বাংলা-ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে বাংলাদেশে কিরূপ ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার কোন মুখ্য বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, গৌণ বা পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নাই।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায়, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা 'অসুর-ভাষা'-ভাষী ("অসুরাণাং ভবেৎ বাচা-গৌড়-পুণ্ড্রোদ্‌ভবা সদা")। তখন 'গৌড়' বলিতে পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ বঙ্গকে এবং 'পুণ্ড্র' বলিতে উত্তর-বঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিম আসামকে বুঝাইত। সুতরাং, 'অসুর-ভাষা'-ভাষী লোকেরা আসামের কিয়দংশ লইয়া সমগ্র প্রাচীন বঙ্গের লোক। এখনও কোল-মুণ্ডা-গোষ্ঠীর বুলির মধ্যে 'অসুর' বুলি অন্যতম। সুতরাং, এই 'অসুর-ভাষা' যে 'অষ্ট্রিক'-বুলি, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান বাংলা-ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্বে আমাদের দেশে যে এই 'অসুর-ভাষা' বা 'অষ্ট্রিক'-বুলি প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই 'অসুর-ভাষা'র বা 'অষ্ট্রিক'-বুলির কিছু শব্দ ও বাক্‌রীতি এখনও আমরা বাংলা-ভাষায় ব্যবহার করি; যথা—

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ
কুড়ি ('বিশ' অর্থে)	দ্রবিড়– 'কুড়ি'
পন ('চারি' অর্থে)	সাঁওতালী– 'উপুন' 'পুন' বা 'পন'
গণ্ডা ('চারি অর্থে)	দ্রবিড়– 'গণ্ড'
বঙ্গ (দেশের নাম)	দ্রবিড়– 'বং' (গোষ্ঠীর নাম)
ঢেঁকি (ধান ভানিবার যন্ত্র)	মুণ্ডা– 'ঢেস্কি'
মোটা ('স্থূল' অর্থে)	মুণ্ডা– 'মোটো'

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ
দা ('দহ'–ঝিনাইদা, বাঁশদা)	কোল– 'দা' বা 'দাক' ('জল' অর্থে)
কপোতাক্ষ (নদীর নাম)	কোল– 'কবদাক' (সংস্কৃত 'কপোতাক্ষ')
দামোদর (নদীর নাম)	কোল– 'দামদাক'
পোদ (নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর উপাধি)	দ্রবিড়– 'পুণ্ড্র'

এতদ্ব্যতীত, কিছু-কিছু বাংলা বাক্‌রীতি (যেমন– 'চার' সংখ্যার এক মান কিংবা 'কুড়ি' সংখ্যার এক মান ধরিয়া গণনার রীতি), শব্দ রচনা (যেমন– ঝাঁ ঝাঁ, খাঁ-খাঁ প্রভৃতির ন্যায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ) ও ব্যাকরণ ব্যবস্থা (যেমন– নানা অর্থে দ্বিরুক্তির ব্যবহার) প্রভৃতিও বাংলা-ভাষার অনার্য প্রভাব-সূচক। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আজও কিছু-কিছু অনার্য আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, বাংলা-ভাষায় বিদেশী (অর্থাৎ আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী প্রভৃতি) শব্দের সংখ্যা শতকরা মোট ৮ আট। অবশ্য খাস সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা শতকরা ২৫ পঁচিশ হইতে ৩০ ত্রিশের বেশী নহে; বাকিগুলি প্রাকৃত বা অপভ্রংশ। কি করিয়া প্রাচীন বাংলার 'অসুর-ভাষা' এমনভাবে তলাইয়া গেল, সে ইতিহাস স্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলেও ভালো করিয়াই অনুমান করা যায়।

বগুড়ার মহাস্থান-গড়ে প্রাপ্ত শিলালিপিই প্রাচীন বাংলায় আর্য ভাষার একমাত্র অভিজ্ঞান। ইহা প্রাচীন মাগধী বা প্রাচ্য প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা কালক্রমে 'প্রাকৃত' নামে পরিচিত এবং আমরা বর্তমানে যে নানা শ্রেণীর ও ধরনের প্রাকৃতের সন্ধান পাই তাহাতে পরিণত হইয়াছিল। এই 'প্রাকৃত-ভাষা' মগধে যে রূপ ধারণ করে, তাহাকেই 'প্রাচ্য-প্রাকৃত' বলা হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে দণ্ডী যে-ভাষাকে 'গৌড়ী-প্রাকৃত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই 'মাগধী-প্রাকৃত' বা প্রাচ্য-প্রাকৃতেরই প্রাচ্যতর রূপ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাবিদগণ নিঃসন্দেহভাবেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, আধুনিক বাংলা-ভাষা 'মাগধী-প্রাকৃত' তথা 'গৌড়ী-প্রাকৃতেরই' বিবর্তিত রূপ। ইহা যে সরাসরিভাবে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নহে, বর্তমান বাংলা-ভাষাই তাহার প্রধান প্রমাণ।

যে প্রাকৃত-ভাষা হইতে সংস্কৃত-ভাষার উদ্ভব এবং উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী প্রভৃতি পাক-ভারত উপমহাদেশের উত্তর ও পশ্চিম এলাকাসমূহের যাবতীয় ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ, সেই প্রাকৃতের পূর্বী-রূপ হইতেই বাংলা-ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হইয়াছে। বর্তমান বাংলা-ভাষায় সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব যেমন অত্যন্ত নগণ্য, তেমনই অত্যন্ত আধুনিকও বটে।

বাংলা ভাষার ইতিহাস

-শৌরসেনী অপভ্রংশ ও
-মাগধী অপভ্রংশ —

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা-ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন

কোনো ভাষার জন্ম-তারিখ ঠিক করিয়া বলা যায় না; কেননা দিনক্ষণ ঠিক করিয়া কোন ভাষার জন্ম হয় না। ভাষার সৃষ্টি হয় ধীরে ধীরে,— কাল, দেশ ও পাত্রগত বিবর্তন-ধারার ক্রমিক অনুসরণে। সুতরাং, বাংলা-ভাষার জন্মতারিখও বলা যাইতে পারে না। তবে, প্রত্যেক ভাষার একটা সৃজ্যমান কাল থাকে; তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী একটা অতি দীর্ঘ সময়। খ্রীষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষা স্থায়িরূপ লাভ করিয়াছিল। এই চারিশত বৎসরই বাংলা-ভাষার সৃজ্যমান কাল। এই সময়ের একেবারেই গোড়ার দিকে বঙ্গদেশে 'সংস্কৃত' ছাড়া আরও দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল,— তাহার একটি 'সৌরসেনী-প্রাকৃত' বা 'সৌরসেনী-অপভ্রংশ' আর একটি 'মাগধী-প্রাকৃত' বা 'মাগধী-অপভ্রংশ'। এই 'মাগধী-অপভ্রংশেরই' বিবর্তিত রূপ 'বাংলাভাষা'। বাংলা-ভাষার এই সৃজ্যমান অবস্থার সামান্য নমুনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই নমুনাটুকুর নাম 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়'; অর্থাৎ জীবনে কি আচরণ করিতে হইবে, আর কি আচরণ করিতে হইবে না, তাহার নির্ধারণ।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চর্যাপদগুলির ভাষা সৃজ্যমান কালের বাংলা-ভাষা। ইহাদের ব্যাকরণ রীতি ও বাক্-ভঙ্গী একেবারেই বাংলা; কেননা এখনও বাংলা ভাষায় এই সমস্ত ব্যাকরণ-রীতি ও বাকভঙ্গী সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। চর্যাপদ-গুলিতে ব্যবহৃত কিছু কিছু প্রবাদ-বাক্যও বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যে অদ্যাবধি চালু আছে। এতদ্ব্যতীত নদী, নৌকা, খেয়াঘাট, পাটনী প্রভৃতির চিত্র এই পদগুলিতে যেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছবিই সহজে মনে পড়ে। পদগুলির অধিকাংশই যে বাংলার অধিবাসী সাধকের (সিদ্ধার) রচনা তাহা বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না। পদগুলির বিষয়-বস্তু স্পষ্টতঃই ভক্তিমূলক; বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই পদগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, তদুপরি ইহাদের সাহিত্যিক মূল্যও নিতান্তই ফেলিয়া দিবার নহে। এই পদগুলির কয়েকটিতে কথার তুলিকায় যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রায় এক হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী চিত্র হইলেও, অদ্যাবধি কম উপভোগ্য নহে। উদাহরণ স্বরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"উঁচা উঁচা পাবত, তহিঁ বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিণ, গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত শবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহারী।
তোহেরি নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী॥

নানা তরুবর মৌলিল রে, গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী শবরী এ বন হিণ্ডই, কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা শবরো, মহাসুহে সেজি ছাইলী।
শবরো ভুজঙ্গী নৈরামনি দারী, পেম্ম রাতি পোহাইলী॥

আধুনিক বাংলায় পরিবর্তিত

উঁচু উঁচু পর্বত,— তায় শবরী বালিকা বাস করে,
সে ময়ূর-পুচ্ছ পরিহিতা, তাহার গলায় গুঞ্জার মালা।
হে উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল গোহারি করিও না,
তোমার নিজ গৃহিণী 'সহজ সুন্দরী' নামে পরিচিতা।
ওরে! নানা তরুবর মুকুলিত হইল, গগনে
তাহাদের ডাল লাগিল;
শবরী বালিকা এই বনে একাকিনী ভ্রমণ করে,
সে কর্ণে কুণ্ডল ও বজ্রধারিণী।
তিন ধাতুর খাট পড়িল, হে শবর তুমি মহাসুখে শয্যা বিছাইলে,
শবর ভুজঙ্গ (সদৃশ) আর নৈরাত্মা দারা (স্ত্রী তুল্য), উভয়ে
প্রেমে রাত্রি পোহাইল।

পদটির গূঢ়ার্থ যাহাই হউক, ইহাতে পর্বতবাসিনী শবরী-বালিকার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আজও কোন পার্বত্য-বালিকার ছবি বহন করিতেছে। মুকুলিত তরু-সমাকীর্ণ বনানীর শ্যামল প্রচ্ছদপটে শবরী বালিকার এই ছবি কল্পনার নয়নে দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। এইরূপ একটি পার্বত্য বালিকার ছবি ক্যামেরায় ধৃত হইলে, আজও সকলে তাহা উপভোগ করিত। এমন চিত্র-গৌরবে গরীয়ান পদ 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ে' একক নহে।

কতকগুলি চর্যাপদে শৃঙ্গার বা আদি-রসও দেখা যায়। এই রস চিরকালই সাহিত্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মাধুর্য সিঞ্চন করিয়াছে। বিশেষতঃ চর্যাপদগুলি গান। গুঞ্জরী, বঙ্গাল, পটমঞ্জরী, বরাড়ী, দেশাখ, ধানশী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীতে এইগুলি গীত হইত। চর্যাপদগুলির বিষয়বস্তু যাহাই হউক, এইগুলি গানের বা সুরের মাধ্যমে শ্রোতার মনে রস পরিবেশন করিয়াছে।

চর্যাপদগুলির সাহিত্যিক মূল্য আরও একদিক হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই দিকটি হইল, পরবর্তী সাহিত্যে চর্যাপদের প্রভাবের দিক। সে প্রভাব যথেষ্ট ও প্রচুর। চর্যাপদগুলি পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এই কয় প্রকারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে :—

(ক) চর্যাপদগুলি বাংলার পরবর্তী সাহিত্যের ভাষা দিয়াছে। চর্যাপদের ভাষার ছাপ পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাহার প্রধান প্রমাণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই পুস্তক আবিষ্কৃত না হইলে চর্যাপদ যে সৃজ্যমান ভাষার যুগে রচিত হইয়াছিল, এই কথা শুধু কল্পনার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত।

(খ) চর্যাপদগুলিতে কিছু কিছু হেঁয়ালীপূর্ণ কথাও ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলার আউল, বাউল, মারফতী ও মুর্শিদা গানের হেঁয়ালীপূর্ণ কথায় ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষণীয়। এই ব্যাপারকে চর্যার প্রভাব বলিয়া মনে করার কারণ আছে।

(গ) চর্যাপদগুলি গান, অর্থাৎ গানের মাধ্যমে কথায় ভাবের প্রকাশ। বাংলা-সাহিত্যে এই যে গানের ধারা বহিল, তাহা বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

(ঘ) চর্যাপদগুলি পরবর্তী বাংলা কবিতাগুলিতে গঠনের দিক হইতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলা কবিতা আজও সে প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই। আমরা দেখিতে পাই, চর্যাপদে ব্যবহৃত ছন্দ পরবর্তী কালে পয়ার ও লাচাড়ি ছন্দে বিবর্তিত হইয়াছে। অধিকন্তু, এই গানগুলি অন্ত্যানুপ্রাস ও ভণিতাযুক্ত। চর্যাপদের বহু পরে রচিত বাংলাঘেঁষা সংস্কৃত-কাব্য 'গীতগোবিন্দ' ব্যতীত আর কোন সংস্কৃতকাব্যে চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাস ও গানের শেষে ভণিতা নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগের সমস্ত বাংলা-কাব্যে চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাস ও পদের শেষে ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে।

এইভাবে চর্যাপদগুলি বাংলা-সাহিত্যে একক আসনের অধিকার লাভ করিয়াছে। এই পদগুলি আবিষ্কৃত না হইলে, বাংলা-ভাষা একটা ভুঁইফোড় ভাষায় পরিণত হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তুর্কী আমল (১২০১-১৩০৫)

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্কী-আমলের রাজনৈতিক পটভূমি

বঙ্গে হিন্দু শাসনের অবসান ও মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয় মোটামুটি ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে। যাঁহারা এদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারা ছিলেন জাতিতে তুর্কী, ধর্মে মুসলমান ও সংস্কৃতিতে মুখ্যতঃ পারসিক। তাঁহারা ঘরে তুর্কী-ভাষা বলিতেন, রাজনীতিতে ফারসী-ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবী-ভাষা চালাইতেন। সংস্কৃতির দিক হইতে বঙ্গে মুসলিম তুর্কীর অবস্থা ছিল মোটামুটি এইরূপ।

বাংলার শেষ রাজা হিন্দু না হইলেও, অন্ততঃ সমগ্র বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। তাঁহার সভায় ধোয়ী, জয়দেব, উমাপতি ধর প্রভৃতি কবি এবং হলায়ুধ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নানা পণ্ডিত ও কবির সমাবেশে তাঁহার রাজধানীতে যে সংস্কৃত ভাষা-চর্চার ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহা জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে'র মাধ্যমে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেও বাংলা-ভাষা চর্চার কোন আয়োজন তথায় ছিল না। তবে, জয়দেবের বাংলা-ঘেঁষা সংস্কৃত কাব্য যে পরবর্তী কালে ও সমসময়ে সৃজ্যমান বাংলা-ভাষাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই।

পাণ্ডুয়ার (গৌড় হইতে দ্বাদশ মাইল দূরবর্তী) শেখ জলালু-দ্-দীন তবরেজীর (মৃত্যু ১২২৫ খ্রী:) দরগাহে সংরক্ষিত ও পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের ভণিতাযুক্ত 'শেক শুভোদয়া' নামক গ্রন্থে দেখা যায়—

> "পঞ্চবিংশোত্তরে শাকে সহস্রৈক শতাধিকে।
> বেহার-পাটনাৎ পর্বং তুরস্ক সমুপাগতঃ॥"

অর্থাৎ, ১১২৫ শকাব্দে বা ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী জাতি বিহার ও পাটনার পূর্বে উপস্থিত হইবে।

সম্ভবতঃ, এই ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দেই তুর্কী-বীর ইখতীয়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজি হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে লখ্‌নৌতী হইতে বিতাড়িত করিয়া বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া, বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন। অতঃপর সমগ্র উত্তর-বঙ্গ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিজিত হয়।

বখ্‌তিয়ার কর্তৃক উত্তর-বঙ্গ বিজয়ের পরেও রাজা লক্ষ্মণ সেনের বংশধরেরা প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে খর্ব শক্তি ও খর্ব রাজ্য লইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। ১২০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই এক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা-দেশে ধীরে ধীরে মুসলিম শাসন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর ফীরুজ শাহ (১৩০১–১৩২২) যখন বঙ্গের সুলতান হইলেন, তখন তাঁহারই বাহুবলে বিহার, লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম ও বঙ্গ (সোনারগাঁও), এককথায় সমগ্র বঙ্গ ও বিহার মুসলিম-শাসনে আসিল। তাঁহার সময়েই সেনাপতি নাসিরু-দ্‌-দীন্‌ ও সিকান্দর খাঁ গাজী দরবেশ শাহ্‌ জলাল মুজর্‌রদ-ই-য়মনীর (মৃত্যু ১৩৬৬ খ্রী:) উপদেশে পরিচালিত হইয়া শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করেন ও ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব অঞ্চলে বাংলার মুসলিম-রাজ্য বিস্তৃত করিয়া দেন।

সুলতান ফীরুজ শাহ্‌ দেহলবীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য লইয়া গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই বিবাদ ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। তাঁহার এক পুত্র নাসিরু-দ্‌-দীন ইব্‌রাহীম লক্ষ্মণাবতীতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং অপর পুত্র গিয়াসু-দ্‌-দীন বাহাদুর শাহ্‌ সোনার গাঁয়ে স্বাধীন বলিয়া দাবী করেন। এই সুযোগে দিল্লীর সুলতান গিয়াসু-দ্‌-দীন্‌ তুগলক ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-দেশ আক্রমণ করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তিনি শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। ফলে উত্তর-বঙ্গের রাজধানী হইল লক্ষ্মণাবতী এবং ইহার শাসনকর্তা হইলেন কদর খান ওরফে মালিক পিন্দার খল্‌জী; পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী হইল সপ্তগ্রাম এবং ইহার শাসনকর্তা হইলেন আজমু-ল্‌-মুল্‌ক্‌ ওরফে ইজ্জু-দ্‌-দীন্‌ য়হ্‌য়া; পূর্ববঙ্গের রাজধানী হইল সোনারগাঁও এবং ইহার শাসনকর্তা হইলেন বহ্‌রাম খান ওরফে তাতার খান।

এই ব্যবস্থাও খুব বেশী দিন টিকিল না এবং গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা, উত্তরে সমুদয় উত্তর-বঙ্গ এবং পূর্বে শ্রীহট্টসহ সমুদয় পূর্ব-বঙ্গ ইলিয়াস শাহের করতলগত হয়; দক্ষিণ-বঙ্গের বহু অংশও তিনি তখন দখল করিলেন। অতঃপর বঙ্গে স্বাধীন মুসলিম আমল শুরু হইল।

১৩২৮-এ বাংলাদেশ আক্রমণ করেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

ফিরোজ শাহ-এর মৃত্যুর পর তার সন্তানদের ভিতরে রাজ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তুর্কী-আমলে সৃজ্যমান ইসলামী-পরিবেশ

তুর্কী-আমলের (১২০১–১৩৫০) দেড় শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গে উপর্যুপরি রাজনৈতিক গোলযোগ সত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী পরিবেশও সৃষ্ট হইতে থাকে। তবে, তুর্কীদের বহু আগেই বাংলার সহিত ইসলামের পরিচয় ঘটে,—সংযোগ স্থাপিত হয় প্রথমতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে, দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম প্রচারের সূত্র ধরিয়া দরবেশদের আগমনে। বঙ্গে তুর্কীদের আগমনে এদেশের সহিত ইসলামের পূর্ব সংযোগ স্বভাবতঃই দৃঢ়তর ও বিস্তৃত হইয়াছিল। কিভাবে ইহা সম্ভবপর হয়, বাংলা-সাহিত্যে মুসলমান প্রসঙ্গে তাহাও জানা আবশ্যক। নতুবা বাংলা-সাহিত্যে মুসলিম অবদান সম্বন্ধে সম্যক্‌ ধারণা হইতেই পারে না।

এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির সহিতই 'ইসলামী পরিবেশ' গড়িয়া উঠিতে থাকে। তুর্কীরা বাংলায় শুধু রাজ্য-বিস্তার ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করেন নাই, তাঁহারা ইসলাম বিস্তৃতির সাহায্যে দেশে একটি 'ইসলামী-পরিবেশ' সৃষ্টিরও সহায়ক হইয়া উঠেন। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার প্রভৃতির প্রবর্তনের মধ্য দিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি হইতেছিল, তাহাকেই এইখানে আমরা 'ইসলামী-পরিবেশ' নামে অভিহিত করিতেছি। এই পরিবেশ শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এদেশের অমুসলমানেরাও এই আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। এই পরিবেশে রচিত রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণের' অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামাই পণ্ডিতের আবির্ভাব কাল ও রচনার পর্যায় লইয়া 'নানা মুনির নানা মত' প্রচলিত থাকিলেও, তাঁহার রচনার প্রথম পর্যায় যে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত সে-কথা কেহ কেহ স্বীকার করেন। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক অংশটির আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেও স্পষ্ট যে ইহা মুসলমান তুর্কী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পরের, অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা। ভাষা যে পরবর্তী কালে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিয়াও ইহার প্রাচীনত্ব মানিয়া লইতে হয়। কেননা ইহাতে একদিকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী 'স্বদ্ধর্মীদের উপর জাজপুর, উড়িষ্যা ও মালদহবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচার-কাহিনী বর্ণনার সহিত মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণের ন্যায় একটি কাল্পনিক-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রটি কাঁচা হাতে অঙ্কিত বলিয়াই ইসলাম সম্বন্ধে হিন্দুদের বা বৌদ্ধদের প্রাথমিক ও অপরিণত ধারণার পরিচয় দেয়। তাহাতেও মনে হয়, ইহা ইসলামের সহিত এদেশের প্রথম পরিচয়-কালে রচিত। 'ইসলামী-পরিবেশের' একটা অপরিণত রূপ ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া এইস্থলে তাহা সম্পূর্ণটিই উদ্ধৃত হইল :—

নিরঞ্জনের রুষ্মা

জাজপুর পুর বাদি, সোল শঅ ঘর বেদি,
বেদি লয় কন্নএ নগুণ।
দক্ষিণ্যা মাগিতে জায়, জার ঘরে নাঞি পায়
শাপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥
মালদহে লাগে কর, ন চিনে আপন পর
জালের নহিক দিশপাশ।
বলিষ্ঠ হইআ বড়, দশ বিশ হৈয়্যা জড়,
সদ্ধর্মীরে করএ বিনাশ॥
বেদে করি উচ্চারণ, বের‍্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভায় কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহরণ,
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম, মনেত পাইআ মর্ম,
মায়াত হইল অন্ধকার॥
ধর্ম হৈলা জবন রূপী, মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ ত্রিভুবনে লাগে ভএ
খোদাএ বলিআ এক নাম॥
(নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলএ দম্বদার।
জথেক দেবতাগণ সভে হৈয়্যা এক মন
আনন্দেত পরিলা ইজার॥)*
ব্রহ্মা হৈল্যে মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হইলা শূলপাণি
গণেশ হইলা গাজী কার্তিক হইলা কাজী
ফকির হইলা জথ মুনি॥
তেজিআ আপন ভেক, নারদ হইলা শেক,
পুরন্দর হইলা মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে, পদাতিক হয্যা সেবে,
সভে মিলে বাজাএ বাজনা॥
আপনি চণ্ডিকা দেবী, তিঁহ হৈলা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হৈলা বিবি ন্যুর।

*এই অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত। ইহা একটা পুঁথিতে নাই। ইহাতে 'দম্বদার' বা 'দম-ই-মদার' কথার উল্লেখ হইতে দেখা যায়, ইহা পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। কেননা, বদীউদ্দীন শাহ্-ই-মাদার পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। —লেখক

ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বর্ণনা

জথেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, ক্যাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধর্মের পাএ, রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥

আধুনিক বাংলায় পরিবর্তিত

জাজপুরে (উড়িষ্যায়) ষোল শত বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। তাহারা কানে নগুণ (নবগুণ=পৈতা) তুলিয়া লইয়া দক্ষিণা মাগিতে যায় এবং যাহার ঘরে দক্ষিণা পায় না, তাহার সংসার (ভুবন) শাপ দিয়া পোড়াইয়া দেয়। মালদহে তাহারা আপন-পর না ভাবিয়া কর বসাইয়া দেয়,—তাহাদের জাল জুয়াচুরির শেষ নাই। তাহারা বড় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, দল বাঁধিয়া (দশ বিশ জড় হইয়া) সদ্ধর্মীকে (বৌদ্ধ জনসাধারণকে) বিনাশ করিতেছে। তাহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, তাহাদের মুখ দিয়া ঘন ঘন অগ্নি বাহির হয়,—সকলে তাহা দেখিয়া কম্পমান। সকলে মনে মনে ইহার অর্থ বুঝিয়া বলে— "হে ধর্ম-দেবতা, রক্ষা কর, তুমি ব্যতীত কে (আমাদিগকে এই বিপদ হইতে) পরিত্রাণ করিবে?" ব্রাহ্মণেরা এইরূপে সৃষ্টি বিনাশ করিতে লাগিল, এ যে বড় অত্যাচার। ধর্ম-দেবতা বৈকুণ্ঠে বসিয়া মনে মনে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মায়াতে আচ্ছন্ন হইলেন। অতঃপর ধর্ম-দেবতা মাথায় কালো টুপি পরিয়া হাতে তীরকশ কামান (ত্রিকচ কামান) লইয়া, উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া, ত্রিভুবনে ভয়-উৎপাদক 'আল্লাহু আকবর' (খোদাএ বলিয়া এক নাম) ধ্বনি তুলিয়া যবন (মুসলিম)-রূপ ধারণ করিলেন। (নিরাকার নিরঞ্জন ভিহিশতের অবতার হইয়া মুখে 'দম-ই-মদার' বলিতে লাগিলেন। যত দেবতা ছিল সকলে একমন হইয়া আনন্দে ইজার পরিল।) ব্রহ্মা মুহম্মদ হইলেন, বিষ্ণু পয়গম্বর হইলেন, আর মহাদেব হইলেন আদম। গণেশ গাজী, কার্তিক কাজী ও যত মুনি-ঋষি ফকির বা দরবেশ হইলেন। আপন বেশ-ভূষা পরিত্যাগ করিয়া নারদ শেখ ও পুরন্দর মৌলানা সাজিলেন। চন্দ্র ও সূর্য প্রভৃতি আদিদেব পদাদিক হইয়া বাজনা বাজাইয়া তাঁহাদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং চণ্ডিকা দেবী হাওয়াবিবি হইলেন, আর পদ্মাবতী হইলেন বিবি নূর। যত দেবতা ছিল, এইভাবে সকলেই একমত হইয়া জাজপুরে প্রবেশ করিল। তাহারা দেউল দেহারা (দেবালয় ও দেবগৃহ) ভাঙ্গিল, মনের আনন্দে লুট-তরাজ করিয়া খাইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে 'পাকড়াও' 'পাকড়াও' ধ্বনি তুলিতে লাগিল। ইত্যাকার দারুণ গণ্ডগোল দেখিয়া রামাই পণ্ডিত ধর্মের পায়ে লুটিয়া পড়িয়া (গান) গাহিলেন।

ইহাতে যে ইসলামী পরিবেশ চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে মুসলিম তুর্কীর রীতি-নীতি এবং আচার-ব্যবহারের আভাসও পাওয়া যায়। সদ্ধর্মী বা নিম্ন-শ্রেণীর বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সহ্য করিত বলিয়া নিশ্চয় উত্যক্ত ও বিব্রত বোধ করিতেছিল। এমন সময় মুসলমান তুর্কীদের কাছ থেকে ইসলামী মানবতা-বোধের এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের স্পর্শ লাভ করিয়া তাহারা যে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা

পাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে তাঁহারা বঙ্গে মুসলিম-শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছে ও ব্রাহ্মণ্য শাসনের আশু নিপাতও কামনা করিয়াছে।

কয়েক প্রকারেই বঙ্গে এই 'ইসলামী-পরিবেশ' সৃষ্ট হইতেছিল। ইসলামী শাসন-প্রতিষ্ঠার কথা না বলিলেও চলে। তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণ্য শাসন-ব্যবস্থা লোপ পাওয়ায়, দেশ হইতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অপসারিত হইতে লাগিল। এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের স্থলাধিকারী হইল 'ইসলাম'। বখতিয়ার ও তাঁহার আমীরগণ দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও তথায় নিয়মিতভাবে 'খুৎবা' (সাপ্তাহিক ধর্মোপদেশ) প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ইসলাম-বিস্তৃতির সহায়ক, স্থানে স্থানে 'মদরসাহ্' নির্মাণ করিয়া ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের পৃষ্ঠপোষক এবং দরবেশদের জন্য 'খানকাহ্' প্রতিষ্ঠা করিয়াও ইসলামপ্রচারের পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বঙ্গে ইসলামের এই যে প্রাধান্য স্থাপিত হইল, তাহা বখতিয়ারের পরেও অক্ষুণ্ন ...ল। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত গয়াসুদ্দীন ইওজ-ও (১২১৩–১২২৭ খ্রী:) মসজিদ নির্মাণ ...ং সয়িদ্, উলমা ও দরবেশদিগকে বৃত্তিদান করিয়া বঙ্গে ইসলাম বিস্তৃতিতে ...তিয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন।

তুর্কী-আমলে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের দ্বার যিনি উদঘাটন করেন, তাঁহার নাম মখদুম ...খ জলালুদ্দীন তবরীজী (মৃত্যু ১২২৫ খ্রী:)। তিনি যখন পাণ্ডুয়ায় আসেন, তখন ...ড়ে শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করিতেছেন। রাজসভা-পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র ...ং রাজা স্বয়ং দরবেশের নানা 'কিরামৎ' (অলৌকিক ক্রিয়া) দেখিয়া তৎপ্রতি ভক্তি ...র্শন করেন। দরবেশ পাণ্ডুয়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ, একখানি উদ্যান রচনা ও ...কটি 'খানকাহ্' প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার এই খানকাহ্তে প্রতিদিন বহু দরিদ্র, দুঃস্থ, ...ন্ন ও পরিব্রাজক আহার্য লাভ করিত। তিনি কিভাবে শত শত লোককে ইসলাম ধর্মে ...ক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার বহু কাহিনী 'শেক শুভোদয়া' নামক একখানি সংস্কৃত ...ন্থকে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের রচনা ...লিয়া ভণিতা দৃষ্টে মনে হয়।

...ইঁহার সহিত দরবেশ শাহ জলাল মুজররদ-ই-য়মনীর কোন সম্বন্ধ নাই। ইনি ...ংলার ফিরূজ শাহ দেহলবীর (১৩১১–১৩২২ খ্রী:) সেনাপতি সিকন্দর গাজীর ...হায্যে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জয় করেন। ১৩৪৫–৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্নে বতুতার বঙ্গভ্রমণ-কালে শ্রীহট্টে তাঁহার সহিত শাহ জলালের সাক্ষাৎ হয়। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইব্নে বতুতা যখন চীন রাজ্যে পৌঁছেন, তখন তিনি শাহ জলালের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিলেন। বতুতার বিবরণ হইতে জানা যায়, একহারা পাতলা লম্বা চেহারার এই দরবেশ নিকটবর্তী পর্বতগুহায় কৃচ্ছ্র সাধনায় মগ্ন এবং সারারাত্রি নামাজ পাঠে রত থাকিতেন। তিনি একসঙ্গে দশ দিন রোজা রাখিয়া একাদশ দিবসে নিজের একমাত্র সম্বল যে গাভীটি ছিল, তাহার দুগ্ধ পান করিয়া রোজা খুলিতেন। বহু স্থানীয় লোক তাঁহার দ্বারা ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখনও শ্রীহট্টের লোক তাঁহাকে পল্লী-গানে স্মরণ করে।

এই যুগের এক দিকে শেখ জলালুদ্দীন তবরীজী (মৃত্যু-১২২৫ খ্রী:) অপর দিকে শাহ জলাল মুজর্‌রদ-ই-য়মনী (মৃত্যু ১৩৪৭ খ্রী:) ইসলাম প্রচারের ... কাজ

করিয়াছিলেন, সে কাজ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আরও বহু দরবেশ দ্বারা সমাধা হইতেছিল। তাঁহাদের মধ্যে পারিল গ্রামে সমাহিত গাজী মুলক্ ইকরাম খান (আগমন ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ অঞ্চলে, খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তীর (১১৪৪–১২৩৬ খ্রী:) শিষ্য আবদুল্লাহ্ কিরমানী বীরভূম জেলার খুস্তিগীরী অঞ্চলে, মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবী প্রকাশ 'রাহী পীর' (আগমন ১২০২ খ্রী:) বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট অঞ্চলে, ছোট পাণ্ডুয়ায় সমাহিত শাহ সফীউদ্দীন শহীদ (শাহাদৎ ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকে) সপ্তগ্রামের ত্রিবেণী অঞ্চলে, মখদুম শাহদৌলা (১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত) পাবনা ও বগুড়া অঞ্চলে, সৈয়িদ আব্বাস আলী মক্কী প্রকাশ 'পীর গোরাচাঁদ' (১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত) চব্বিশ-পরগনার বালণ্ডা অঞ্চলে, বদরুদ্দীন আল্লামা প্রকাশ 'বদর শাহ' সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে (১৩৩৮–১৩৪৯ খ্রী:) চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং "শ্রেষ্ঠ ঔলিয়া; অদ্বিতীয় মুহককীক (সত্যানুসন্ধিৎসু), সত্য, শাস্ত্রাচার ও ধর্মের প্রদীপ" মৌলানা আতা ১৩০০ হইতে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে দিনাজপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিতেছিলেন।

দরবেশ ও সুফীরা এবং আলিম ও ফাজিলেরা বাংলায় এই সময়ে কিরূপ প্রচারতৎপর হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে, আবার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ের কথাই ধরা হউক। ইহা তখন ভারতীয় 'কলন্দরীয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত দরবেশদের এক শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। যিনি এই কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন, তিনি সুলতান মুগীসুদ্দীন তুগরল (১২২৬–১২৮১)-কে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে প্ররোচনা দিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। সুলতান এই দরবেশদিগকে তিন মণ সোনা উপহার দেন। কলন্দরেরা সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে নিজেদের হাতে লোহার বালা ও পায়ে লোহার মল পরিতেন। তাঁহারা এই বালা ও মল পরিত্যাগ করিয়া সুলতান প্রদত্ত সোনার বালা ও মল তৈয়ার করাইয়া পরিতে লাগিলেন। তুগরলের পরাজয়ের পর এই কলন্দর-প্রধানকে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সে দেশ হইতে লোপ পায় নাই, তাহা সত্য কথা।

এই ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিতে হইলে ইবনু বতুতাকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে। তিনি বলেন, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে দরবেশেরা বহু সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেন। তাহারা বিনা ব্যয়ে নৌকায় ভ্রমণ করিতেন; প্রয়োজনমতো তাঁহাদিগকে নৌকায় আহার্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীও দেওয়া হইত এবং তাঁহারা যখন শহরে পৌঁছিতেন, তখন অর্ধ-দিনার উপঢৌকন দিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইত। দরবেশদের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধা এত অধিক ছিল যে, তিনি, 'শায়দা' নামে এক দরবেশকে তাঁহার অবর্তমানে সাতকাওনের (চট্টগ্রামের) ভার দিলেন। এই 'শায়দা' পরে বিদ্রোহী হয় ও সুলতানের ছেলেকে হত্যা করে। সুলতান অনতিবিলম্বে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। 'শায়দা' পালাইয়া সোনারগাঁয়ে পৌঁছেন। তথায় তিনি ধৃত হইয়া নিহত হইলেন। অন্যসূত্রে জানা যায়, কদল খাঁ নামক সুলতান ফখরুদ্দীনের এক সেনাপতিকে দরবেশ বদরুদ্দীন আল্লামা বা 'বদর পীর' চট্টল বিজয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। সমগ্র পূর্ববঙ্গে এই বদর পীরের প্রভাব কত বেশী ছিল, তাহা এখন বুঝা কঠিন নহে। কেননা, এখনও পূর্ববঙ্গের মাঝি-মাল্লারা ঝড়-তুফানে নৌকায় নদী পাড়ি দিতে গিয়া বলিয়া থাকে,— "আল্লা, নবী, পাঁচ পীর, বদর বদর।"

নানাভাবেই এই যুগে বঙ্গে মুসলিম-সংস্কৃতি বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা সম্ভবপর হয় প্রধানতঃ দরবেশদের চরিত্র-মাহাত্ম্যে, প্রচার-তৎপরতায়, দান-ধ্যানে ও আত্মিক-শক্তিতে। মুসলিম-শাসন-প্রতিষ্ঠা হিন্দু পুরোহিত-তন্ত্রের অবসান ঘটায়; ইহাতে জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহারা মুসলমানদিগকে যুগ-যুগান্তের ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচার-অবিচার হইতে মুক্তিদাতা বলিয়া ভাবিতে লাগিল।

তুর্কী কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর, বহু বিদেশীয় মুসলমান নানা সূত্রে বঙ্গে আগমন করিতে থাকেন। কেহ বা ভাগ্যান্বেষণে, কেহ বা বাণিজ্য-ব্যপদেশে, কেহ বা রাজকার্য-উপলক্ষে, আবার কেহ বা অন্যস্থান হইতে উৎপীড়িত ও উৎখাত হইয়া বাংলা দেশে আসিতে থাকে। বখতিয়ার ও তৎস্থলাভিষিক্ত সমর-নায়কদের সহিত যে বিশাল তুর্কীবাহিনী বঙ্গে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই সস্ত্রীক আগমন করে। এই সমস্ত বহিরাগত মুসলমানদের অনেকেই এ প্রদেশে বিবাহ করিয়া বাস করিতে থাকেন। ইঁহাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম ও জীবন-যাপন পদ্ধতি এদেশীয় মুসলমান ও অমুসলমানদের কাছে একটা আদর্শে পরিণত হইয়াছিল। এইভাবে তুর্কী-আমলে এদেশের সৃজ্যমান ইসলামী-পরিবেশকে বিদেশীয় মুসলমানগণ প্রভাবিত করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তুর্কী-আমলে বাংলা-সাহিত্য

আমরা দেখিয়াছি ইসলামী-সংস্কৃতির বিস্তার বাঙ্গালীর মনোরাজ্যে নবজাগরণ আনিয়া দিল, ইহাতে তাঁহাদের মানস-জগৎ নবজীবনের সংস্পর্শে বিপ্লবমুখী হইয়া উঠিল। তাঁহারা একদিকে ইসলাম ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার টান, অন্যদিকে পূর্বপুরুষের ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের বন্ধন—এতদুভয়ের মাঝখানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন; তাঁহাদের চোখের সামনেই এক সংস্কৃতি বিলীয়মান আর অন্য সংস্কৃতি সৃজ্যমান।

এই উত্থান-পতন ও জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে সৃষ্টিমূলক কোন কিছুর কথা চিন্তা করা যায় না।

তবে, এই সময়ে মানুষ তাহার সুখ-দুঃখের কোন গান বা গাথা নিজেদের ভাষায় একেবারেই প্রকাশ করে নাই, এমন হইতে পারে না। এই সমস্ত সাহিত্যের কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক গাথা-জাতীয় ছড়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের রচনা বলিয়া আমাদের ধারণা।

আমরা দেখিয়াছি, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা-ভাষা সৃজ্যমান অবস্থায় ছিল, চর্যাপদে সে-ভাষা ধৃত হইয়াছে। এই কথা সহজে অনুমান করা যায় যে, চর্যার বঙ্গীয়-বৈশিষ্ট্যময় অপভ্রংশ তুর্কী-আমলে আসিয়া আরও বেশী মাত্রায় বাংলা হইয়া উঠিয়াছে। এমন ভাষার কয়েকটি নমুনা 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামক অপভ্রংশ-ভাষায় রচিত গীতি কবিতার সঙ্কলনটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রাকৃতছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যই খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষার অনুরূপ ভাষার যে কয়টি নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেগুলি বাংলা দেশেই রচিত হইয়া থাকিবে এবং এগুলির রচনা-কালও তুর্কী-আমলের একেবারে গোড়ার দিককার বলিয়া মনে হয়, কারণ এগুলির সহিত 'চর্যাপদ' গুলির ভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

এমনই একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"তরুণ তরণি তবই ধরণি
পবন বহ খরা।
লগ নহি জল বড় মরু থল
জন-জীবন হরা॥
দিসই বলই হিঅঅ দুলই
হামি একলি বহু।

ঘর ণহি পিঅ সুণহি পহিঅ
মণ ঈচ্ছই কহু॥"

আধুনিক বাংলায় পরিবর্তিত

'তরুণ তরণিতে (সূর্য্যে) ধরণী তপ্ত হইতেছে, পবন খরবেগে বহিতেছে, নিকটে জল (ও) নাই, (তদুপরি) জন-জীবন-হরণকারী মরুস্থল (সম্মুখে) বিস্তৃত। দিশা বলিয়া দাও, হৃদয় দুলিতেছে আমি বধূ (যে) একাকিনী; আমার প্রিয় ঘরে নাই, হে পথিক শুন (আমার) মন কি ইচ্ছা করে।"

উক্ত অংশটি প্রাকৃত হইলেও বাংলা। প্রধানতঃ ইহার ছন্দ একেবারেই লঘু-ত্রিপদী এবং পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যে এমন লঘু ত্রিপদীর প্রাচুর্য অত্যধিক। দ্বিতীয়তঃ, ইহার 'প্রাকৃত'-খোলস এতই স্বচ্ছ যে, এই আবরণের ভিতর হইতেও ইহার প্রকৃত বাংলা-রূপ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অনুবাদে ইহার 'প্রকৃত' আবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু শব্দ ও ইহাদের প্রয়োগ ব্যবস্থা বিশেষ কিছু বদলায় নাই। সুতরাং 'প্রাকৃত' না বলিয়া 'আদি-বাংলা' ও বলা যায়।

এইরূপ আরও একটি গানের সন্ধান পাইতেছি, 'শেখ-শুভোদয়া' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে। ইহার ভাষা গদ্য, অবশ্য কতটা বিকৃত সংস্কৃত গদ্য। এই সংস্কৃত গদ্যের মূল কাঠামো এবং বাক্‌ভঙ্গী বেশ কিছুটা বাংলা। ইহাতে শেখ জলালুদ্দীন তবরীজীর (মৃত্যু-১২২৫ খ্রী:) অলৌকিক কাহিনী লিখিত আছে। ইহার ভাষা বিচার করিয়া—বিশেষতঃ ইহাতে উল্লিখিত এক-আধটি মুসলিম নামের সহিত পরবর্তী মুসলিম সুলতানের নামের সামঞ্জস্য দেখিয়া কেহ কেহ পুস্তকটিকে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের রচনা নহে এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও আমরা এই পুস্তকে সর্বত্র হলায়ুধ মিশ্রের ভণিতা দেখিয়া ইহাকে জাল পুস্তক বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। অবশ্য মুসলিম নকল-কারকের হাতে ইহার ভাষা বিকৃত হওয়ার কথা স্বীকার করি। সুতরাং 'শেখ-শুভোদয়া' খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিককার (১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ ও ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের) রচনা।

'শেখ-শুভোদয়া' রচনার প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব হইতে বাংলার সহিত দরবেশদের পরিচয় ঘটে। সুতরাং, সংস্কৃত পুস্তকে পীরের মাহাত্ম্য-কীর্তন দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। সংস্কৃত হইলেও নানা কারণে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

(ক) প্রথমতঃ ইহার সংস্কৃত গদ্য-বাংলা-ভাষার নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ ইহাতে প্রাচীন বাংলা-ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক বাংলা ছড়া বা 'আর্যা' প্রেম-সংগীত এবং খনার বচন শ্রেণীর দুই-একটি বাংলা শ্লোকই প্রধান।

(গ) তৃতীয়তঃ, বাংলা-সাহিত্যের মুসলমানদের প্রত্যক্ষ দান যখন একরূপ অসম্ভব, তখন ইঁহারা পরোক্ষে এই সাহিত্যকে কি দান করিয়াছেন, তাহার একটা নির্দশন এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এইবার 'শেখ-শুভোদয়া' গ্রন্থে ধৃত পীর-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক বাংলা 'আর্যার' উল্লেখ করা যাউক। এইরূপ তিনটি 'আর্যার মধ্যে প্রথম (মুদ্রিত ও সম্পাদিত পুস্তকের ১২

দ্বাদশ পৃষ্ঠা) ও দ্বিতীয় (ঐ ৯৫ পৃষ্ঠা) আর্যা' অতি ক্ষুদ্র এবং তৃতীয় (ঐ ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা) 'আর্যাটি' দীর্ঘ। এই 'আর্যা' তিনটিকে বাংলা-ভাষায় প্রাপ্ত (অবশ্য ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনায়) পীর-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্যের প্রাচীনতম নির্দশন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এইগুলি হিন্দুর রচনা হওয়ায় ব্যাপারটি অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, প্রাথমিক যুগে পীর ও দরবেশগণ দেবভক্ত হিন্দুর নিকট জীবন্ত দেবতারূপেই দেখা দিয়াছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়াই মনে করিত। হিন্দুরা দরবেশদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কোন মানুষের মহিমা ঘোষণা করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহারা জাগ্রত দেবতার মাহাত্ম্যের অভিব্যক্তি দেখিয়াছেন। পরবর্তী যুগে যে কারণে চৈতন্যদেবের জীবনী ও মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছিল, মূলতঃ সেই কারণেই 'শেখ-শুভোদয়া'য় দরবেশদের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে। এই পুস্তকের বাংলা 'আর্যা' রচনার মূল প্রেরণাও একই উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে।

'খনার বচন' গুলিও বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনের অন্যতম। পরবর্তী যুগে এইগুলির ভাষা পরিবর্তিত এবং এই পরিবর্তিত ভাষায় এইগুলি সংগৃহীত হইলেও, ইহাদের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না। এইগুলিতে চাষ-বাস, আবহাওয়া ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট যুগ-যুগান্তের অভিজ্ঞতা মুখে মুখে রক্ষিত হইয়াছে।

এইবার 'শেখ-শুভোদয়া' গ্রন্থে ধৃত সংগীতটির কথাই বলিতেছি। এই গানটি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের একমাত্র নির্দশন। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক-সাহিত্য প্রাচীন বাংলায় একরূপ নাই বলিলেও চলে। অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত লোক-সংগীত ও লৌকিক গাথা বা পল্লী-গীতিকার কথা স্বতন্ত্র। এইগুলির কোন কোনটি ষোড়শ শতাব্দীর রচনা হইলেও হইতে পারে, তবে ইহাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বইটি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা নহে। এই দিক হইতে বিচার করিলে 'শেখ-শুভোদয়া' গ্রন্থের সংগীতটি অত্যধিক মূল্যবান। এই সম্পর্কে এই গ্রন্থে যে গল্পটি প্রচলিত আছে (পৃ: ১০৩-১০৬) তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন। গানটি এইরূপ :

(ভাটিয়ালী রাগেণ গীয়তে)

হঙ জুবনী পতিএ হীন।
গংগা সিনায়িবাক জাইএ দিন॥
দৈবনিয়োজিত হৈল আকাজ।
বায়ু ন ভাংগএ ছোট গাছ॥
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি জাঙ ঘর।
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড়॥
হাত জোড় করিঞা মাংগো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান॥
বড় সে বিপাক আছে উপাএ।
সাজিয়া গেইলে বাঘে ন খাএ॥
পুন পুন পাএ পড়িআ মাংগো দান।
মৈদ্ধে বহে সুরেশ্বরী গাংগ॥
শ্রীখণ্ড চন্দন অংগে শীতল।
রাত্রি হৈলে বহএ আনল॥

পীন পয়োধর বাঢ়ে আগ।
প্রাণ ন জায় গেল বহিঞা ভার॥
নয়ান বহিঞা পড়ে নীর নিতি।
জীএ ন প্রাণী পলাএ ন ভীতি॥
আশে পাশে স্বাস করে উপহাস।
বিনা বায়ুতে ভাংগে তালের গাছ॥
ভাংগিল তাল লুম্বিল রেখা।
চলি জাহ সখি পলাইল শংকা॥

আধুনিক বাংলায় পরিবর্তিত

"আমি পতিহীন যুবতী; দিনে গংগায় স্নানার্থে যাইয়া থাকি। দৈবযোগে অকাজ (সাধিত) হইল, –বায়ু (কিন্তু) ছোট গাছ ভাংগে না। অকাজ ছাড়িয়া দাও, আমি ঘরে যাই; সাগরের মধ্যে লোহার গড় আছে। হাত যোড় করিয়া আমি ভিক্ষা মাগি,– "হে মহাত্মা, একবার সম্মান রাখ।" এ যে বড় বিপাক, (তবে) এক উপায় আছে, সাজগোজ করিয়া গেলে বাঘে খায় না। পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া ভিক্ষা মাগিতেছি– সুরেশ্বরী গংগা মধ্যখানে বহিতেছে। অংগে শ্রীখণ্ড চন্দন (লেপনে) শীতল (বোধ হয়), কিন্তু রাত্রি হইলে (শরীরে) অনল বহিতে থাকে; পয়োধর পীনোন্নত (হয়) অগ্নি বাড়ে। যৌবনভার বহিয়া (দিন) গেল,– প্রাণ যে যায় না। (নিত্যই) নয়ন বহিয়া অশ্রু ঝরে, প্রাণ জীবিত থাকিতে চায় না, মন হইতে ভয়ও পলায় না। আশে পাশে (দীর্ঘ) শ্বাস উপহাস করে, বিনা বায়ুতে তালের গাছ ভাংগিয়া যায়। তালের গাছ ভাংগিল (চিন্তার) রেখা লম্বা হইয়া দেখা দিল। সখি, এইবার চলিয়া যাও, আশংকা পলাইয়া গেল।"

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীন মুসলিম-বাংলা

১৩৫০–১৫৭৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাধীন মুসলিম-বাংলার রাজনৈতিক পটভূমি

গৌড়ের শমসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রী:) অভ্যুত্থানে বঙ্গে তুর্কী আমলের অবসান হইল। ইলিয়াস শাহ একজন দূরদর্শী সুলতান ছিলেন; বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা-দেশে মুসলিম সাংস্কৃতিক জাগরণের এক নবযুগ সূচনা করিল। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁর পতন পর্যন্ত গৌড়ীয় শাহী-দরবার বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের সাংস্কৃতিক স্নায়ুকেন্দ্র রূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

বাংলা-সাহিত্য ও চারুকলার পরিপোষক আবহাওয়া-সৃষ্টিতে একটির পর একটি করিয়া মুসলিম সুলতানদের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব প্রবল অনুপ্রেরণা যোগাইতে থাকে। বাস্তবিকই, স্থানীয় লোকদের প্রতি মুসলমানদের ব্যবহার ও হাবভাব এতই উদার, সহনশীল ও সদাশয় ছিল যে, স্থানীয় হিন্দুদের মধ্য হইতে বহুসংখ্যক লোক মুসলমানদের সাংস্কৃতিক মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে; ফলে বহু স্থানীয় আচার-ব্যবহার এবং কিংবদন্তীও তাহাদের সহিত মুসলিম-সমাজে ঢুকিয়া পড়িল। গৌড়ের কতকগুলি মসজিদ এখনও তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (৮৮০ হিজরী) সুলতান য়ূসুফ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত "লোটন-মসজিদ" ('লোটন' শব্দ সংস্কৃত 'নর্তন' শব্দের অপভ্রংশ) শাহী নর্তকী মীরা বাইয়ের স্মৃতি ও প্রবাদ আজও নীরবে ঘোষণা করিতেছে। 'লোটন-মসজিদে'র ন্যায় এমন কারুকার্যখচিত সুন্দর মসজিদ গৌড়ে আর একটিও নাই; অথচ ইহাতে আজও কেহ নামাজ পড়ে না। বালুয়া ও খানুয়া দীঘির মধ্যস্থলে কোতোয়ালী দরজার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত "রাজবীবীর মসজিদ" কোন রাজকুমারীর বেগম বনিবার স্মৃতি বহন করিতেছে, তাহা এখনও জানিতে পারা না গেলেও ইহা যে কোন রাজকন্যার 'বীবী' হওয়ার কথা ঘোষণা করিতেছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই কোতোয়ালী দরজার নিকটবর্তী "পিঠাওয়ালী-মসজিদ" গৌড় হেরেমে বাংলার পিঠার সহিত মিঠা বিতরণের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ আমাদের নিকট বড় কথা নহে; ইতোমধ্যেই বাংলা-ভাষা যে রাজ-দরবারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহার অনুপ্রেরণা

ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এই কথাই আমাদের নিকট সমধিক প্রয়োজনীয়।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে গৌড়ের শাহী দরবারে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের নীরব অভিযানের আর এক ধাপ রচিত হইল। তিনি শুধু পারস্যের কবি হাফিজকে (জন্ম-১২৭৫) বাংলায় নিমন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও মুসলিম বাংলার কবি শাহ মুহম্মদ সগীরকেও অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। নতুবা বিদ্যাপতির কণ্ঠে "প্রভু গ্যাসদেব সুরতান" এবং সগীরের লেখনীতে—

"রাজ রাজেস্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগত বিদিত॥
মানুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার॥
যাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁ হি কাম।
তান ভক্তি বিনা ধিক নাঞি আর ধাম॥"

প্রভৃতি প্রশংসা কখনো স্ফুরিত হইত না। সুলতান গিয়াসুদ্দীনের রাজনৈতিক প্রসিদ্ধি যতই স্বীকৃতি লাভ করুক না কেন, তাঁহার ফারসী, মৈথিলী ও বাংলা-সাহিত্যের কদরদানী তাঁহাকে চির অমরত্ব দান করিয়াছে।

মুসলমানেরা বাংলা অধিকার করিল বটে, কিন্তু তখনও দেশে হিন্দু আমলের সামন্ত-শাসন চলিতেছিল। এই সামন্তদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। উত্তর-বঙ্গের ভাতুরিয়ার জমিদার রাজা গণেশই (কংসই) ইহার প্রধান উদাহরণ। রাজা গণেশ ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দনুজমর্দন' উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়-সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা গণেশ মাত্র চারি বৎসর গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও (১৪১৪—১৪১৮) শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পাণ্ডুয়ার খ্যাতনামা দরবেশ ও মুসলিম নেতা শেখ নূরুদ্দীন কুৎব-ই-আলম ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সাধে বাধ ঠেকাইলেন। তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এই যদুই জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়া প্রায় চৌদ্দ বৎসর (১৪১৮—১৪৩১) বঙ্গদেশ শাসন করিলেন। জলালুদ্দীনের পুত্র শমসুদ্দীন আহমদ শাহ্ও প্রায় দশ বৎসর (১৪৩১—১৪৪২) রাজত্ব করেন।

এইভাবে স্বাধীনতা লাভের প্রথম শতাব্দীর শেষে (২৮) আটাশ বৎসর (১৪১৪—১৪৪২) খাঁটি বাঙালী সুলতান কর্তৃক বাংলা শাসিত হইল। স্বাধীনতার গোড়ার দিককার এই আটাশ বৎসর বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে যেমন বৈপ্লবিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে, বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও ইহা তেমনি বৈপ্লবিক মর্যাদা লাভের অধিকারী। ইতঃপূর্বে বাংলা-সাহিত্য ও ভাষা শাহী অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যে শাহী দরবারে তাহার কোন কদর হয় নাই, শাহী স্বীকৃতিও লাভ করে নাই।

এতদিন যাহা ঘটে নাই এইবার তাহাই হইল। বাংলা-ভাষা ও তৎসূত্রে বাংলা-সাহিত্যকে গৌড়-দরবারে স্বীকৃতি লাভ করাইয়া গৌরব অর্জনের বাসনা যাঁহার মনে সর্বপ্রথম উদিত হইয়াছিল, তিনি বাংলা 'রামায়ণ'-রচক কবি কৃত্তিবাস ব্যতীত আর কেহ

নহেন। তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে পুষ্পমাল্য দিয়া সম্মান করিলেন। এই গৌড়েশ্বর কে, কবি কৃত্তিবাস তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় না জানাইলেও, আধুনিক গবেষণার সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, তিনি রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন ব্যতীত আর কেহ নহেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই স্বীকৃতি কোন একক ঘটনা নহে। ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এই বাঙ্গালী সুলতান পরিবারের তৃতীয় সুলতান শমসুদ্দীন আহমদ শাহ্ (১৪৩১-১৪৪২) কোন বাঙালী কবিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন কিনা জানা না গেলেও, তাঁহার রাজত্বকালে চণ্ডীদাসের ন্যায় খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটে। ...সের সাধন-সঙ্গিনী 'রামীর' কবিতা হইতে জানিতে পারা যায়, চণ্ডীদাস নিমন্ত্রিত ... গৌড়েশ্বরের সভায় গান করিতে গিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজা তখন যে ...ড়ের শাহী দরবারের অনুকরণ করিতেন, ইহার বহু প্রমাণ আছে। সবচেয়ে বড় ...া পাওয়া যায় আরাকানে।

...১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। এইবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ...য়াস শাহী বংশের চারি জন সুলতান মোট পঁয়তাল্লিশ বৎসর (১৪৪২-১৪৮৭) ...া দেশ শাসন করিলেন। এই সময়ে গৌড়ের শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও ...ত্যের নীরব অভিযানের আর এক ধাপ সুদৃঢ় করিয়া রচিত হইল। ইতঃপূর্বে বাংলা ...া ও সাহিত্য গৌড়-দরবারে প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এইবার এই স্বীকৃতির ...ও আরও ব্যাপক ও সুদৃঢ় হইল। ইহার প্রধান প্রমাণ মালাধর বসু, জৈনুদ্দীন ও ...ানন্দ মিশ্রের আবির্ভাব।

১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭ বৎসর মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" রচনা ...রিলেন। এই দীর্ঘ কাব্য-রচনায় মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে "গুণরাজ খান" ...াধিতে বিভূষিত করিলেন। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যকে নূতন করিয়া মর্যাদা দান ...রিবার কীর্তি ইলিয়াস শাহী বংশের শমসুদ্দীন য়ূসুফ শাহেরই প্রাপ্য ...৪৭৪—১৪৮১)। এই য়ূসুফ শাহের অনুগ্রহে সিক্ত হইয়া মুসলমান কবি জৈনুদ্দীন "রসুল-বিজয়" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

এই বংশের পরবর্তী ও শেষ সুলতান জলালুদ্দীন ফৎহ্-ই-শাহ্ (১৪৮১—১৪৮৭) যখন গৌড়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁহার সুবিখ্যাত সামাজিক ইতিহাস "মহাবংশাবলী" রচনা করেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা সাহিত্য-সাধনা ইতিমধ্যে সামাজিক স্তরেও প্রবেশ করিয়াছে।

অতঃপর সাত বৎসর ধরিয়া সাহিত্যিক তৎপরতা স্থগিত থাকিবার পর, ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে আলাউদ্দীন হুসৈন শাহ্ বাদশাহ হইলেন। বাংলার ইতিহাসে হুসেনী বংশের ৪৫ বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল (১৪৯৩—১৫৩৮) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার জন্য, অধিকন্তু সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চিরবিখ্যাত। এই বংশ বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

উদার দৃষ্টি ও সমুচ্চ আদর্শ-সমন্বিত যে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি, তাহাতে হুসৈন শাহ্ পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি জন্মের দিক হইতে খাঁটি আরবী হইলেও, স্থানীয়

এক বাঙালী-পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহাতে তাঁহার সহিত বাংলার মূল অধিবাসীর এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহার পরিণাম বাংলার পক্ষে অতি ফলদায়ক হইয়াছিল। বরিশালের ফুল্লশ্রী-গ্রামের কবি বিজয় গুপ্ত ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁহার "মনসা-মঙ্গল" কাব্যের মুখবন্ধে হুসৈন শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। চব্বিশ-পরগনা জেলার বশীরহাট মহকুমার বাদুড্যা-গ্রামের আর এক কবি বিপ্রদাস পিপিলাইও এই সময়ে তাঁহার কাব্যে হুসৈন শাহের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাংলায় 'ব্রজবুলি-ভাষায়' পদ রচনা করিবার রেওয়াজও হুসৈন শাহের সময় প্রবর্তিত হয়। শ্রীখণ্ডের কবি যশোরাজ খান হুসৈন শাহের কর্মচারী হইলেও, একটি ব্রজবুলি-পদে বাদশাহের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কবির প্রভুভক্তির চেয়েও বাদশাহের বাংলা-সাহিত্য ও ভাষা-প্রীতির নিদর্শন অধিক মিলে। তিনি হুসৈন শাহকে শুধু 'জগৎ-ভূষণ' বলিলে তাঁহার প্রভুভক্তির কথা বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক হইত, কিন্তু তিনি যখন বাদশাহকে বিদগ্ধ বা রসজ্ঞ জন বলিয়া উল্লেখ করেন, তখন বাদশাহের বৈদগ্ধ্যের কথা ভুলিয়া যাওয়া যায় না।

প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের, বিশেষ করিয়া ধর্ম-সাহিত্যের বাংলা-ভাষায় অনুবাদ হুসৈন শাহের আর এক বড় কীর্তি। তাঁহার চট্টল ও ত্রিপুর-বিজয়ী সেনাপতি পরাগল খাঁয়ের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর "মহাভারত পাঁচালী" (ইহা পরাগলী মহাভারত নামেই প্রসিদ্ধ) রচনা করিতে গিয়া লিখিলেন :

> "কলিযুগ, অবতার গুণের আধার।
> পৃথিবী ভরিয়া যার যশের বিস্তার॥
> সুলতান আলাউদ্দীন প্রভু গৌড়েশ্বর।
> এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার॥"

বাংলার সর্বপ্রথম "বিদ্যাসুন্দর কাহিনী"ও হুসৈন শাহের আমলে রচিত হয়। মৈমনসিংহবাসী কঙ্ক নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক জাতিচ্যুত হইয়াও এক পীরকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এই গুরুর আদেশেই সত্যপীরের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি আনুমানিক ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে "বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী" রচনা করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয় মূল্যই বর্তমান।

এইভাবে হুসৈন শাহের রাজত্বকালে বাংলার লৌকিক-কাহিনী 'মনসা-মঙ্গল', বাংলা-সাহিত্যের এক প্রধান শাখা 'ব্রজবুলি পদ', হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যের অনুবাদ 'বাংলা-মহাভারত' এবং ভারত-বিখ্যাত পৌরাণিক গল্প 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইল।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে চৈতন্যদেবের (১৪৮৬–১৫৩৩) আবির্ভাব ও তৎকর্তৃক "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের" প্রতিষ্ঠা। চৈতন্যদেব তাঁহার মাতৃভাষা বাংলায় "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত" প্রচার করায় বাংলা-সাহিত্যের এক নূতন দিক খুলিয়া গেল : বাংলায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভিত্তি প্রোথিত হইল।

সর্ববিষয়ে হুসৈন শাহের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ্ (১৫১৯–১৫৩১) পিতার আরব্ধ কার্য হাতে লইয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের উৎসাহ দানেও তাঁহার কোন কার্পণ্য ছিল না। তিনিও মহা-ভারতের একখানা অনুবাদ করাইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। এই অনুবাদ অধুনালুপ্ত হইলেও, তাঁহার সেনাপতি ও পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান শ্রীকরণ নন্দীর সাহায্যে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের যে অনুবাদ করান, ইহার বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এখনও দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রীখণ্ডের 'কবিরঞ্জন' উপাধিক বিদ্যাপতি নসরৎ শাহের কর্মচারী ছিলেন। তিনি একটি ব্রজবুলি-পদে সশ্রদ্ধায় সুলতানের নাম এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :

> "বিদ্যাপতি ভাণি অশেষ অনুমানি
> সুলতান নসির শাহ
> মধুপ ভুলে কমলা বাণী।"

শেখ কবীর নামক এক মুসলমান কবিও একটি ব্রজবুলি-পদে এইভাবে সুলতান নসরৎ শাহের নাম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেন :—

> "সেখ কবির ভণে অহি গুণ পামরে জানে
> সুলতান নসির সাহা
> ভুলল কমল বনে।"

হুসৈনী বংশের বাংলা সাহিত্য-প্রীতি বংশানুক্রমিক। সুলতান নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফীরূজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩) মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করিলেও শ্রীধর নামক এক কবিকে তিনি "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তখন ফীরূজ শাহ্ যুবরাজ। কবির নিম্ন উক্তি হইতেই ইহা জানিতে পারা যায় :—

> "নৃপতি নসির শাহ তনয় সুন্দর।
> সর্বকলা নলিনী ভোগী ত মধুকর॥
> শ্রী পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
> কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ॥

ফীরূজ শাহের পিতৃব্য গিয়াসুদ্দীন মহমুদ শাহ্ (১৫৩৩-১৫৩৮) মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্যাতনামা বৈষ্ণব-কবি বৃন্দাবন দাস (১৫০৬-১৫৮৯) "চৈতন্য-ভাগবত" এবং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লোচন দাস চৌদ্দ বৎসর বয়সে "চৈতন্য মঙ্গল" রচনা করেন। এই সময়ে বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা বংশীবদনও (জন্ম ১৪৯৪ খ্রী:) আবির্ভূত হন।

এইভাবে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য শৈশব ও কৈশোর অবস্থা কাটাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শের শাহ্ ও তদ্বংশীয়দের দ্বারা প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া বাংলা শাসিত হয়; তাঁহাদের শাসন-কালে বাংলা-সাহিত্যের বিকাশ অব্যাহত থাকে। এই সময়ে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটে :

১। মুক্তারাম সেন	সারদা-মঙ্গল	(রচনা-১৫৪৭ খ্রী:)
২। রামচন্দ্র খান	অশ্বমেধ পর্ব	(রচনা- ১৫৫০ খ্রী:)
৩। জয়ানন্দ	চৈতন্য-মঙ্গল	(রচনা-১৫৭০ খ্রী:)

৪। রঘুনাথ পণ্ডিত	কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী	(রচনা-১৫৭০ খ্রী:)
৫। মাধবাচার্য	(ক) শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল	(রচনা-১৫৭০ খ্রী:)
	(খ) গঙ্গা-মঙ্গল	(রচনা- .... খ্রী:)
	(গ) চণ্ডীমঙ্গল	(রচনা- ১৫৭৯ খ্রী:)
৬। বংশী দাস	মনসা-মঙ্গল	(রচনা-১৫৭৫ খ্রী:)
৭। চন্দ্রাবতী	মনসা মঙ্গল	(রচনা- ১৫৮০ খ্রী:)

৮। জ্ঞান দাস (জন্ম ১৫৩০, মৃত্যু ১৫৮২) পদকর্তা।

৯। গোবিন্দ দাস (জন্ম ১৫৫৭, মৃত্যু ১৬১২) পদকর্তা।

বাংলা-অক্ষরের অনুশীলনও তখন দেশে অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল। শের শাহের একটা কামানের উপর বাংলা-অক্ষরে তাঁহার নাম ও উপাধি পাওয়া গিয়াছে। ঈসা খাঁর (১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) একটা কামান বাংলা হরফে "শ্রী ইছা খাঁ" নাম ধারণ করিয়া এই বর্ণমালার ব্যাপক প্রচলনের কথা এবং রাজপুরুষদের বাংলা বর্ণমালার স্বীকৃতির সংবাদ নীরবে ঘোষণা করিতেছে। রাজশাহী যাদুঘরে সংরক্ষিত ও সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানা বাংলা-অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত-শিলালিপি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, হুসেন শাহী বংশের আমলেই বাংলা-সাহিত্যের ন্যায় বাংলা অক্ষরের অনুশীলনও এতই ব্যাপকত্ব লাভ করিয়াছিল যে, সংস্কৃত-ভাষা বাংলা অক্ষরে লিখিত হইত। এই শিলালিপিতে বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী ("মহাপাত্রাধিপাত্র") এবং নূরবাজ (নৃরবাজ) খানের পুত্র ফরাস খান কর্তৃক একটি সেতু (সংক্রম) নির্মাণের কথা লিখিত আছে। ইহাতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের বাংলা-অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায় বলিয়া পাঠ ও প্রতিলিপি দেওয়া হইল :

পাঠ

॥ শ্রীরস্তু ॥

শাকে পঞ্চ পঞ্চা
শদধিক চতুর্দ্দ
শ শতাঙ্কিতে মধৌ
শ্রী শ্রী মন্মমহামুদ সা
হ নৃপতে সময়ে ন–
র বাজ খান পুত্র ম
হাপাত্রাধিপাত্র শ্রীমৎ
ফরাস খাঁনেন সংক্র
মোয়ং বিনির্ম্মিত ইতি

আধুনিক বাংলায় পরিবর্তিত

॥ আপনি সৌভাগ্যবান হউন॥

"চৌদ্দ শত পঞ্চান্ন শকাব্দের বসন্তকালে মহাভাগ মাহমুদ সাহ নরপতির রাজত্বকালে নূরবাজ খাঁনের পুত্র প্রধান মন্ত্রী (মহাপাত্রাধিপাত্র) ভাগ্যবান ফরাস খাঁনের দ্বারা এই সেতু বিনির্মিত হইল। ইতি–"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিক হইতে স্বল্পসংখ্যক বাঙালী মুসলিম কবি ধর্ম-বিষয়ে বাংলা-ভাষায় পুস্তক লিখিতে যাইয়া বাংলা-অক্ষরের পরিবর্তে আরবী-হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই সময়ের মুহম্মদ জান নামক এক কবি "নমাজ-মাহাত্ম্য" নামক এক পুস্তক ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিতে গিয়া ভূমিকায় বলিয়াছেন :–

"আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন।
আরবী অক্ষুলে যদি বাংলা লিখন॥
বুঝি সুঝি কার্য কৈলে পাপ ঘোরতর।
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর॥
—(নমাজ-মাহাত্ম্য)

"নমাজ-মাহাত্ম্য" গ্রন্থের ছয়খানি পাণ্ডুলিপির মধ্যে দুইখানি আরবীহরফে পাওয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলি বাংলা-অক্ষরে অনুলিখিত। এই পর্যন্ত ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সন-তারিখ-যুক্ত কোন বাংলা পুঁথির আরবী অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আলাওলের (সপ্তদশ শতাব্দী) "পদ্মাবতী"-র একখানি তারিখহীন পাণ্ডুলিপি আরবী হরফে পাওয়া গিয়াছে, তাহা কিছুতেই দেড় শত বৎসরের পূর্ববর্তী অনুলিপি নহে। কাগজ ও হাতের লেখাই তাহার সাক্ষী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীন মুসলিম-বাংলার সাংস্কৃতিক পটভূমি

আমরা এই যুগের মুসলিম-বঙ্গের সাংস্কৃতিক পটভূমির আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ-বিকাশ এই যুগের কীর্তিনিচয়ের অন্যতম। এই সময় বাংলার লোক কয়েক কারণে চারিটি ভাষা ব্যবহার করিতেন। জনসাধারণ বাংলা-ভাষা ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু সংস্কৃত-ভাষা বঙ্গে মুসলমান-আগমনের পূর্ব হইতে রাজভাষা ও হিন্দুদের ধর্মীয় ভাষারূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, জনসাধারণের মধ্যে ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মুসলিম-আমলে সংস্কৃত রাজ-ভাষার মর্যাদা হারাইল বটে, তবু হিন্দু-সংস্কৃতি ও জীবন ধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য অনেক মুসলমানও সংস্কৃত শিখিতেন।

বাস্তবিকই সংস্কৃত-ভাষার প্রতি মুসলমানদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। ইহা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপারও নহে; জাতি যখন বড় হয়, তখন সে অপরের সমস্ত জ্ঞান, তাহা পৃথিবীর যে ভাষাতেই থাকুক, আহরণ করিয়া জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উঠন্ত জাতি হিসাবে বাঙালী মুসলমানেরাও এই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, যদিও সহনশীল মুসলিম-আদর্শ ও সংস্কৃতি হইতেই তাঁহারা অধিক পরিমাণে প্রেরণা লাভ করিতেন।

স্বাধীনতার যুগে, এমন কি তুর্কী-আমলেও বাংলার মুসলমান যে আরবী-ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন, তাহার প্রমাণ ব্যাপক। বাংলার তুর্কী-আমল হইতে স্বাধীনতার শেষ যুগ পর্যন্ত বাংলা-দেশে যত মুসলিম শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা আগাগোড়াই আরবী। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবী বলিয়া, জাতীয় সংস্কৃতির মূল বাহক ও ধারক হিসাবে এই ভাষার সহিত সোজাসুজি পরিচয় স্থাপন করা মুসলমানেরা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ ভাষাগত কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কেননা, তাঁহারা জানিতেন,— "বিদ্যার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য 'ফরজ' বা অবশ্য কর্তব্য।" বাঙালী মুসলমানের দেশীয় সাহিত্য রচনায় এই আরবী-চর্চার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা-ভাষায় যে সমস্ত আরবী-শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শুধু আদালতে ব্যবহৃত ফারসী-ভাষার মধ্যস্থতায় ঘটে নাই, ইহা বাংলায় ব্যাপকভাবে আরবী-ভাষা চর্চারও ফল। আমরা একটু পরেই দেখিতে পাইব, বাঙালী মুসলমানেরা এই স্বাধীনতার যুগে বাংলা-ভাষায় ধর্মীয় সাহিত্যও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সাহিত্য আরবীভাষার সহিত সোজাসুজি সংযোগ স্থাপনেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

ফারসী চিরদিনই মুসলমান-আমলে সরকারী ভাষা ছিল। ফারসী স্বাধীন বঙ্গে ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলমানদের দ্বারা অনুশীলিত হইত। সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ

করিয়াছিল বলিয়া অনেকেই বাধ্য হইয়া এই ভাষা শিখিত; আবার মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ভাষা হিসেবেও অনেকেই ইহার অনুশীলন করিত। এই সময়ে ফারসী-ভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ কিভাবে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বহুল-প্রচলিত হয়, তাহার কিছু কিছু উদাহরণ জয়ানন্দের (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) "চৈতন্য-মঙ্গলে" দেখিতে পাওয়া যায়। জগাই-মাধাই নামক যে দুইজন বৈষ্ণবদ্রোহী হিন্দুকে চৈতন্যদেব বৈষ্ণব-মতে দীক্ষিত করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে জয়ানন্দ বলেন :

> "মসনবি (মনসরি) আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
> মহাপাপী জগাই মাধাই দুই জনে"

কলিকালের অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সমসময়ের হিন্দু-সমাজের বিদ্যা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বর্ণনা-প্রসঙ্গেও জয়ানন্দ লিখিয়াছেন :

> "ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
> মোজা-পাএ নড়ি-হাথে কামান ধরিবে॥
> মনসরি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
> ডাকা-চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর॥"

ব্রাহ্মণগণ মুসলমানের ন্যায় দাড়ি রাখিতে শুরু করিয়াছেন, সংস্কৃত ছাড়িয়া ফারসী-ভাষা পড়িতেছেন, তাঁহারা পায়ে 'মোজা' পরিধান করিয়া এক হাতে যষ্টি ও অন্য হাতে 'কামান' বা ধনুক ধারণ করিতেছেন, এবং মুখে মুখে পারস্যের সুফী-কবি মৌলানা জলালুদ্দীন রূমীর (১২০৭-১২৭৩) 'মসনবী' গ্রন্থ আবৃত্তি করিতেছেন,— ইহাই তো তখনকার দিনের হিন্দু-সমাজের অবস্থা। সুতরাং, ফারসী-সাহিত্যের নানা প্রভাব যে হিন্দু-মুসলমানের বাংলা-সাহিত্যে পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এই প্রভাব প্রধানতঃ শব্দ, বিষয়, ভাব ও অনুবাদ,— এই চারি প্রকারেই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

স্বাধীন মুসলিম বঙ্গের সাংস্কৃতিক পটভূমির ভাষাগত দিক আলোচনার পরেই এদেশে ইসলাম বিস্তৃতির কর্তা ভাবিতে হয়। এই সময়ে দেশে মুসলিম রাজত্বের স্থায়িত্বের সহিত ইসলামও স্থায়ী হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব হইতে দেশে ইসলাম বিস্তৃত হইতে থাকিলেও, ইসলামের এই বিস্তারের পরিধি অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। দেশে মুসলিম রাষ্ট্রীয় সীমাবৃদ্ধির সহিত, ইসলাম-বিস্তৃতির সীমাও বর্ধিত হইতে থাকে। একদিকে মুসলিম সেনাপতি ও সৈন্যেরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছেন, অন্যদিকে ঔলিয়া, দরবেশ ও আলিমগণ দলে দলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন। এই সময়ে দেশে যে সমস্ত দরবেশ ও আলিম প্রচার-কার্য চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গৌড়ের আখী সিরাজুদ্দীন (মৃত-১৩৫৭), পাণ্ডুয়ার শৈখ আলাউল হক (মৃত-১৩৯৮), নূর কুৎব-ই-আলম (মৃত-১৪১৬), হুগলীর ফুরফুরার শাহ্ আনওয়ার কুলী হলবী (মৃত-১৩৭৫), রংপুরের শাহ ইসমাঈল গাজী (হত্যা-১৪৭৪), খুলনার খান জাহান (মৃত-১৪৫৮), সোনার গাঁয়ের হাজি বাবা সালিহ্-(মৃত ১৫০৬), শ্রীহট্টের শাহ্ জলাল (মৃত-১৩৪৬), চট্টগ্রামের শাহ্ মুহসীন ঔলিয়া (মৃত-১৩৯৭) এবং পীর বদর (ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে), ত্রিপুরার রাস্তী শাহ (১৩৫১ হইতে ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে), গৌড়ে মৌলানা বরখুরদার (মৃত ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে), দেবকোটের মৌলানা আতা

(১৩৫৫), রাজশাহীর মৌলানা শাহ্ দৌলা (জীবিত ১৫১৯), মুরশিদাবাদে শাহ্ চাঁদ, প্রকাশ দাদা পীর (১৪৯৩-১৫১৯), সপ্তগ্রামের সৈয়দ আমূলী (মৃত-১৫৩১) প্রভৃতিই প্রধান।

এমন করিয়াই দেশ সুফী, দরবেশ ও আলিমদের প্রচার-তৎপরতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের প্রচারকার্য ও তাহার সাফল্যের কথা মনে রাখিয়া শাসক-সম্প্রদায়ের কথা ভাবিতে হইবে। বাংলার পল্লী-প্রান্তরে এখনও মুসলিম শাসক-সম্প্রদায়ের শত শত আরবী-শিলালিপি ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই শিলালিপিগুলির পাঠ হইতে বাংলার মুসলিম শাসক-সম্প্রদায়ের হৃদয় ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই উপাদানকে সম্মুখে রাখিয়া এই সম্প্রদায়ের একটা মানস-ছবি অঙ্কিত করিলে, ইহার যে চিত্র হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, তাহা কোন বিজয়ী বীরের ভয়াবহ চিত্র নহে,– তাহা ইসলামের প্রেমের চিত্র, ভ্রাতৃত্বের ছবি, প্রীতির বিশ্ব-বিজয়িনী প্রতিমা। ইসলাম যেন স্বীয় প্রাণের বিরাটত্ব, জ্ঞানের ঐশ্বর্য, সভ্যতার সম্পদ, সংস্কৃতির বিভব বাংলায় দুই হাতে বিলাইয়া দিতেছে, আর বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক অভিশাপে জর্জর নরনারী তাহা কুড়াইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে।

ইসলামের এই মূর্তিই স্বাধীনতার যুগে বাংলার হিন্দুকে স্বেচ্ছায় ইসলাম বরণ করিতে উৎসাহিত করে। এক কথায়, এই সময়ে বাংলায় বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। ইহাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি প্রধানতঃ ইসলামকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ভাষার মধ্যস্থতায় ফুটিয়া উঠে। এই সময়েই বাংলার মুসলমানেরা "দেশী ভাষায়" সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিতে থাকেন। তাহার প্রাচীনতম উদাহরণ শাহ্ মুহম্মদ সগীর। তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯–১৪১০) কর্মচারী ছিলেন ("তান আজ্ঞাক অধীন") এবং সাহিত্য-চর্চায় তাঁহার উৎসাহদাতা ছিলেন, নতুবা কবি কখনও বলিতেন না "তান ভক্তি বিনা ধিক নাহি কোন ধাম।"

স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব হইতে মানুষকে মুক্তিদান করে না, ইহা মানুষের মনকে চিন্তার দাসত্ব হইতেও মুক্তি দিয়া থাকে। বাংলার সোয়া দুই শত বৎসরের স্বাধীনতা তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল। এই সময়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, শিল্প ও সাহিত্যে দেশ ধীরে ধীরে ভরিয়া উঠিতে থাকে। স্থাপত্য-শিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া, চারু ও কারু শিল্প পর্যন্ত ইসলাম বাংলা-দেশের সহিত (বাংলার ধর্ম নহে) হাত মিলাইতে আরম্ভ করে। তাই দেখিতে পাই, স্থাপত্য-শিল্পে ইসলামী রীতির সহিত বাংলা-রীতির বাংলা-ঘর যেমন স্থান লাভ করিয়াছে, মসজিদের কারুকার্যে লতাপাতা ও জ্যামিতিক রীতির সহিত পারস্যের গোলাপের পাশে বাংলার পদ্মও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার সে পদ্মের পর্ণ আরবী হরফে "আল্লাহ্"-শব্দের পরাগ বুকে লইয়া এখনও তৌহিদের বাণী ঘোষণা করিতেছে। গৌড়ের "ছোট সোনা মসজিদ" (পূর্ব-পাকিস্তানে) এখনও ইহার প্রধানতম উদাহরণ।

আরও একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, বুকে "আল্লাহ"-এর পরাগ-মাখা বাংলার পদ্মই শুধু তখনকার নহে, এখনকার বাঙালী মুসলমানেরও স্বাধীনতার যুগে বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামের সহিত বাংলার যে মিলন ঘটিল, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যেও এই মিলন ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদ্মের

পর্ণে 'আল্লাহ্-এর পরাগ যেমন তৌহিদ-বাণী ঘোষণা করিতেছে, বাংলা-ভাষার বুকেও তেমনি ইসলামের তৌহিদ-বাণী গুঞ্জরিত এবং ইসলামী চিন্তাধারার ইরান তুরানী রূপ মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই ইহা মুসলিম বাংলা সাহিত্যে অধিক দেখা যায়। কিভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমন একটি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল, তাহাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

স্বাধীন মুসলিম-বঙ্গের গোড়া হইতেই সুলতানদের বাঙালী রমণী-বিবাহের সূত্র ধরিয়া বাংলা-ভাষা মুসলিম রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে থাকে। তাহার উপর গৌড়ের হেরেমে বাঙালী পরিচারিকার নিযুক্তিতেও এই ভাষা বাদশাহ্দের পরিবারে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বাংলার হিন্দু-মুসলিম কর্মচারীর ব্যাপক নিযুক্তিতে বিশেষ করিয়া শাহী দরবারে বহু শিক্ষিত ও পদস্থ হিন্দুর আমদানীতে বাংলা-ভাষা গৌড়ের শাহী দরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। "তদুপরি জলালুদ্দীনের (যদু) ন্যায় খাঁটি বাঙালী মুসলিম সুলতানদের স্বাভাবিক মাতৃভাষাপ্রীতি এই ভাষাকে শাহী দরবারে যে প্রতিষ্ঠা দান করিল, তাহা হুসৈনী বংশের উদারদৃষ্টিভঙ্গী, শিল্পী ও সাহিত্যপ্রীতির সহিত মিশিয়া বাংলা সাহিত্য-চর্চাকে দেশময় ছড়াইয়া দিল। বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় সুলতানদের এই দানকে পরোক্ষ দান বলা চলে না। বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের প্রত্যক্ষ দানে গৌড়ীয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতাও অন্যতম। এই সময়ে বাংলা-সাহিত্য তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করিলে বনফুলের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝরিয়া পড়িত।

এই সময়ে দেশে বাঙালী মুসলমানের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে বা বাহিরে যাঁহারা বিদেশাগত ছিলেন, তাঁহারাও দুই-তিন পুরুষের পর বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন। তাই এই সময়ের মুসলমান বাংলা লেখকদের মধ্যে 'শাহ', 'সৈয়্যিদ', 'শৈখ', 'খাঁ' প্রভৃতি বংশগত উপাধি পাওয়া যাইতেছে। দেশীয় লোকদের মধ্যে যাঁহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইলেন, তাঁহারা তো শুধু ধর্মটি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে পুরাপুরি বাঙালী রহিলেন। ফলে বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানের ব্যাপক প্রত্যক্ষ দান এই সময় হইতেই শুরু হয়। এই দুই শ্রেণীর বাঙালী মুসলমান যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে মসজিদগাত্রসংলগ্ন পদ্মের আল্লাহ্ময় পরাগের ন্যায় ইসলামই ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃতপক্ষে, বাংলার মুসলমানদের হাতে পদ্ম যেমন আল্লাহময় হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যও তেমন বাংলা থাকিয়া আল্লাহ্ময় হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দানের ইহাই প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীনতার যুগে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের মন খুলিয়া গেল। দেশে ইসলাম স্থায়ী হইয়া গেল; ইহার বাণী দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত ও লক্ষ জীবনে রূপায়িত হইয়া উঠিল। মানুষের চোখের সামনেই ইসলামের আভ্যন্তরীণ বিভব ও বাহ্যিক মহিমা ধীরে ধীরে পর্ণে পর্ণে বিকশিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেশের অমুসলমানদের মনে নানা সংশয়, নানা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। জাতিভেদজর্জরিত হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রাচীর তাহাদের সাংস্কৃতিক, বিশেষ করিয়া ধর্মীয় অনুদারতার জন্যই একে একে ধ্বসিয়া পড়িতে লাগিল। এক কথায়, বাংলার হিন্দুর সামাজিক জীবন প্রথমে মৃদু এবং পরে প্রবল হইতে প্রবলতর চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশ কুলজী গ্রন্থে যিনি রাজা 'দত্তখান'

বা 'দত্ত-খাস' নামে পরিচিত, তিনিই এই যুগের বাঙালী হিন্দুদের সামাজিক প্রাচীনতম উদাহরণ। ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৪২–১৪৫৯) রাজ্য 'দত্তখান' এক ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম "জাতিমালা কাচারী"। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তিনি রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের ৫৭তম (সপ্তপঞ্চাশত্তম) সমীকরণের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুর সামাজিক চাঞ্চল্য অপনোদনের চেষ্টা করেন। ইহাতেও হিন্দুর সামাজিক চাঞ্চল্য দূরীভূত হয় নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরেই 'পটি' ও 'কাপ' বন্ধন করিয়া উদয়নাচার্য ভাদুড়ী উত্তর-বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে 'পরিবর্ত মর্যাদা' স্থাপন করেন। ইহাতেও যখন কুলাইল না, ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীন সমাজকে ছত্রিশ 'মেলে' আবদ্ধ করেন। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী" রচিত হইল। ইহাতেও সে একই সামাজিক চাঞ্চল্য সুস্পষ্ট।

অতঃপর এই চাঞ্চল্য সমাজ ছাড়াইয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হিন্দুর মনে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল, তবে কি বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র. ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আদি দেবতা এবং আচার-বিচার ক্রিয়া-কাণ্ড ইত্যাদি অনুষ্ঠান,– সমস্তই ভুল? আর ইসলাম, ভ্রাতৃত্ব, মানবতা প্রভৃতিই সত্য? ধর্ম মানুষের জন্য, না মানুষ ধর্মের জন্য? এই যুগের খ্যাতনামা হিন্দু-কবি চণ্ডীদাস ঘোষণা করিলেন :

"শুন হে মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

ইহাতে গোঁড়া হিন্দুদিগের রক্ষণশীলতার আসন টলটলায়মান হইল: রক্ষণশীলদলে রব উঠিল, "রক্ষা কর, রক্ষা কর।" এই 'রব' দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বায়ুর পাখায় ভর করিয়া উড়িয়া চলিল।

হুসৈন শাহী বংশের রাজত্বকালে বাংলার সংস্কৃত-চর্চার প্রধানতম কেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ হইতে স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন এবং নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। অতঃপর, সংহিতার ব্যবস্থায় ও ন্যায়ের ধূম্রজালে হিন্দু সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া দিবার চেষ্টা চলিল।

এই চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'নুলো পঞ্চানন' তাঁহার "গোষ্ঠী-কথা" নামক গ্রন্থে 'মেল বন্ধন' করিলেন। তিনি রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থা, রঘুনাথের নৈয়ায়িক বিচার, কিছুরই প্রশংসা করিলেন না। তিনি লিখিলেন :

"এই কালে রাঢ়ে-বঙ্গে পড়ে গেল ধূম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥"

রঘুনাথ-রঘুনন্দনের ন্যায় হাতি-ঘোড়া যেখানে তলাইয়া গেল, সেখানে নুলো পঞ্চাননের মত ফড়িং 'কত জল' জিজ্ঞাসা করিয়াও বিশেষ কিছু যে করিতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ, জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট হিন্দুর ধর্ম, সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি এমন কোন জিনিষ রহিল না, যাহাতে এই সময়ে ইসলামের মুখ্য বা গৌণ প্রভাব পড়িল না। ইহাতে হিন্দু-সমাজে এক প্রবল বিক্ষোভ উগ্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করিল। "প্রেম-বিলাসে"র কথায় এই বিক্ষোভ এইভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে :

"কলিকালে লোক সব বড় দুরাচার।
প্রধান কারণ তার যবন অধিকার॥"

হিন্দু-সমাজের এই বিক্ষোভের সময়েই চৈতন্যদেবের (১৪৮৫–১৫৩৩) আবির্ভাব। ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি নদীয়ায় "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত" প্রচার করিতে থাকেন। তাহার এই মত ঘটক ও কারিকাকারদের রক্ষণশীল পণ্ডিতদের হিন্দু ধর্মীয় মতবাদের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই মতবাদ ইসলামকে মানিয়া লইয়া প্রগতিশীল হইয়া উঠায়, দেশে স্থায়ী ও বিস্তৃত হইতে সমর্থ হয়।

"নামে রুচি, জীবে দয়া"– ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের মূল মন্ত্র। তাঁহাদের 'নামে রুচি' কীর্তনের অর্থাৎ নাম-সংকীর্তনের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং "জীবে দয়া" সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই "নামে রুচি জীবে দয়া" মুসলিম সুফী সাধকদের 'জিক্‌র' ও 'খিদ্‌মৎ' নীতির নামান্তর। ইহাতে ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও সুস্পষ্ট। অধিকন্তু, সূফীদের 'সমা' ও বৈষ্ণবদের 'কীর্তনে'ও কোন তফাৎ নাই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে 'দশা' হয়, তাহাতে যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠে, সূফীদের 'হালের' অবস্থাও তাহাই। 'কীর্তন' ও 'সমা' এবং 'দশা' ও 'হাল' শব্দার্থ ভাব, সম্পাদন-ব্যবস্থা ও মানসিক অনুভূতির দিক হইতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি। বিশেষতঃ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'প্রেম', সূফীদের 'ইশ্‌ক্'; 'রাধা-কৃষ্ণ' সূফীদের 'সাকী' ও 'বৎ' কিংবা 'শম্‌আ' ও 'পরওয়ানা'; 'ঐশ্বর্য', সূফীদের 'কিয়ামৎ' ছাড়া কিছুই নহে।

শুধু বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসে নহে, সাহিত্যের ইতিহাসেও চৈতন্যদেবের অবির্ভাব এক অভাবিতপূর্ব ঘটনা। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াও তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিত রঘুনাথ বা রঘুনন্দনের সংস্কৃত-চর্চা ও শাস্ত্রের আলোচনা ত্যাগ করিলেন; আর তৎস্থলে বাছিয়া লইলেন নিজের ও জনসাধারণের মাতৃভাষা বাংলা। এই ভাষায় তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত প্রচারিত হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং বেদ, পুরাণ, ত্যাগ করিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ফলে, তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরাও বাংলা-ভাষার চর্চায় মাতিয়া উঠিলেন।

আমরা যখন এইদিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতবাদের ন্যায় এই মতবাদ-প্রভাবিত বাংলা-সাহিত্যও ইসলাম প্রভাবে ভরপুর। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, সূফীদের "গজলিয়াৎ" ও বৈষ্ণবদের "পদাবলী" ভাব ও রচনা, উভয় দিক হইতে অনেকখানি এক সূফী-সাহিত্যের 'মৈয়' ও 'শরাব', বৈষ্ণব পদাবলীতে 'প্রেম' ও পিরীতি' হইয়া দেখা দিয়াছে। সূফী-সাহিত্যের 'আশিক' ও 'মাশুক', বৈষ্ণব পদাবলীর 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ'। এই সাহিত্যের 'হিজরান' ও 'বিশাল', বৈষ্ণব পদাবলীর 'বিরহ' ও 'মিলন'।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ', হিন্দুর পৌরাণিক 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ' নহে; তাহার প্রধান প্রমাণ বৈষ্ণব পদাবলী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই 'রাধা' জীবাত্মার এবং এই 'কৃষ্ণ' পরমাত্মার প্রতীক; কৃষ্ণের 'বাঁশরী', জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার 'ডাক'; মধ্যখানে এই দুইয়ের মিলনের অন্তরায় স্বরূপ ঐহিক জীবনের সংসার-ধর্ম 'যমুনা'-

রূপে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। জীবনের পরপার হইতে কৃষ্ণরূপী পরমাত্মার বংশী-ধ্বনি বা ডাক ভাসিয়া আসিয়া রাধারূপী মানবাত্মার জীবনের ঘাটে পৌছিতেছে, আর মানবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য উতলা করিতেছে। তাই, কবি বলিতে পারেন :

"এপার হৈতে বাজাও বাঁশী ওপার হৈতে শুনি।
অভাগিয়া নারী আমি সাঁতার নাহি জানি॥"

এই যে রাধা, এই যে কৃষ্ণ, এই যে যমুনা, এই যে বাঁশী, ইহাদের সহিত পৌরাণিক রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধ কোথায়? আরবের 'আল্লাহ্' যেমন পারস্যে আসিয়া 'খোদা' (সংস্কৃত-'স্বধা' শব্দজাত) শব্দে পরিণত হইয়াছে, পারস্যের সূফী-কবিদের 'আশিক'-'মাশুক'ও তেমন বাংলায় আসিয়া রাধা-কৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়াছে। নাম দুইটি পৌরাণিক বটে, কিন্তু কাম সম্পূর্ণ পৃথক। কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিকে অবলম্ব করিয়া বাঁশরী-লীলা দেখাইবার জন্য যে বিরাট পদাবলী-সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহার মর্মার্থ ও মৌলানা জলালুদ্দীন রূমীর "মসনবী শরীফে"-র সুবিখ্যাত "বাঁশরী-বেদন" কবিতার মর্মার্থ অবিকল এক; দেশভেদে ভাষাভেদে রূপভেদ হইয়াছে- এইটুকুই পার্থক্য!

অতঃপর, বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান শাখাগুলির অন্যতম চরিত-শাখার কথা ধরা যাক। এইগুলিকে বৈষ্ণবেরা 'মহাজন-চরিত' বলিয়া থাকেন। মুসলমানেরা যেমন "তজকিরহ্-ই-ঔলিয়া" লিখিয়াছেন, বৈষ্ণবেরাও তেমন মহাজন-চরিত লিখিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের সহিত যেমন প্রাচীন বৈষ্ণব-মতের মিলের চেয়ে গরমিল অধিক, ঠিক তেমনই প্রাচীন সংস্কৃত 'হর্ষ-চরিত' 'রঘুবংশ' প্রভৃতির সহিত বৈষ্ণব 'মহাজন-চরিতের' গরমিল অধিক দেখা যায়। অথচ শেখ ফরীদুদ্দীন-আত্তারের "তজকিরহ্-ই-ঔলিয়া" যে ঢঙে লেখা, যেরূপ লৌকিক ও আলৌকিক কাহিনী-সম্বলিত জীবনী, "অদ্বৈত-প্রকাশ" (রচনা ১৫৬৮), 'চৈতন্য-ভাগবত' (রচনা ১৫৭৫), 'চৈতন্য-চরিতামৃত' (রচনা ১৫৮৫), প্রভৃতি বৈষ্ণব 'মহাজন-চরিত'গুলিও তেমনই লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী-সম্বলিত জীবনী-গ্রন্থ। যাঁহারা "মসনবী শরীফ" পড়িতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা "তজ্‌কিরহ্-ই-ঔলিয়া" পড়েন নাই এবং বাংলায় তাহার প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করেন নাই,- এমন কথা রক্ষণশীল ও অনুদার ব্যক্তির অজ্ঞতাপ্রসূত উক্তি মাত্র।

মুসলমানেরা স্বাধীনতার যুগে বাংলা-ভাষায় স্বীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের অনুসরণে খাঁটি মুসলিম-সাহিত্য রচনা করিলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কর্তৃক প্রবর্তিত নব্য বাংলা-সাহিত্যেও তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দান আছে, সম্পূর্ণ মুসলিম থাকিয়াই বৈষ্ণব ঢঙে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার সর্বপ্রধান নজীর সপ্তদশ শতাব্দীর আলাওল, যে আলাওল "তোহফা"-এর ন্যায় খাঁটি ধর্মীয়-গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি আবার বৈষ্ণবী-ঢঙে 'পদ'ও রচনা করিয়াছিলেন। কি করিয়া এমন হইয়াছিল, তাহাই ভাবিবার কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে নব্য সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহার আবরণ হিন্দুয়ানী-ঘেঁষা হইলেও অন্তর ছিল সূফী-সাহিত্যের ভাবে পরিপূর্ণ। 'শরাব' যেমন শরিয়তী ইসলামে বিলকুল নিষিদ্ধ হইয়াও, সূফীদের সাহিত্যে পবিত্র হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, হিন্দুদের রাধা-কৃষ্ণও তেমনই পবিত্র হইয়া 'আশিক-মাশুকের' রূপ ও ভাব লইয়া পদাবলী-সাহিত্যে

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মুসলমানেরা সূফী-সাহিত্য পড়িত। হিন্দুরাও তাহাই করিয়াছে। হিন্দুরা যেমন সূফী-সাহিত্যের অনুরূপ পদাবলী রচনা করিয়া মুসলমান হয় নাই, মুসলমানেরাও পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণব বনে নাই। সুতরাং ইঁহাদিগকে "মুসলমান বৈষ্ণব-কবি" বলা যায় না। তাঁহারা মুসলমান কবিই ছিলেন, বৈষ্ণবী-ঢঙে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এইরূপ সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই স্বাধীনতার যুগে বাংলার মুসলমান বাংলা-সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের এই সাধনা সফল হইয়াছিল; বাংলা-সাহিত্য তাঁহাদের দানে ক্রমশঃ বিশিষ্ট হইয়া উঠে। এই সাধনার সম্যক পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে।

শাহ-মুহাম্মদ সগীর প্রাচীনতম কবি মুসলমানদের

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলার মুসলিম-সাহিত্য

(কবি ও কাব্য পরিচিতি)

বাংলার মুসলমানদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, রাজ্যহারা হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা প্রতিবেশী হিন্দুর সহিত ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিলেন না। ফলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া এই দেশের হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও তাহার ফলস্বরূপ জাতীয় বিলুপ্ত-ঐতিহ্য সন্ধান ও উদ্ধারের স্পৃহা জাগিল. তাহাতে রাশি রাশি বাংলা পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়া গেল। তাহার সহিত দুই চারিটি মুসলিম-পুঁথিও যে উদ্ধার পাইল না, তাহা নহে; সংগ্রহের প্রেরণায় মুসলমানের বাড়ি হইতে মুসলিম-পুঁথি সংগৃহীত হইল না। ইহার জন্যই বাংলার মুসলমানদের এক বিরাট জাতীয় সম্পদ ধ্বংস হইয়া যাইতে লাগিল। এই সময়ে মরহুম আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের আবির্ভাব (১৮৬৯–১৯৫৩) না ঘটিলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতাম। তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টায় শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে বাংলার মুসলমানদের যে-সমস্ত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল, বর্তমান আলোচনায় তাহাই আমাদের প্রধান সম্বল। এতৎসত্ত্বেও, প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের দান সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লইতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না। নিম্নে সে-বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শাহ্ মুহম্মদ সগীর

বাংলার মুসলমান কবিগণের মধ্যে ইনিই প্রাচীনতম। ইনি যে-কাব্য রচনা করেন, তাহার নাম "য়ুসুফ-জলিখা"। কাব্যটি সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯–১৪১০) রাজত্ব-কালে রচিত হয়। কবির রাজ-বন্দনার সমগ্র অংশটুকু মূল বানানেই (পুঁথির এই অংশের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত হইল :

পয়ার ছন্দ

"তিরতিএ পরনাম করোঁ রাজ্যক ইস্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর॥
রাজ রাজস্বর মৈদ্ধে ধার্ম্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত॥
মনুস্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পিরথিম্বীর সার॥
ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজএ।

শাহ-মুহাম্মদ সগীর ~~চট্টগ্রামের~~ পূর্ব-বঙ্গের লোক ছিলেন।

পুত্র সিস্য হন্তে তিহঁ মাগে পরাজএ॥
মহাজন বাক্য ইহ পুরন করিআ।
লইলেন্ত রাজ্যপাট বংগাল গৌড়িআ॥
করুনা হীদএ রাজা পুণ্যবন্ত তর।
সবগুণে অসীম অতুল্য মনুহর॥
পুন্নিমার চান্দ জেহ্ন বচন সোন্দর।
মধুর মধুর বানী কহন্ত সোসর॥
রমনী বল্লভ নির্প রসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিমা॥
জিনিলা নৃপতি সব করিআ সমর।
জএবাদ্য দুন্দুমি বাহন্ত উঞ্চসর॥
ভক্ত বৎসল নির্প বিপেক্ষ বিনাস।
পরজা পালন করে জেহ্ন হাবিলাস॥
জাবত জীবন মুঞি দেখিলুঁহি কাম।
তান ভক্তি বিনা ধিক নাহি আর ধাম॥
মোহাম্মদ ছগীর তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহন আছুক জস ভুবন এ তিন॥"

এই "রাজ-বন্দনায়" কবি অতি চমৎকারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি যে 'গ্যেছ' বাদশাহের বন্দনা করিতেছেন, সেই বাদশাহ্ বাহুবলে পিতার কাছ হইতে বাংলা ও গৌড়ের সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কবি যেন বলিতে চাহিতেছেন, তাঁহার প্রশংসিত বাদশাহের কাছ হইতে বাদশাহের পিতা পরাজয় কামনা করিয়াছিলেন,—পুত্রের হাতে পরাজিত হইয়া পিতা যেন গৌরব বোধ করিয়াছিলেন। সমগ্র বাংলার ইতিহাসে একমাত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সহিত তাঁহার পিতা সিকন্দর শাহের যুদ্ধের কথা জানিতে পারা যায়। সুতরাং, কবির উদ্দিষ্ট বাদশাহ্ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯–১৪১০) ব্যতীত কেহ নহেন।

কবির কোন ব্যক্তিগত পরিচয় 'য়ুসুফ জলিখা'-কাব্যে পাওয়া যায় না। লিপিকরের কারসাজিতে না ঘটিলে, এই কাব্যে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের ব্যবহার এখনও চট্টগ্রাম জিলায় দেখা যায়; এইগুলিকে এখন খাস চট্টগ্রামী শব্দ বলা গেলেও, প্রায় পাঁচ শত বৎসর আগে কবির সময়ে বলা যাইত কি-না, এখন তাহা জানিবার উপায় নাই। শব্দ কয়েকটি এইরূপ :— কনে = কে; তরুঞ্জ (ফল)—বাতাবি লেবু; কাচিয়া (ফুল) = কাশ (ফুল); খোহাময়—কুয়াসাময় ইত্যাদি ইত্যাদি। কবি চট্টগ্রামের লোক হউন বা না হউন, তিনি যে পূর্ব-বঙ্গের লোক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করা যায় না। কারণ, তাঁহার কাব্যের সমস্ত প্রতিলিপি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা হইতেই পাওয়া গিয়াছে।

কবি মুহম্মদ সগীর বাংলার কোন দরবেশ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার কাব্যে ভণিতার সংখ্যা খুব অল্প হইলেও তিনি কয়েক স্থলে আপনাকে 'শাহ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; যথা :

'কহে শাহা মোহাম্মদ ইছুফ জলিখা পদ
দেশি ভাষাএ পয়ার রচিত।"

তিনি কোন পীরের মুরীদ হইয়া থাকিলেও, "খিলাফৎ' বা পীরের প্রতিনিধিত্ব লাভ করার পর, 'শাহ্' উপাধি ব্যবহার করিতে অনুমতি পাইতে পারেন। তবে, আজ পর্যন্ত তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আদেশে কবি "য়ূসুফ-জলিখা" রচনা করেন নাই; অন্ততঃ তাঁহার কাব্যে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে তিনি যে সুলতানের রাজকর্মচারী ছিলেন, উপরোদ্ধৃত 'রাজ-বন্দনা'র শেষ চারি ছত্র হইতে তাহা সুস্পষ্ট।

কবি সগীর শুধু কাব্য-রস পরিবেশনের খাতিরে এই কাব্য রচনা করেন নাই; এই কাব্য রচনার পশ্চাতে কবির ধর্ম-প্রেরণা সুস্পষ্ট। সাধক-বংশীয় অন্ততঃ 'শাহ্' উপাধিধারী কবির প্রাণে কাব্যের মধ্য দিয়া ধর্ম-কাহিনীর প্রচার কিছুই অস্বাভাবিক নহে। "দেশী ভাষায়" ধর্ম প্রচারে কবির ভয়ও কম ছিল না। তাঁহার সৎসাহসও কম নয়। ফলে তিনি সে ভয়কে উপেক্ষা করিয়া "য়ূসুফ-জলিখা" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে কবির কৈফিয়তের সমস্তটুকু উদ্ধৃতির যোগ্য :

(বানান সংস্কার করা হইল)

"চতুর্থে কহিমু কিছু পোথার কথন।
পাপ ভয় এড়ি লাজ দৃঢ় করি মন॥
নানা কাব্য কথা রসে মজে নরগণ।
যার যেই শ্রধায় সন্তোষ করে মন॥
ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ।
দোষিব সকল তাক ইহ ন জুয়াএ॥
গুণিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহ ভয় মিছা।
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা॥
শুনিয়াছি মহাজনে কহিতে কথন।
রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন॥
বচন রতন মণি যতনে পুরিয়া।
প্রেমরসে ধর্ম বাণী কহিমু ভরিয়া॥
ভাবক ভাবিনী হৈল ইছুফ জলিখা।
ধর্মভাবে করে প্রেম কিতাবেত লেখা।
ন হৈতে প্রেমক ভাব ইছুফ অন্তর
জলিখা মজিল তাক বিরহ সায়র॥
কিতাব কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
ইছুফ জলিখা কথা অমিয়া অশেষ॥
কহিব কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি॥
দোষ খেম, গুণ ধর রসিক সুজন।
মোহাম্মদ ছগীর ভনে প্রেমক বচন॥"

বাংলা-ভাষাভাষী মুসলমানদিগকে "দেশী-ভাষার" সাহায্যে মুসলিম ধর্মীয় উপাখ্যান শুনানো কবির অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও, তিনি আমাদিগকে যে-কাহিনী শুনাইয়াছেন, তাহাকে অনায়াসেই রসাশ্রয়ী ধর্মকাহিনী বলা যায়।

এই কাহিনী বাইবেল ও কুরআন শরীফে আছে; ফিরদৌসী ও জামীর য়ূসুফ-জলিখায়ও আছে। বাইবেল ও কুরআন শরীফে শুধু গল্পের কাঠামো এবং অন্য দুই গ্রন্থে পল্লবিত। সগীর জামীর (১৪১৪–১৪৯২) পূর্ববর্তী কবি। এই কাব্য প্রণয়নে তিনি ফিরদৌসীকে কতখানি অবলম্বন করিয়াছেন, সে বিষয় গবেষণা-সাপেক্ষ। তবে, ইহাতে শুধু বাংলার আবহাওয়া নহে, গল্পাংশে বাঙালীরও স্থান হইয়াছে–যেমন,– যে সাধু বা সদাগর য়ূসুফ (আ:)-কে কিনিলেন, তাঁহার নাম 'মণিরু'। নামটি বাংলা। 'মণি' শব্দের সহিত 'আরু' প্রত্যয় (তদ্ধিতে) যুক্ত হইয়া "মণিরু" শব্দ গঠিত; যেমন 'সাঁতার' শব্দের সহিত 'আরু' যোগে "সাতারু" 'বোমা' শব্দের সহিত 'আরু' যোগে "বোমারু" শব্দটি গঠিত হয়। এই "মণিরু" অর্থাৎ মণি ব্যবসায়ী যখন সমস্ত ধন শেষ করিলেন, তখন কহিলেন :

"সাধু বোলে মোর ঠাঞি ধন নাহি আর।
তামার ঢেপুয়া লও এই মূল্য তার॥"

সাধু 'তামার ঢেপুয়া' দিয়া য়ূসুফকে কিনিলেন। এই 'তামার ঢেপুয়া'-ও বাংলার। য়ূসুফের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইবন্ আমীনের সহিত 'মধুপুর'-রাজ্যের (ঢাকার ভাওয়ালের 'মধুপুর' নয় তো?) গন্ধর্ব রাজকন্যা 'বিধুপ্রভা'র বিবাহ-কাহিনীও বাংলার।

জৈনুদ্দীন

তৎকালীন বঙ্গের আর একজন বিখ্যাত কবি হইতেছেন, জৈনুদ্দীন। তাঁহার "রসূল-বিজয়" নামক কাব্যের যে একটি মাত্র অনুলিপি এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শুধু দুষ্পাঠ্য নয়, আদ্যন্ত খণ্ডিত। অজ্ঞ লিপিকর পুঁথিখানির এমন সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন যে, ইহা হইতে প্রাপ্ত অংশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন পাঠ সঠিকভাবে নির্ণয় করা একরূপ দুরূহ।

কবি জৈনুদ্দীন গৌড়ের সুলতান য়ূসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১) সভাকবি ছিলেন। তিনি ভণিতায় বারবার সুলতানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাতীয় কয়েকটি ভণিতা এইরূপ :

"দানে ধর্মে হরিশ্চন্দ্র   মানে গুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছুপ খান   আরতি কারণ জান
বিরচিলু পঞ্চালি সন্ধান॥
ভাবে ভব কল্পতরু   জ্ঞানে শুক্র মানে গুরু
ধ্যানে হর মহেশ সমান।
সান্ত দান্ত গুণবন্ত   মর্য্যাদার নাহি অন্ত
পীর শাহা মোহাম্মদ খান॥
তান পদরজ-পঙ্ক,   ভালে তিল পরি রঙ্গ
কহে জৈনুদ্দীন ইহ লোকে।
জয় দিব নিরঞ্জন   ধর গিয়া সে চরণ
কোন শোকে ভাব মন দুখে॥"

অন্যত্র :—

"শ্রীযুত ইছুপ খান রাজ্যেশ্বর গুণবান
সুচরিত সুবুদ্ধি সুঠাম।
রছুল-বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি
সহপ্রীতি বসিল সভানা॥"

অন্যত্র :—

"শ্রীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত।
রছুল-বিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত॥"

আবার :—

"রছুল বিজয়-বাণী সুধারস ধার।
শুনি গুণিগণ মন আনন্দ অপার॥
সুধীর সুজ্ঞানবন্ত (অতি) সুগায়ক।
শুনি পরিতোষ ভেল ইছুপ নায়ক॥"

উপরি-উদ্ধৃত ভণিতাগুলিতে কোথাও "য়ুসুফ শাহ্" বলিয়া উল্লেখ না থাকায় এবং তৎস্থলে 'ইছুপ খান" বলিয়া বর্ণনা করায়, কেহ কেহ এই "য়ুসুফ খান" গৌড়ের অধিপতি নহেন বলিয়া মনে করেন। এই ধারণা ভুল। কবি কর্তৃক ব্যবহৃত "রাজরত্ন" ও "রাজেশ্বর" কথায় ইনি যে গৌড়াধিপতি ছিলেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবে মনে হয়, য়ুসুফ শাহ তখনও "যুবরাজ" অর্থাৎ গৌড়ের ভাবী অধিপতি। তাঁহার 'খান' উপাধিই এই মতের পরিপোষক। অধিকন্তু তাহাকে কবি "ইছুপ নায়ক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যত্র 'নায়ক' অর্থে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে "যুবরাজ" বুঝানো হইয়াছে, যথা :

"শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান॥"

কবি জৈনুদ্দীনের "রসূল-বিজয়" ঠিক মৌলিক রচনা নহে। গল্পটি কবি কোন ফারসী পুস্তক হইতে লাভ করিয়া থাকিবেন। তবে, ইহা যে হুবহু ফারসীর অনুবাদ নহে, তাহা পুস্তকটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গল্পটির মূল বৃত্তান্তের জন্য কবি যে ফারসী সাহিত্যের নিকট ঋণী, সে কথা পুস্তকের শেষের দিকে আমীরের যুদ্ধ-বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি এইভাবেই স্বীকার করিয়াছেন :

"দোহানের গদাযুদ্ধে কর্ণে লাগে তালি।
সিংহ ব্যাঘ্র চমকিত ধাএ কর্ণ তুলি॥
যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার।
গদা তুলি লএ দেখি ধাইত সত্বর॥
কিবা কৃপাচার্য্য যে বিরাট অভিমন্যু।
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য॥
বিস্তর আছিল যুদ্ধ কিতাবে লিখন।
কিঞ্চিত লেখিলু লোকে জানিতে কারণ॥"

আমীরকে পৌরাণিক হিন্দু যোদ্ধা ভীম ও অভিমন্যু হইতে বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে– ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে "বিজয়-কাব্য" এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্য; যেমন "মনসা-মঙ্গল" "চণ্ডী-মঙ্গল" প্রভৃতি "মঙ্গল কাব্য"। এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল,– লৌকিক-আলৌকিক দিগ্বিজয়-কাহিনীর মধ্য দিয়া নায়কের মাহাত্ম্য প্রচার। জৈনুদ্দীনের "রসূল-বিজয়"ও এই শ্রেণীর কাব্য। ইহাতে হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (দ:)-র দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণিত আছে। তবে, ইহাতে কতকগুলি ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম ব্যতীত অন্য কোন ঘটনা ঐতিহাসিক নহে। অথচ এমন একটা ঘটনা ফারসী-সাহিত্য হইতে লওয়া হইয়াছিল বলিয়া কবি উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্য-বর্ণিত ঘটনাটি অতি সংক্ষেপে নীচে প্রদত্ত হইল।

হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (দ:)-র দিগ্বিজয়-কালের একটি ঘটনা। তিনি জয়কুম রাজার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছেন। মদীনা হইতে জয়কুম রাজার রাজ্য ছয় মাসের পথ। তাঁহার যুদ্ধ-যাত্রার বর্ণনা :

"তার পাছে মাগে সাজ নবী রাজেশ্বর।
মুকুতামণ্ডিত তাজ অতি মনোহর॥
লাল যে কাবাই শোভে জিনি দিবাকর।
প্রভুর পরম সখা পরম সুন্দর॥
নবীর কিঙ্কর ছিল নামে যে বিল্লাল।
বিবিধ বিধানে অশ্ব সাজায় তৎকাল॥
সুচারু ধবল অশ্ব সুবর্ণ-মণ্ডিত।
হীরার লাগাম জিন মুকুতা-শোভিত॥
চারিদিকে চামর দোলায় সবখন।
গরুড়ের গতি সম ভাতি বিচক্ষণ॥
দেখিতে সুন্দর অশ্ব অতি মনোহর।
রহিত সুধীর গতি বঞ্চিত দোসর॥
সেই অশ্ব পরে নবী আরোহণ যবে।
আদ্য ছত্র ধরি ছায়া করিলেন্ত তবে॥
সুসজ্জ হইয়া নবী যুদ্ধ যাত্রা কৈলা।
মঙ্গল-বিধানে সৈন্য বলিতে বলিলা॥"

"মঙ্গল-বিধান" অর্থাৎ 'নারা-ই-তকবীর' বলিয়া নবী যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। নদ-নদী, ঝাড়-জঙ্গল পার হইয়া তিনি পথ চলিলেন। পথে জয়কুম রাজার চর এক জালিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই চরের মারফতে নবী জয়কুম-রাজকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। জয়কুমরাজ বাহরাম পত্র পাইলেন; ক্রোধে তাঁহার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। রাজা ইসলাম গ্রহণ করিলেন না; রসূলও যথাসময়ে জয়কুম রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয় পক্ষে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। যথাসময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে এক ভীষণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়কুম-রাজের পরাজয় ঘটিল। নবী-পক্ষীয়দের প্রচণ্ড বিক্রম দেখিয়া :

"ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ।
পদ্মাকূল বাএ যেন উলটে তরঙ্গ॥"

কবি মুজম্মিল ও তাঁর অবদান

যুদ্ধ-শেষে নবী-পক্ষীয়েরাও শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। উভয় পক্ষ বিশ্রাম গ্রহণ করিল। বিশ্রামান্তে উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। কত রকমের অস্ত্র-শস্ত্র যে সংগৃহীত হইতে লাগিল, বলা যায় না। যথারীতি শক্তি-সঞ্চয় ও মহা-আয়োজন-কার্য সমাধা করিয়া উভয় পক্ষ প্রভাতে রণক্ষেত্রে আবার শক্তি পরীক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইল।

এইরূপে একে একে কয়েকদিন যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে জয়কুম-রাজের তিন তিনটি পুত্র পরাজিত ও বন্দী হইল। অতঃপর রাত্রে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে জয়কুম-রাজের আদেশে এক শত কূপ খনন করিয়া তাহার মুখ 'ঢাকনি' দিয়া গোপনে আবরণ দেওয়া হইল। প্রভাতে যুদ্ধ করিতে আসিয়া আলী এই কূপে পড়িয়া গেলেন। চতুর্দিক হইতে শূল, বাণ বর্ষিত হইল। বহু কষ্টে আলী কূপ হইতে উদ্ধার পাইলেন। তখন তাঁহার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। আলী সমস্ত কথা নবীকে কহিলেন।

"এতেক শুনিয়া নবী করুণা অন্তর।
আলীর অঙ্গেতে বুলাইলা নিজ কর॥
যত সব ঘাও তার শরীর মাঝার।
ক্ষত নাহি হৈল হেন পূর্ব্বের আকার॥"

আরোগ্যান্তে আলী আবার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এইবার প্রতিশোধ বাসনায় তাঁহার বল-বীর্য চতুর্গুণ হইয়া দেখা দিল, আর—

"শতে শতে বীরেন্দ্র ধরিয়া হায়দর।
মারেন্ত আছাড়ি সব ভূমির উপর॥
অতি কোপে ধরি শত করিবর দন্ত।
ভ্রমাই ক্ষেপন্ত সৈন্য মারন্ত অনন্ত॥
যদি কভু সম্মুখে দেখন্ত গিরিবর।
উপাড়ি ক্ষেপন্ত বীর বিপক্ষ সৈন্য পর॥"

(অতঃপর পুথি খণ্ডিত)

মুজম্মিল

কবি মুজম্মিল বাংলার প্রাচীন মুসলিম কবিদের অন্যতম। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার তিনখানা পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; যথা :– (ক) নীতিশাস্ত্র বার্তা, (খ) সায়াৎনামা (গ) খঞ্জন-চরিত্র। এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে "খঞ্জন-চরিত্র" কোন পৃথক পুস্তক বলিয়া মনে হয় না। ইহা মাত্র কয়েক পাতার সমষ্টি। "সায়াৎনামা"র একটি অধ্যায়ের নাম "খঞ্জন-বাখান"। ভাবে ও ভাষায় "সায়াৎনামা"র সেই অংশের সহিত "খঞ্জন চরিত্রে"র বিশেষ মিল থাকায়, "খঞ্জন-চরিত্র"কে আমি "সায়াৎনামা"র অংশ বিশেষ বলিয়া মনে করি। কোন নকলকারক কাব্যখানির এই অংশটুকুকে পৃথক ভাবে নকল করিয়া প্রচার করার ফলে ইহা একটি পৃথক ক্ষুদ্র পুঁথি হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে করিবার পক্ষে যুক্তি আছে।

কবির "নীতিশাস্ত্রবার্তা"র, কয়েক স্থানে এবং "সায়াৎনামা"র দুই-এক স্থলে যথাক্রমে "য়ূসুফ" ও "মুহম্মদ শফী"র ভণিতা থাকায় পুঁথি দুইখানির রচয়িতা তিন ব্যক্তি বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, পুঁথি দুইখানিতে শুধু মুজম্মিলের ভণিতা এত

বেশী যে, ইহাদের মূল-রচয়িতা যে মুজম্মিল, সে-কথা বুঝিয়া লইতে কোন কষ্ট হয় না। য়ূসুফ ও মুহম্মদ শফী যেখানে ভণিতা যোগ করিয়াছেন, সেখানেই মুজম্মিল ও তাঁহাদের ভাষার প্রভেদ ধরা পড়ে। খ্যাতনামা গ্রন্থকারের নামের সহিত নিজের নাম যোগ করিয়া অমরত্ব লাভের প্রলোভন প্রাচীনকালের বহু অনুলেখক সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে; ফলে "সায়াৎনামা"র শেষে মুহম্মদ শফী কর্তৃক গ্রন্থ রচনার যে তারিখটি (১৬৮৯ শকাব্দ বা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) দেওয়া আছে তাহাকে পুঁথি রচনার তারিখ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; ইহার কারণ বহু। ইহা যে মুহম্মদ শফী কর্তৃক পুঁথি নকলের তারিখ, তাহার প্রধান প্রমাণ তাঁহার "নূরনামা" নামক গ্রন্থের প্রতিলিপি। এই প্রতিলিপিটি ১১৫৮ মঘী বা ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইহা শফীর হাতের লেখা পুঁথি না হইলেও, তাঁহার জীবনকাল আরও ৫০ বৎসর আগে ধরা যায়। সে হিসাবেও ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শফীর জীবিত থাকিবার কথা।

সে যাহা হউক, কবি মুজম্মিল সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন পরবর্তী কবি মুহম্মদ মুকীম। "গোলে-বকাওলী" পুঁথিতে কবি মুকীম চট্টগ্রামের তৎপূর্ববর্তী কবিদের নাম করিতে গিয়া সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, আলাওল প্রভৃতির সহিত কবি মুজম্মিলের নামও করিয়াছেন। "গোলে-বকাওলী" রচনার তারিখ নাই বটে, তবে তাঁহার অন্য গ্রন্থ "ফায়েদুল মুকতদী" রচনার তারিখ আছে; ইহা এইরূপ :

"ঋতু বেদ চন্দ্র শত আশী আর নয়।
ইতি সার জান মঘী সনের নির্ণয়॥"

ইহা হইতে ১০৯৯ মঘী (চন্দ্রশত আশী=১০৮০+নয়=৯+ঋতু=৬+বেদ=৪) অর্থাৎ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তাহা হইলে কবি মুজম্মিল কিছুতেই সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী কবি হইতে পারেন না।

তবে কি তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি? না, তাহাও নয়। কেননা, তাঁহার "সায়াৎনামা"র পাণ্ডুলিপিটি (১৭৫৭) যেমন প্রাচীনত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ বহিতেছে, ঠিক তেমনই তদ্রচিত "নীতিশাস্ত্র-বার্তা"র ভাষা এবং তদনুধ্যেয় পীরের সময় ও তাঁহার আবির্ভাব-কালের সমধিক প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছে। 'নীতিশাস্ত্রবার্তা'র প্রথম দিককার আট চরণ উদ্ধৃত করিতেছি :

"আরবী ভাষায় লোকেঁ ন বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলুঁ পয়ার রচন॥
যে বলে বলৌক লোকে' করিলুঁ লিখন।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ ন যাএ খণ্ডন॥
রচিলেক মোজাম্মিলে পঞ্চালি সুছন্দ।
দেশি ভাষে রচিলুং মাঝে মৃদু মন্দ॥
নীতিশাস্ত্র-বার্তা যে জন পড়এ শুনএ।
আপ্তযশ বাঢ়ে জান দারিদ্র্য খণ্ডএ॥"

উদ্ধৃত অংশের নিম্নরেখ শব্দগুলির অধিকাংশ শব্দ ও ব্যবহার-ব্যবস্থা সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় বিরল। 'লোকেঁ', 'বলৌক' শব্দের ব্যবহার সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলায়

একেবারেই নাই। তবে কি এই ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর? হ্যাঁ তাহাই বটে। এই কথা জানা যাইতেছে অন্য উপায়ে। কবি লিখিয়াছেন :

"শাহা বদরুদ্দিন পীর কৃপাকুল হরি।
শত মুখে সে বাখান কহিতে না পারি॥
তাহান আদেশ-মাল্য শিরেত ধরিয়া।
রচিলেন্ত মোজাম্মিলে মনে আকলিয়া॥"
(সায়াৎনামা)

এই শাহা বদরুদ্দীন কে? বিহারের বিখ্যাত পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম বর্ধমান জেলার কালনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামেও আগমন করেন বলিয়া প্রবাদ ও প্রমাণ আছে। অনেকেই মনে করেন, চট্টগ্রামের পীর বদর শাহ (প্রাচীন পুঁথির 'বদর আলাম') ও বিহারের পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম এক ও অভিন্ন। তিনি ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার চট্টগ্রামের স্মৃতি 'বদর শাহের' স্মৃতির সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালনায় তাঁহার নকল-সমাধি আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি যখন চট্টগ্রাম আগমন করেন, তখন কবি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাহা হইলে, কবি মুজম্মিল ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পূর্বে ও পরে জীবিত ছিলেন। অতএব তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের না হইলে মধ্যবর্তী সময়ের লোক বলিয়া ধরা যায়। এই জন্যই তাঁহার ভাষা এত প্রাচীন।

তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন: তাহা কবি মুকীমের সাক্ষ্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। অধিকন্তু, তিনি সুফী-পন্থী কবি ছিলেন: পীরের শিষ্যত্বও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার "সায়াৎনামা"-ও ইহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। 'ইলমু-স-সায়াৎ' সুফীদের 'ইলমু-ত-তসব্বুফ'-এর একটি শাখা। কবি বাংলায় এই সুফী-জ্ঞানের শাখাটিরই সদ্ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। তিনি 'সায়াৎনামায়' লিখিয়াছেন,—

"আরবী ভাষায় সভে ন বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলু পয়ার রচন॥"

'ইলমু-স্-সায়াৎ'-এর কোন কোন বিষয় এই পুস্তকে আছে; ইহার বহির্ভূত বাংলাদেশের সংস্কারাদির আলোচনাও বহু; যেমন—

"শ্রাবণ মাসেত যদি কেহ বান্ধে ঘর।
সেই দোষে মরিবেক গৃহের ঈশ্বর॥"

এতদ্ব্যতীত 'স্নানের বাখান', 'খঞ্জনের বাখান' ইত্যাদিও আছে। এই পুস্তকের দীর্ঘ আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব নহে। তবে কবি ইহা আরবীর অনুবাদ বলিয়া ঘোষণা করিলেও, ইহা যে স্থল-বিশেষে ভাবানুবাদ এবং স্থল-বিশেষে বাংলাদেশের সংস্কারের সমাবেশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

'নীতিশাস্ত্র-বার্তায়' বহু বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সংক্ষেপে প্রধান-প্রধান বিষয় বলিতেছি : —ভূমিকম্প, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহণ, স্বপ্ন-বৃত্তান্ত, শুভাশুভ-বিচার, শাচন-পক্ষীর কথা, গৃহদাহ, নহস-আকবর, যোগিনীর বয়ান, গৃহ-হেলনের কথা, যোগিয়ার বিবরণ, সপ্তরোজার কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

চাঁদ কাজী

ইনি গৌড়ের সুলতান সয়্যিদ আলাউদ্দিন হুসৈন শাহের (১৪৯৩—১৫১৯) কর্মচারীরূপে নবদ্বীপ বা নদীয়ার কাজী ছিলেন। ইনি যে বাঙালী ছিলেন, তাহা তাঁহার নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। নবদ্বীপে কাজীর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা একটি অপূর্ব ঘটনা। ইহা আর কিছুই নহে, পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের' প্রচার ও প্রসার। বৈষ্ণব-ইতিহাসে এই চাঁদ কাজী নানা কারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

চাঁদ কাজী কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি-না, সে কথা জানা যায় না। তবে, তিনি যে 'পদ'-রচনা করিয়াছিলেন, এবং একজন উচ্চ শ্রেণীর পদকর্তা ছিলেন তাহার প্রমাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত তদ্রচিত একটি পদে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি রাধিকার কানে প্রবেশ করিলে, তাঁহার যে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, পদটিতে বংশীধ্বনির সেই মাদকতাটুকু প্রকাশ করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। ইহাতে মৌলানা জালালুদ্দীন রুমীর 'মসনবী' শরীফের 'বাঁশী' কবিতার ছাপ সুস্পষ্ট। ইহা পারস্যের সূফী কবিদের 'গজলিয়াৎ'-কে স্মরণ করাইয়া দেয়।

শেখ কবীর

শেখ কবীরও একজন পদকর্তা। গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯—১৫৩২) তিনি আবির্ভূত হন। পদকর্তা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহা না হইলে, 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'র ন্যায় বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহে রাধিকার 'হোলী-খেলা'র একটি পদ কবির ভণিতায় স্থান পাইত না। অবশ্য 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'তে উদ্ধৃত পদটিতে শুধু 'কবীর' নামটিই বিধৃত আছে। এই 'কবীর' ও 'শেখ কবীর' যে এক ব্যক্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ পোষণ করা অনুচিত। 'রাধার রূপ-বর্ণনা' দিতে গিয়া কবি শেখ কবীর যে-পদটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভণিতায় আছে :

"সেক কবীরে ভণে,
অহি গুণ পামরে জানে
ছুলতান নাসির সাহা ভুলল কমল-বনে।"

কবি যেভাবে সুলতান নসরৎ শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি সুলতানের অধীনে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাধিকার রূপ-বর্ণনা শুনিয়া সুলতান যে প্রেমের কমল-বনে ভুলিয়া প্রবেশ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রেমমুগ্ধ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার একটি গুণ এবং সুলতানের এই গুণ-সম্বন্ধে 'পামর' কবি অবগত আছেন। কবি রাজকর্মচারী না হইলে, সুলতানের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া নিজেকে 'পামর' বলিয়া পরিচয় দিতেন কি-না সন্দেহের কথা। এই প্রসঙ্গে শ্রীখণ্ডের 'বিদ্যাপতি' উপাধিক কবিরঞ্জনের উক্তিটিও তুলনীয়। তিনিও নসরৎ শাহের নামোল্লেখ করিতে গিয়া শেখ কবীরের মত ভাষারই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনিও সুলতানের কর্মচারী ছিলেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, বৈষ্ণব পদকর্তা 'কবি শেখর' পাণ্ডুলিপিকারের দোষে 'শেখ কবীরে' পরিণত হইয়াছে। কবি শেখরের একটি পদ শেখ কবীরের পদটির অনেকখানি অনুরূপ। ইহাই তাঁহার উক্ত অনুমানের মূল ভিত্তি। 'কবি শেখর'

যদি 'শেখ কবীর' হইতে পারে, তবে অনুলিপিকারের দোষে 'শেখ কবীর' যে 'কবি শেখর' হইতে পারে না, এই কথা কি বলা যায়? বিশেষতঃ কবি শেখর যে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের লোক, সে-কথা ডক্টর সুকুমার সেন প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু, শেখ কবীর সুলতান নসরৎ শাহের নাম উল্লেখ করায়, ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের লোক হইয়া পড়িয়াছেন। কবি শেখরের অন্য পদে যদি সুলতান নসরৎ শাহের উল্লেখ থাকিত, তবে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অনুমান সত্য হইলেও হইতে পারিত।

আফজল আলী

বাংলার প্রাচীন মুসলমান কবিদের মধ্যে আফজল আলী অন্যতম। ইঁহার 'নসীহৎনামা' নামে একটি পুস্তক ও কয়েকটি বৈষ্ণবীয় ঢঙে লিখিত পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পদগুলির মধ্যে দুইটি ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামক পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে এবং একটি পদ ১৩২৫ বাংলা সনের পৌষ সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত মিলুয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভংগু ফকীর। তিনিও একজন আলিম ও দরবেশ ছিলেন। কবি ছিলেন শাহ্ রুস্তমের শিষ্য। এই শাহ্ রুস্তম সম্বন্ধে কবি বলেন :

চাটিগ্রাম মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র এক গ্রাম।
মিলুয়া করিয়া আছে সে গ্রামের নাম॥
সেই গ্রামে হৈল এক ফকীর আল্লার।
এ চারি মঞ্জিল ভেদ দিল করতার॥
শাহা যে রুস্তম করি ছিল তান নাম।
আল্লার হইল কৃপা গুণে অনুপাম॥
গায়েবী মরতবা প্রভু তাহানে যে দিলা।
গায়েবীর ভেদ যত কহিতে লাগিলা॥
গায়েবী ফকীর বলি দেশ দেশান্তর।
তান খেয়াতি একে একে হইল প্রচার॥

সাতকানিয়ায় এখনও রুস্তমের হাট, শাহ রুস্তমের দরগাহ বর্তমান। স্থানীয় লোকের মতে এই দরবেশ তিন-চারি শত বৎসরের প্রাচীন লোক। ইহা হইতে কবির সময় সম্বন্ধে একটা সাধারণ প্রাচীনত্বের ধারণা জন্মে।

'নসীহৎনামা'র যে পাণ্ডুলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। ইহা অনুলিখিত হইয়াছিল মুহসিন আলী নামক আর এক কবি কর্তৃক। তিনি লিখিয়াছেন :

"এই পুস্তক লিখিলাম মোছন আলী হীনে।
সাঙ্গ হৈল চব্বিশ মঘীর বারই আশ্বিনে॥"

এই অনুলেখক মুহসিন আলী "মোকাম-মঞ্জিল কথা" নামক অন্য এক পুস্তক এবং কয়েকটি পদের রচয়িতা। তিনি যে 'নসীহৎনামা' ১১২৪ মঘীতে অর্থাৎ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে নকল করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ১০২৪ মঘী অর্থাৎ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের নকলও হইতে পারে। তিনি যে ইহার চেয়েও প্রাচীন কবি হইতে পারেন,

তাহার প্রমাণ শুধু শাহ্ রুস্তমের আন্দাজী সময় নয়, অন্যত্রও মিলিতেছে। তাঁহার একটি পদের ভণিতায় দেখা যায় :

ছৈয়দ পেরোজ শাহা সুধাময় অবগাহা
ভজ সখি সুরঙ্গ চরণ॥

এই সয়্যিদ ফীরূজ শাহ্ কে? ইনি কবির পীর নহেন, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। প্রথমতঃ, কবির পীর শাহ্ রুস্তম। দ্বিতীয়তঃ, এক ব্যক্তির দুই পীরের কোন উদাহরণ বা রেওয়াজ নাই। তৃতীয়তঃ, ফীরূজ শাহের নামোল্লেখের ঢঙ প্রাচীন কবিদের বাদশাহের নামোল্লেখের রীতিতে করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই ফীরূজ শাহ্ বাদশাহ্। তিনি আবার সয়্যিদ। অতএব, ইনি সুলতান নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফীরূজ শাহ (১৫৩২–১৫৩৩) ব্যতীত আর কেহ নহেন। ফীরূজ শাহকে 'সুলতান' না বলিয়া বংশগত 'সয়্যিদ' উপাধিতে উল্লেখ করায়, মনে হইতেছে, ফীরূজ শাহের যুবরাজ অবস্থায় কবি কোন প্রকারে তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, চট্টগ্রামের হিন্দু কবি 'বিদ্যাসুন্দর'-প্রণেতা দ্বিজ শ্রীধরও ফীরূজ শাহের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া 'বিদিত যুবরাজ' কথার প্রয়োগ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, 'নসীহৎনামা' গ্রন্থের বিষয়-বস্তু ধর্মোপদেশ মাত্র। স্বপ্নাদেশচ্ছলে ইহাতে ইসলাম ধর্মের নানা কথা আলোচিত হইয়াছে। দরবেশ শাহা রুস্তম স্বপ্নে তাঁহার শিষ্য কবি আফজল আলীর মুখ দিয়া ধর্মোপদেশ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এই স্বপ্নলব্ধ বাক্যগুলি কুরআন ও হাদীসের রচনাবলীর দ্বারা সমর্থিত। এই সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ :

শাহা রুস্তম পদে মাগি পরিহার।
যতেক কহিলা গুরু সব বাক্য সার॥
দিনে দিনে বুঝি পাইলু বচন তোমার।
হেন বুদ্ধি না দেখি আখের হৈতে পার॥
অধম আফজল আলী অতি গুনাগার।
পদবন্ধে যত স্বপ্ন দেখিলু তোমার॥
খোয়াবের যত বাণী আদ্যেত লেখিয়া।
তজবিজ করিল ফাজিলের পাশে নিয়া॥
উপহাস্য করে বুলি মোনাফেকগণ।
আয়েত হাদীছ লেখিয়াছি তেকারণ।
খোয়াব বলিয়া শাহা রুস্তমে কহিল।
খোয়াব বলিয়া তবে পদবন্দী কৈল॥

* * *

গুণিগণ-পদে প্রণামিএ পুনি পুনি।
ভাবে ডুবি যেবা পড়ে ছাড়ে কুফরানী॥
এই পুস্তকেত যত শাস্ত্র অনুপাম।
খোয়াব যে নছিয়তনামা তার নাম॥

এই গ্রন্থে কোন কবিত্ব নাই বটে, তবে ধর্মোপদেশ আছে। ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের উপদেশ বাংলায় বিশেষ প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

এ-যাবৎ এই শ্রেণীর বাংলা পুস্তক খুব কমই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিলে আফজল আলীর 'নসীহৎনামা' এই যুগের মুসলিম-বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করিবে।

পদকর্তা হিসাবেও কবি আফজল আলী উপেক্ষার পাত্র নহেন। তিনি স্বয়ং সাধক ছিলেন বলিয়াই হউক অথবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, তাঁহার প্রকৃত কবিপ্রাণের সন্ধান তাঁহার পদেই বেশী করিয়া পাওয়া যায়। এই পদগুলির ভাষা সরল ও মর্মস্পর্শী।

সাবিরিদ খান

কবি সাবিরিদ খান কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার কোন গ্রন্থই সম্পূর্ণ হস্তগত হয় নাই। ফলে, তাঁহার কোন বিবরণ লাভ করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার যে তিনখানি গ্রন্থ খণ্ডিত আকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এই :

(ক) বিদ্যাসুন্দর (খ) রসুল-বিজয়, (গ) হানিফা ও কয়রা-পরী। এই গ্রন্থ-ত্রয়ের মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দরের' এক স্থলে তিনি ভণিতায় অতি অল্প বংশ-পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ :

পিয়ার খান মহল্লিক
- উজিয়াল খান মহল্লিক
  - জী-ঠাকুর সরকার
  - মুছা খান মহল্লিক
    - নানু রাজা খান মহল্লিক
      - সাবিরিদ খান

এই বংশ-বিবরণ হইতে দেখা যায়, কবি 'খান' উপাধিক পাঠান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং না হইলেও তদ্বংশীয় সকলেই হয় 'মহল্লিক', না হয় 'সরকার' পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতা 'নানুরাজা'-র কৃতিত্বেই চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ইছাপুর পরগনার 'নানুপুর' গ্রাম স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নামকরণ করা হয়। এই গ্রামের ফজলুর রহমান মাষ্টার সাহেব সাবিরিদ খানের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। তবে, তিনি কবি ছিলেন কি-না সে-কথা মাষ্টার সাহেব জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

কবির সময় সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলিবার উপায় নাই। তাঁহার কাব্যে ব্যবহৃত ভাষাই প্রাচীনত্বের একমাত্র সাক্ষী। তাঁহার ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিককার

ভাষা। সুতরাং তিনি যে বাংলার স্বাধীনতার যুগের কবি, সে-বিষয়ে অদ্যাবধি সন্দেহ করিবার মত উপাদান আমাদের হস্তগত হয় নাই। 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'রসুল-বিজয়'-এর পাণ্ডুলিপি প্রাচীনতর বলিয়াই হউক, অথবা অধিকতর জনপ্রিয় হয় নাই বলিয়াই হউক, এই দুই কাব্যে যে-সমস্ত ব্যাকরণগত ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকের বা সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থে দেখা যায় না। তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :

রসূল-বিজয়ে :— (ক) দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রায় সর্বত্র পরবর্তী কালের 'কে' বিভক্তির স্থলে 'ক' প্রয়োগ দেখা যায়। যথা— "আলিক', 'রাজাক', 'তোহক'।

(খ) মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ায় 'করসি', 'হওসি' প্রভৃতি ব্যবহার।

(গ) উত্তম পুরুষের ক্রিয়ায় 'দেওম', 'আনম' প্রভৃতির স্থলে প্রাচীনতর 'দেও', 'আনো' প্রভৃতির প্রয়োগ।

(ঘ) মূর্ধন্য 'ষ'-এর স্থলে মৈথিলী ভাষার ন্যায় 'খ', যথা—

"সাবিরিদ খানে কহে রসুল বিজয়।
শুনি বুধ কর্ণ পুরি সুধা বরিখয়॥"

(ঙ) প্রচলিত 'বিবাহ' অর্থে ফারসী 'শাদী' শব্দের ব্যবহার নাই; মূল অর্থ 'আনন্দ' অর্থে শব্দটির ব্যবহারও বিশেষ প্রাচীনত্বজ্ঞাপক; যথা—

"রাজপুত্র অমাত্য উজীর মন্ত্রী আদি।
প্রতি ঘরে ঘরে সবে করিলেন্ত শাদী॥"

(চ) সর্বনামে সর্বত্র 'আক্ষি', 'তুক্ষি' প্রভৃতি রূপ।

বিদ্যাসুন্দর :— এই পুস্তকে 'রসুল-বিজয়'-এর 'ক', 'খ', 'গ', 'চ' চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যগুলি তো বর্তমান আছেই, তদুপরি আরও কয়েকটি প্রাচীনতাব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়; তাহা এইরূপ :

(অ) প্রাচীনতর ক্রিয়ার শব্দ; যথা—লাখ (লক্ষ্য করিয়া অর্থে), পেখি (দেখিয়া অর্থে), হন্তে (হইতে অর্থে), করন্তি (করে অর্থে), ভেল (হইল) ইত্যাদি।

(আ) অনুজ্ঞায় বর্তমান—'উক'-প্রত্যয় প্রাচীন-'উ'-রূপে :— খণ্ডউ, হউ; যথা—

"বিশেষ পাইছ কষ্ট আক্ষার উদ্দেশে।
বাঞ্ছাসিদ্ধি বর দিলুঁ থাক মন-তোষে॥
শরীর রোমাঞ্চ রাজা দণ্ড পরণাম।
সংসারে খণ্ডউ মোর অপুত্রতা নাম॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে রূপে গুণে অনঙ্গ শরীর।
অবনী বিজয়ী হউ সুত বলী ধীর॥"

(ই) 'বালি' শব্দের 'বালিকা' অর্থে প্রয়োগ; 'কৈয়ার স্বরূপ' কথার প্রয়োগও প্রাচীন; যেমন :

"কৈয়ার স্বরূপ বাচ সুচরিতা লাসি।
কি হেতু কুমারী বিদ্যা পুরুষ বিদ্বেষী॥"

(ক) **বিদ্যাসুন্দর** :– বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান অতি প্রাচীন। সংস্কৃত কবি বিহ্লনের 'চৌরপঞ্চাশিকা'ই বোধ হয় এই উপাখ্যানের প্রাচীনতম নির্দশন। কিন্তু, সাবিরিদ খান বিহ্লন হইতে এই উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছিলেন কি-না, বলিতে পারি না। তবে তিনি যে এই 'নাট্যকাব্য' সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, কবি প্রত্যেকটি প্রস্তাবের গোড়ায় সংস্কৃত শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের আভাস দিয়া, বাংলায় তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা-ভাষায় আরও দুইখানি এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও দুইখানি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিজ শ্রীধর ও কবি কঙ্কের কাব্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীতে যাঁহারা 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন, তাঁহাদের নাম গোবিন্দ দাস ও কৃষ্ণরাম দাস। ইঁহাদের কাহারও ভাষায় সাবিরিদ খানের ভাষার প্রাচীনত্ব দেখা যায় না। কবি সাবিরিদ খান ইঁহাদের সকলেরই আগের লোক কি-না, তাহা কে বলিবে?

সাবিরিদ খানের "বিদ্যাসুন্দর" ঠিক কাব্য নহে। ইহাতে নাট্যকলা প্রস্ফুট না হইলেও, অস্ফুট নহে। প্রত্যেকটি বর্ণনা যেন এক একটা দৃশ্যের চিত্র। ফলে, কাব্যখানিতে নাটকীয় গুণ ফুটিয়া উঠায় ইহা একটি 'নাট্য-কাব্য' হইয়া উঠিয়াছে। কবিও এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন :

সাবিরিদ খানে ভণে বিজ্ঞজন স্থানে।
অশুদ্ধ দেখিলে পদ-শুধিবা যতনে॥
এ নাট গীতেত তাল ন করিবা ভঙ্গ।
এক মনে শুনিলে বাড়িব মনোরঙ্গ॥

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী ভারতে সুপরিচিত। তবু, সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দর অপরাপর বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী হইতে কথঞ্চিৎ প্রভেদ। তাঁহার কাব্যে সুন্দরের পিতার নাম গুণসার, মাতার নাম কলাবতী। তিনি বিজয়নগরী-রাজ্যের রত্নাবতীপুরীর রাজার সন্তান। তিনি যখন জ্ঞানে ও কাব্যকলায় অসাধারণ পারদর্শী হইলেন, তখন–

বিদ্যায় বিদ্বান অতি জিনিয়া কুমার।
বিদ্যাপতি নাম পুনি রাখিল তাহার॥

বিদ্যার পিতার নাম একস্থলে বিক্রমকেশরী, আর একস্থলে বীরসিংহ, মাতার নাম শীলাদেবী, বাসস্থান উজানী-নগরের কাঞ্চীপুর নগরীতে। বিদ্যাও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া 'বিদ্যাবতী' নাম গ্রহণ করিলেন এবং বিদ্যায় যে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন বলিয়া দেশে দেশে ভাট পাঠাইলেন। এই ভাটের নাম মাধব। মাধব ভাটের মুখে বিদ্যার কথা শুনিয়া সুন্দর উজানী-নগরে আসিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত। কোন মালিনীর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি মালিনীর বাড়িতে রাত্রিযাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে পর মালিনী বলিল :

উজানী-নগর নাম বিদিত ভুবন।
বিক্রম-কেশরী নাম প্রচণ্ড রাজন॥
পরম বিদুষী বিদ্যা তাহার কুমারী।
তা লাগি মনের ভীতে তোহ্মা পরিহরি॥

বিদেশী কুমার হের তোহ্মাক বুঝাই।
নৃপতি দুর্বার বাসা দিবারে ডরাই॥
নাগরঙ্গ নামে সে এ রাজ্য কোতোয়াল।
নিতি প্রতি প্রজাঘর করএ বিচার॥
ভিন্ন দেশী পুরুষ মন্দিরে যার পায়।
আগে শাস্তি করি পিছু রাজাক জানায়॥
তনু কান্তি সুলক্ষণ অভিন্ন বদন।
তোহ্মার তুলনা রূপ নাহিক ভুবন॥
কোতোয়ালে দেখে তোহ্মা যদি মোর গৃহে।
কি বলি ভাণ্ডিমু তাক রাখিবাম তোহে॥

(অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত।)

বিদ্যাসুন্দরের অর্থাৎ বিদ্যার বা বিদ্যাবতীর সহিত সুন্দর বা বিদ্যাপতির মিলনকে নিছক প্রেমোপাখ্যান বলিয়া মনে করিলে আদবেই ভুল করা হইবে। ইহা একটি রূপক-কাব্য। ইহার প্রচ্ছদপটে কোন ইতিহাস লুক্কায়িত নাই বলিয়াই আমার ধারণা; সেই কারণেই নানা কবি নিজের ধারণা অনুসারে ইহাকে নানাভাবে পল্লবিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা যদি প্রকৃত ইতিহাস হইত, তবে স্থান, কাল ও পাত্রের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না––ইহারা সর্বত্র সমানই থাকিত।

মূল রূপক-কাব্যটিকে সাবিরিদ খাঁ রূপক-নাট্যে অর্থাৎ রূপক গীতিনাট্যে পরিণত করিয়াছেন,–ইহাই 'বিদ্যাসুন্দর-সাহিত্যে' কবির বিশেষ দান। যে রূপকের ভিত্তিতে বিদ্যাসুন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। এই তত্ত্ব-প্রচারের জন্যই 'বিদ্যাসুন্দর-সাহিত্যে'র উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। কাব্য-নাট্যটিতে সাবিরিদ খাঁ যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব পূর্বসূরীদের ন্যায় প্রচার করিতে চাহিয়াছেন, তাহা মূলতঃ এই :

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য মানুষের পক্ষে যাহা অর্জন করা আবশ্যক, তাহা প্ল্যাটো কর্তৃক বিবৃত গ্রীক আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা 'সুন্দর শরীরে শোভন মন' (A refined mind in a beautiful body)-এর আদর্শ। বলিতে কি, সত্যই 'সুন্দর শরীরে' অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সুসমঞ্জস-বিকাশে সুগঠিত নিটোল শরীরে 'শোভন মন' অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-সমৃদ্ধ সংস্কৃতিবান মন বিকশিত হইলেই মানুষের মনুষ্যত্ব পূর্ণতা লাভ করে। মনুষ্যত্বের এই পূর্ণতার আদর্শই 'বিদ্যাসুন্দরের' আদর্শ। এই আদর্শ 'সুন্দর' মানুষের শারীরিক 'সৌন্দর্যের' প্রতীক এবং 'বিদ্যা' মানুষের 'জ্ঞানের' প্রতীক। শারীরিক সৌন্দর্যের সহিত মানুষের মানসিক জ্ঞানবত্তার মিলন দেখানোই এই শ্রেণীর সাহিত্য-প্রচারের মূল উদ্দেশ্য।

অধিকন্তু, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত কাহিনী রচিত হইয়াছে বা পরিকল্পিত হইয়াছে, সে সমস্ত উপাখ্যানের আধ্যাত্মিক অর্থে রূপক-রূপে গ্রহণের প্রথা সূফী-জগতে সুবিদিত। তাই দেখিতে পাই, সূফীরা লায়লী-মজুন, য়ূসুফ-জোলেখা, পদ্মাবতী প্রভৃতি উপাখ্যানকে আধ্যাত্মিক রূপক-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব, সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর'-কেও সেই দিক হইতে বিচার করিতে হইবে।

(খ) **রসূল-বিজয়** :– সাবিরিদ খানের 'রসূল-বিজয়ে'র পাণ্ডুলিপিও খণ্ডিত। গ্রন্থখানির মাত্র ১২ বারটি পাতা (২১ হইতে ৩২) বর্তমান। এতৎসত্ত্বেও কাব্যটির

বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। ইহাতে হজরত মুহম্মদ মুস্তফার (দ:) রাজ্যজয় প্রসঙ্গে মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবির উক্তিও এইরূপ :

সাবিরিদ খানে পদ রচিল উপাম।
নবী জয় বাক্যচক্র জঙ্গনামা নাম॥

অন্যত্র–

সাবিরিদ খানে পয়ার ছন্দে।
রসুল বিজয় ভণে সানন্দে।

এখন ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই,—পুস্তকটির কবি-প্রদত্ত নাম 'জঙ্গনামা', না 'রসুল-বিজয়'। তবে এই জাতীয় অপর পুস্তকের নামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'রসুল-বিজয়' নামই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। জৈনুদ্দীনের মতো তাঁহারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নবীর বিজয়-ঘোষণা করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার। জৈনুদ্দীনের 'রসুল-বিজয়' এবং সাবিরিদ খানের 'রসুল-বিজয়', এই উভয় গ্রন্থের মূল-বিষয় ও রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তবে, পাণ্ডিত্যে ও কাব্যকলায় সাবিরিদ খান জৈনুদ্দীন হইতে শ্রেষ্ঠ। নিম্নে সাবিরিদ খানের লেখার একটি ছোট উদাহরণ দিলাম :

প্রমোদিত পয়গম্বর প্রশংসি বলিলা
মিত্রভাবে আল্লায় তোক্ষাক জয় দিলা॥
আল্লার কেশরী তুক্ষি ন থাকিতে যদি।
তবে তাক ধরি আনি কে করিত বন্দী॥
আলীক বাখানি নবী কৈলা আশীর্বাদ।
আনন্দ উল্লাস সব জয় জয় বাদ॥
সালার হইল বন্দী সর্ব সৈন্য-ত্রাস।
নৃপতি দেখিয়া শোকে হইল হতাশ॥
সাবিরিদ খানে কহে রসুল-বিজয়।
শুনি বুধ কর্ণ পুরি সুধা বরিখয়॥

(গ) **হানিফা ও কয়রা পরী** :— কবি সাবিরিদ খানের আর দুইটি পুঁথির ভাষা যেমন গুরুগম্ভীর ও সংস্কৃত শব্দবহুল, এই পুঁথির ভাষা তেমন নহে। ইহার ভাষা বেশ সহজ ও অনেকখানি প্রাঞ্জল। তবে পূর্বোল্লেখিত প্রাচীনত্বের বৈশিষ্ট্য সর্বত্র সমানভাবে না হইলেও, বহুলাংশে রক্ষিত আছে। দুই-একটি উদাহরণ দিতেছি :

"কোথা হন্তে দুই রাউত মিলিল আসিয়া।
বাঘের অন্তরে দোহোঁ রহিছে শুতিয়া॥"

অন্যত্র–

"দুই লক্ষ অশ্ববার আছএ তাহার।
পঞ্চশত মত্ত করী আছে বলিয়ার॥"

কাব্যে বর্ণিত কাহিনীটি অতি সংক্ষেপে এইরূপ :— সহিরাম রাজার কন্যা 'জৈগুন', নামান্তরে 'পাকদামন' মুহম্মদ হানিফার সহিত লড়াই করিয়া পরাজিত হয় এবং পরে হানিফাকে পতিরূপে বরণ করে। হানিফা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নানা দেশের রাজাকে

যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিতে থাকেন। এই সময়ে "মুকাবিল হলবী" নামক এক ব্যক্তি সর্বত্রই হানিফার সহগামী ছিলেন। সহিরাম রাজার সহিত যুদ্ধে হানিফা আহত হইয়া চলচ্ছক্তি রহিত হন। ইতোমধ্যে তিনি শাহাপরী-নন্দিনী কয়রা-পরীর সুনজরে পড়েন। কয়রা-পরী হানিফার প্রতি এমনই প্রেমাসক্তা হয় যে, "দিনে একবার মুখ না দেখিলে মরে।" এইভাবে,

"চতুর্দশ অব্দ ধরি তান সঙ্গে ফিরে।
ছিদ্র না পায় হরি নিবারে তাহারে॥
দৈবযোগে পদে ক্ষত হইল তাহার।
বেদনায় অচেতন টঙ্গীর মাঝার॥
কয়রা প্রবেশ কৈল টঙ্গীর অন্তরে।
অচেতন যায় নিদ্রা খাটের উপরে॥
অচেতন আমিরে আপনা খাটে লৈল।
তবে কয়রা আপনার রাজ্যেত চলিল।"

বলা বাহুল্য, আমিরের অর্থাৎ মুহম্মদ হানিফার সহিত, তখন শুধু 'মুকাবিল হলবী' নহেন 'জৈগুন'-ও সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু কিভাবে হানিফা কয়রা-পরী কর্তৃক অপহৃত হইলেন, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। ফলে, হানিফার হরণে জৈগুণ ও মুকাবিল একেবারে শোকাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাতে বিশেষ ফল হইল না।

হজরত আলী (রা:) এই কথা জানিতে পারিলেন; অবশ্য রসূলের গোরে গিয়া ধন্না দিয়াই তাঁহার এই জ্ঞান হইল যে, হানিফাকে কয়রা-পরী 'রোকাম' শহরে লইয়া গিয়াছেন এবং জৈগুন ভিন্ন আর কেহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না। অতঃপর জৈগুন সৈন্য-সামন্ত লইয়া 'রোকাম' শহরে গমন করেন এবং তথাকার 'দুর্মিক' রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লন। (অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত।)

চট্টগ্রামের নানা লোকের মুখে শুনা যায়, এ জেলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে উত্তুঙ্গ পর্বতের শিখর দেশে আজও নাকি মুহম্মদ হানিফা ও কয়রা-পরীর টঙ্গী দেখা যায়; সেখানে উঠিতে চাহিলে মানুষের উপর নাকি বড় বড় প্রস্তর-খণ্ড বর্ষিত হয়। চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'শাহাপরীর দ্বীপ' আছে। এই দ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া গল্পটি রচিত কিনা বলা যায় না। 'রোকাম' আরাকানের প্রাচীন নাম 'রখইং' বা রোসাঙ্গের অপভ্রংশ কিনা তাহাও বলিতে পারি না।

দোনা গাজী

এই কবির কাব্যখানির নাম 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল'। এই নামের আর একটি প্রসিদ্ধ কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬৫৯ খৃ:) মহাকবি আলাওল কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। আলাওলের খ্যাতি ও তাঁহার কাব্যের বিস্তৃত সমাদর এবং দোনাগাজীর কাব্যের সহিত আমাদের মোটামুটি অপরিচয়,—ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়া প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কবি দোনাগাজী মহাকবি আলাওলের পরবর্তী লোক। কিন্তু, এই কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, এই ধারণা একান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত ও ভুল। এরূপও বলা হইয়াছিল যে, "এত বড় কাব্যখানিতে কোথাও কবির ভণিতা

নাই।" ইহাতে ভণিতা অত্যন্ত কম হইলেও, কাব্যখানি একেবারেই ভণিতা-শূন্য নহে। ইহার একস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় :

"কহে দোনাগাজী দুক্ষ ধীরে ধীরে জাএ।
জাইতে নাহিক ছর্দ্ধা (শ্রদ্ধা) ফিরি ফিরি চাএ॥"

সুতরাং, কবির এই কাব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। পুঁথিখানির পাণ্ডুলিপি অতি প্রাচীন ও জীর্ণ-শীর্ণ,— প্রায় ২০০ দুইশত হইতে ২৫০ আড়াই শত বৎসরের মধ্যে অনুলিখিত। ইহার ৫ হইতে ১৮৫ পত্র বিদ্যমান। মধ্যে মধ্যে দুই-এক পাতা করিয়া নাই বলিয়াও মনে হয়। একস্থলে লিপিকরের নাম আছে; যথা-"শ্রীহীন সোনাউল্লা, সাং লাউতলী।" পুঁথিখানি ত্রিপুরা জেলা হইতে আন্নীগঞ্জ গুরুট্রেণিং স্কুলের পণ্ডিত তরিক মিঞা কর্তৃক সংগৃহীত।

অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, কবি দোনাগাজী ত্রিপুরা জেলার বর্তমান চাঁদপুর মহকুমার কোন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এই মহকুমার কোন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি ১০/১২ বৎসর পূর্বেও কবির নাম ও কাব্যের কথা অবগত ছিলেন। তাঁহাদের মতে, কবি দুই-তিন শত বৎসরের আগের লোক। কবির কাব্য আদ্যন্ত খণ্ডিত বলিয়া এবং কবির কাব্যের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি নাই বলিয়া আভ্যন্তরীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই কবির কাল নির্ণয় করিতে হইবে। এই দিক হইতে বিচার করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, কবি দোনাগাজী আলাওলের বহু পূর্ববর্তী লোক। এই দুই কবির মধ্যে কেহই কাহারও কাব্য দেখিয়াছিলেন বলিয়া দুই কবির ভাষা হইতে কোন আভাস পাওয়া যায় না। তবে, উভয় কবি গল্পটি ফারসী হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই, মূল ঘটনা উভয় কাব্যে প্রায় এক। স্থানে স্থানে নাম ইত্যাদিতে অল্পবিস্তর প্রভেদও দেখা যায়; যেমন আলাওলের 'মল্লিক' ও 'ছায়েদ' দোনাগাজীর পুঁথিতে 'মালকা' ও 'ছাআদ' হইয়াছে।

দোনাগাজী যে আলাওলের পূর্ববর্তী কবি সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনত্বের বহু লক্ষণ যাহা এই গ্রন্থে আছে, তাহা আলাওলে নাই। আমাদের ধারণা, কবি দোনাগাজী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায় প্রাকৃত-ভাব, ছন্দের শিথিলতা, অন্ত্যানুপ্রাসের শৈথিল্য এবং প্রাচীন শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য,— সমস্তই একসঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে স্বাধীনতার যুগের মুসলিম কবিদের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার দুই-একটি উদাহরণ দিতেছি :

১। দ্বিতীয়া বিভক্তির -'কে' স্থলে প্রাচীনতর -'ক'; যথা— 'পতিক', 'দোহাক' ইত্যাদি।

২। নাম পুরুষের 'ইতেছি', ক্রিয়া-বিভক্তির স্থলে প্রাচীনতর—'অন্তি' বা 'এন্তি' প্রত্যয়; যথা "নাচন্তি সুন্দরী সবে গাহেন্তি সোন্দর।"

৩। কর্ম প্রবচনীয় 'দিয়া' স্থলে—'দি' এর ব্যবহারও প্রাচীন; যেমন :— "তেকারণে রবি শশী জলেদি লুকাএ।"

৪। 'যুবকের' স্ত্রীলিঙ্গ 'জুবকী' এবং 'দুর্বাক্যের' স্থলে 'দুরাক্ষর' প্রভৃতি অসংখ্য প্রাচীন রূপ বর্তমান।

কাব্যখানির উপাখ্যান ভাগ বর্ণনার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। কেননা, আমরা অন্যত্র তাহা করিয়াছি। মূল ঘটনার সহিত আলাওল ও দোনাগাজী প্রায় এক হইলেও

ভাষায় কাহারও রচনার ছায়া কাহারও রচনায় দেখা যায় না। আলাওল অবশ্য শ্রেষ্ঠতর পরবর্তী কবি; তাঁহার ভাষা তাই চমৎকার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য ব্যঞ্জক। আর, দোনাগাজী সাধারণ কবি; তাঁহার ভাষাও সাধারণ। তাঁহার প্রাকৃত-ভাব ও সারল্য তাঁহার প্রাচীনত্ব দ্যোতনা করিতেছে। দুই জনের ভাষার তুলনায় সমালোচনার জন্য 'রাজকন্যা ও বণিক-সুতে'র প্রসঙ্গ হইতে নিম্নে পাশাপাশি চৌদ্দটি চরণ উদ্ধৃত হইল। বণিক-বণিতার কৌশলে ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হইলে, তিনি জাগিয়া উঠিলেন। তখন কবি বণিক-বণিতার রূপ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

কবি দোনা গাজীর রচনা

তার বর্ণ উদ্দেসিয়া কাজল জন্মিল।
এ লাগি সুন্দরী সবে নয়ানে ধরিল॥
নিশি নিয়াছিল কিছু বর্ণ করি চুরি।
নিশিনাথে হিয়ায় রাখিল যত্ন করি॥
কস্তুরী-হরিণী কিছু তাহার বরণ।
অদ্যাবধি সুগন্ধে বেষ্টিত এ কারণ॥
মুনি তপস্বীরা সে বর্ণেত মজিল।
কোরান পুরাণ বেদ কালি দি লিখিল॥
অদ্যাবধি সেই কালা বর্ণ মনে তুলি।
গাহেন্ত নিত্যকী সবে শ্যামকলা বুলি॥
তার বর্ণ ছায়া কত জলদের গাএ।
তেকারণে রবি শশী জলে দি লুকাএ॥
চাচর চিকুর কিছু কর্ণ কাছে গিয়া।
রসিকের মন দুক্ষ কহে বুঝাইয়া॥

কবি আলাওলের রচনা

ঘন ঘন মৃগমদ তিমির সাঁচরি।
ফণী জিনি সুললিত চিকুর কবরী॥
নবীন অরুণ শশী নিকটেতে দেখা।
উজ্জল দেখিয়া ভালে সিন্দুরের রেখা॥
নবীন জলদ যিনি শ্যাম কেশভার।
চলাচল নাহি তাতে অতি অন্ধকার॥
মোহন সীমান্ত রূপ চপলা বেকত।
সেই লক্ষ্যে স্বর্গে যাইতে মন্মথ পথ॥
ললাটে সিন্দুর কিবা অরুণ-কিরণ।
সেই পথে অস্তাচলে করয় গমন॥
ভালে ভাল বালচন্দ্র অরুণে সে মেলা।
দুই শিশু একত্রে বসিয়া করে খেলা॥

রত্নমুক্তা বেষ্টিত নক্ষত্র চারি পাশ।
ত্রাসিত স্থগিত রাহু না করে গরাস॥

শেখ ফয়জুল্লাহ্

স্বাধীন বাংলার মুসলিম কবিদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাহ্ নানা কারণে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। অদ্যাবধি তাঁহার পাঁচখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থগুলির নাম এইরূপ : (ক) গোরক্ষ-বিজয় বা গোর্খ-বিজয়, (খ) গাজী-বিজয়, (গ) সত্যপীর, (ঘ) জয়নালের চৌতিশা, (ঙ) রাগনামা।

"সন ১১০১ মঘীর (১৭৩৯ খ্রী:) বৈশাখ মাসে শ্রীআব্দুল আলী, সাং পরাগলপুর, চট্টগ্রামে" অনুলিখিত "মনোহর-মধুমালতী"র একখানা পুঁথির সহিত শেখ ফয়জুল্লাহর 'সত্যপীর' নামক আর একখানা পুঁথির পাণ্ডুলিপিও আমার দেখিবার সুযোগ হয়। অনেক চেষ্টা করিয়াও পুঁথি দুইখানি কিছুতেই হস্তগত করিতে পারি নাই। 'সত্যপীরের' প্রথম দিকের এই অংশটুকু পরে চব্বিশপরগনার এক পাণ্ডুলিপি হইতে নকল করিয়া লইয়াছিলাম :—

"গোর্খ-বিজয় আদ্যে মুনিসিদ্ধা কত।
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত॥
খোঁটাদুরের পীর ইছমাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেই মোক হইল রাজী॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন॥
মুনি রস বেদ শশী শাকে রহে সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভণে ভাবি দেখ মন॥"

ইহা হইতে দেখা যায়, শেখ ফয়জুল্লাহ্ ১৪৬৭ কিংবা ১৪৯৭ শকাব্দে 'সত্যপীর' রচনা করেন। সুতরাং, ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সত্যপীরের রচনা। ডক্টর সুকুমার সেনও ফয়জুল্লার একটি সত্যপীরের পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন। এই ফয়জুল্লাহ্ পশ্চিম বঙ্গের লোক। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির কবি ফয়জুল্লাহ্ এক ব্যক্তি কিনা বলিতে পারি না। তাঁহার 'গোরক্ষ-বিজয়' বা 'গোর্খ-বিজয়' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা) ও বিশ্বভারতী হইতে এই গ্রন্থের দুইটি সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কথা পরে বলা হইবে।

"গাজী-বিজয়" কাব্যের কোন প্রতিলিপি এ-যাবৎ আমাদের হস্তগত হয় নাই। ইহাতে কাঁটাদুয়ারের পীর ইসমাইল গাজীর কাহিনী বিবৃত হইয়াছিল বলিয়া কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ উপরোদ্ধৃত স্তবকে জানাইয়া দিয়াছেন। ইসমাইল গাজী বাংলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি এদেশে আসিয়া সুলতান বারবক শাহের (১৪৫৯–১৪৭৪) সেনাপতির পদ লাভ করিয়া উত্তর বঙ্গে ইসলাম-প্রচার করিয়াছিলেন। শেখ ফয়জুল্লা ইসমাইল গাজীর সমসাময়িক লোক নহেন। মনে হয়, ইসমাইল গাজীর শাহাদৎ প্রাপ্তির বহু পরেই ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি 'গাজী বিজয়' রচনা করিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহার 'সত্যপীর' রচনার তারিখ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বলা বাহুল্য

'গাজী-বিজয়'-কে ঐতিহাসিক কাহিনী বলিতে হইবে, কেননা, ইসমাইল গাজী একান্তই ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

"জয়নালের চৌতিশা" নামক পুঁথিখানিতে মহরমের মর্মবিদারী ঘটনার সহিত জড়িত জয়নু-ল্-আবিদীনের শোক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'চৌতিশা' বা চৌত্রিশ অক্ষরকে প্রতি চরণের প্রারম্ভিক অক্ষররূপে ব্যবহার করিয়া যে কাব্য রচিত হইত, তাহা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যে দেবদেবীর স্তব, বিরহ বা শোক প্রকাশ করা হইত। এইগুলি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের স্তব বা 'মর্সিয়া' জাতীয় ক্ষুদ্র খণ্ড কাব্য। 'জয়নালের চৌতিশা' মর্সিয়া শ্রেণীর কাব্য। এতদ্ব্যতীত ইহার অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র **"রাগনামা"** গানের পুস্তক। ইহাতে রাগ-তাল প্রভৃতি সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং আলোচ্য রাগতালের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক হইতে কবির সঙ্গীত-জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র সুপ্রচারিত গ্রন্থের নাম **"গোর্খ-বিজয়"** বা **"গোরক্ষ-বিজয়"**। ইহার যে-কয়খানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ গ্রন্থে শ্যামদাস, ভীমদাস ও কবীন্দ্র দাসের দুই একটি ভণিতার সহিত ফয়জুল্লার ভণিতা থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, মূল পুঁথি কবীন্দ্রের রচনা। এই ধারণা ভুল। সমস্ত পুঁথির অধিকাংশ ভণিতা এবং তিন-চারখানা পুঁথির সমুদয় ভণিতা শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র হওয়ায়, মূল পুঁথিখানি যে ফয়জুল্লাহ্‌র রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা অতিরিক্ত পাকামির পরিচায়ক, অথবা মুসলমানের নাম প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য হইতে বাদ দিবার প্রয়াস মাত্র। শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র **"গোরক্ষ-বিজয়ের"** একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভণিতা এইরূপ :

"কবীন্দ্র বচন শুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র দিল বুঝাইয়া॥"

ইহা হইতে দেখা যায়, কবীন্দ্রের মুখে গল্প শুনিয়া কবি ফয়জুল্লাহ্ তাঁহার কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। ভীমদাস ও শ্যামদাস নিশ্চয় এই কাব্যের পরবর্তী কালের অনুলেখক বা গায়ক। নিজেদের নাম কাব্যের সহিত যুক্ত করিয়া রাখার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা মাঝে মাঝে ভণিতায় নিজেদের নাম জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহা হইলে ফয়জুল্লাহ্ যে কবীন্দ্রের কাছে গল্পটি শুনিয়াছিলেন, তিনি কে? ফয়জুল্লাহ্‌র আবির্ভাব-কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বলিতে হইবে, এই 'কবীন্দ্র' বাংলার প্রাচীনতম মহাভারত রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা কবীন্দ্র। তিনি হুসৈন শাহের অন্যতম সেনাপতি ত্রিপুরা ও চট্টল-বিজয়ী পরাগল খানের আদেশে **"মহাভারত পাঁচালী"** রচনা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জয় করিয়া পরাগল খাঁ সুলতানের নিকট হইতে বিস্তর সম্মান ও প্রচুর 'খিলাৎ' লাভ করিয়া চট্টগ্রামের সর্বোত্তর পশ্চিম সীমায় অবস্থিত বর্তমান পরাগলপুরেই বাস করিতে থাকেন। এখানে এখনও তাঁহার বংশধরগণ বর্তমান আছেন এবং প্রাচীন মসজিদ ও দীঘি পরাগল খানের বাসস্থানের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দেও যদি শেখ ফয়জুল্লাহ্ 'সত্যপীর' রচনা করেন, তথাপি কবীন্দ্রের সহিত তাঁহার দেখা হইতে পারে; আর 'সত্যপীর' রচনার তারিখ ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইলে তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

'গোরক্ষ-বিজয়' সত্যপীর কাহিনীর পূর্ববর্তী রচনা। শেখ ফয়জুল্লাহ্ 'গোরক্ষ-বিজয়ের' কাহিনি 'ভারত পাঁচালী' রচয়িতা কবীন্দ্রের মুখে শুনিয়া পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ইতিহাসে 'গোরক্ষ-বিজয়ে'র কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহাকে অন্যভাবে গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র উপাখ্যানও বলা যায়।

দৌলত উজীর বহরাম খান

এ যাবৎ কবির মাত্র একখানি কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহার নাম 'লায়লী-মজনু' কাব্যখানি খুব প্রকাণ্ড নহে। ইহাতে কবি যে আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বেশ বিস্তৃত ও নানা তথ্যপূর্ণ। নিম্নে তাহার আবশ্যক অংশ আলোচনার সুবিধার জন্য উদ্ধৃত হইল:

সর্বলোক নরপতি, ভুবন-বিখ্যাত অতি,
আছিল হোসেন শাহা বর।
তান রত্ন-সিংহাসন, অতিশয় বিলক্ষণ,
গৌড়েত শোভিত মনোহর॥
প্রধান উজীর তান, নাম যে হামিদ খান
তাহান গুণের অন্ত নাই।
অন্নছত্র স্থানে স্থানে, মসজিদ সুনির্মাণে,
পুষ্করিণী দিল ঠাঁই ঠাঁই॥
* * *
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে, উজীর হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈল চাটিগ্রাম।
অদ্যরূপ দান ধর্ম্ম, করিলা পুণ্যের কর্ম্ম
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম॥
অনুক্রমে বংশ কত, গোঙাইলেক এই মত,
গৌড়ের কুদিন হৈল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি, নানামত মহামতি,
নৃপতি নিজাম শাহা সুর॥
এক শত ছত্রধারী, সন্তানের অধিকারী,
ধবল অরুণ গজেশ্বর।
রজনী সময় হৈলে, মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে
অপরূপ পুরীর অন্তর॥
ঐ যে হামিদ খান, আদ্যের উজীর জান,
তাহান বংশেত উৎপতি।
মোবারক খান নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
সদা ধর্ম্মে কর্ম্মে তান মতি॥
তান প্রতি মহীপাল, খিতাব অধিক ভাল,
স্থাপিলেন্ত দৌলৎ উজীর।
সাধু সৎলোক সঙ্গে জনম বঞ্চিলা রঙ্গে

ধর্ম্মরূপে ত্যজিলা শরীর॥
তান সুত মূঢ় সম, নাম মোর বাহরাম
মহারাজ গৌরব অন্তরে
পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম অনুমানি
বাপের খিতাব দিলা মোরে॥
আছাওদ্দীন বন্ধু তানপদ জ্ঞান-সিন্ধু
কল্পতরু ভবনদী তীর।
পুস্তক পয়ার সার যেন মুকুতার হার
রচিলেন্ত দৌলত উজীর॥

এই উদ্ধৃতিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :— গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের (১৪৯৩–১৫১৯) প্রধান অমাত্য হামিদ খান দান-ধর্মাদির ন্যায় নানাবিধ গুণে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর তাহাকে চট্টগ্রাম অধিকার করিতে আদেশ দেন এবং তিনি চট্টগ্রাম অধিকার করেন। অতঃপর তিনি এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন এবং পূর্বের ন্যায় দান-ধর্মে রত হইলেন। এদিকে গৌড়ে 'কুদিন' বা রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দিল, তিনিও মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, একের পর এক করিয়া গৌড়ে কয়েক বংশের উত্থান পতন ঘটিল। ইতোমধ্যে গৌড়ের রাষ্ট্র বিপ্লব ('গৌড়ের কুদিন') দূর হইল; সুর-বংশীয় নিজাম শাহ্ চট্টগ্রামের অধিপতি হইলেন। একশত রাজছত্রধারী এবং বহু শ্বেত ও লাল হস্তী তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় দিত। তিনি চট্টগ্রামে এক পুরীও নির্মাণ করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের চট্টল-বিজয়ী প্রধান অমাত্য পূর্বোক্ত হামিদ খানের অধঃস্তন পুরুষ মুবারক খান তখন জীবিত। তিনি তখন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁহাকে চট্টল-অধিপতি নিজাম শাহ্ 'দৌলত উজীর' উপাধি দান করিলেন। এই উপাধি লাভের কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুবারক খান মারা গেলেন। তখন তৎপুত্র বাহরাম খান অল্প বয়স্ক বালক। নিজাম শাহ্ এই কথা জানিতে পারিয়া দয়াপরবশ হইয়া পিতার উপাধিটি বালক বাহরাম খানকে দান করিলেন। এইভাবেই কবি "দৌলত উজীর বাহরাম খান" নামে পরিচিত হইলেন।

এই তথ্য একান্তই ঐতিহাসিক। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত 'নেজামপুর পরগনা' এখনও প্রসিদ্ধ। এই পরগনা যে কোন নেজাম শাহের নামে তাঁহার জায়গীররূপে গঠিত হইয়াছিল, এই কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। সুতরাং, এই নেজাম শাহ্ "কবি 'দৌলৎ-উজীর' বাহরাম খানের বিবরণী-ধৃত "নিজাম শাহ্ সুর" ব্যতীত আর কেহ নহেন।

ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কবি বাহরাম খান ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নিজাম শাহ্ সুর হইতে "দৌলৎ-উজীর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কবি তখন ১৫/১৬ বৎসরের বালক না হইলে নিজাম শাহ্ তাঁহাকে তাঁহার পিতার "দৌলৎ-উজীর" উপাধি দিতেন বলিয়া মনে হয় না। আরও ১৫ বৎসর পরে "লাইলী-মজনু" রচিত হইলেও, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের রচনার তারিখ বলিয়া ধরা যায়। অতএব আমরা বলিতে পারি, ১৫৬০ হইতে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দৌলত উজীর বাহরাম 'লাইলী মজনু' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কবির পূর্বপুরুষ হাদি খান চট্টগ্রামের ফতেহাবাদেই (বর্তমান হাট-হাজারী ও চট্টগ্রাম শহরের মধ্যবর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রাম) বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা চট্টগ্রামের একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম। মনে হয়, কবির সময়ে চট্টগ্রাম শহর ফতেহাবাদ গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিষয়ে কবির সাক্ষ্য এইরূপ :

"নগর ফাতেয়াবাদ, দেখিতে পুরএ সাধ,
চাটিগ্রামে সুনাম প্রকাশ
মনোহর মনোরম অমর নগর সম,
শতে শতে অনেক নিবাস॥
লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলী নদী-তট
শুভপুরী অতি দীপ্যমান।
চৌদিকে বিশাল গড়, উজল বিস্তর সর
তাহে শাহা বদর পয়ান॥

এমনও হইতে পারে যে, চট্টগ্রাম বিজয়ের পরে হুসৈন শাহের সময়েই চট্টগ্রামের নাম 'ফতেয়াবাদ' রাখা হয়। তাহা হইলে, বর্তমান 'ফতেহাবাদ' গ্রাম যুদ্ধক্ষেত্ররূপে বিজিত হইয়াছিল বলিয়া ঐরূপ নাম লাভ করিয়া থাকিবে।

'লায়লী মজনু' ফারসী কবি জামীর ঐ নামীয় কাব্যের ভাবানুবাদ। স্থানে স্থানে মূলঘেঁষা অনুবাদ যেমন আছে, স্বাধীন রচনাও তেমন দেখা যায়। সংক্ষেপে, এই কথা বলা যায় যে, নিছক কাব্য-রস, লিপি চাতুর্য, ভব্যতা ও শালীনতায় 'লায়লী মজনু'র সমকক্ষ কাব্য খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে একটিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মুহম্মদ কবীর

এ যাবৎ মুহম্মদ কবীরের মাত্র একখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; ইহার নাম 'মধুমালতী'। "সন ১১০১ মঘীর (১৭৩৯ খ্রী:) বৈশাখ মাসে শ্রীআবদুল আলী, সাং পরাগলপুর," চট্টগ্রামে অনুলিখিত একখানা 'মধুমালতী' কাব্যের পাণ্ডুলিপি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জোরওয়ারগঞ্জে (চট্টগ্রাম, থানা সীতাকুণ্ড) দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ইহার শেষভাগের আবশ্যক অংশটুকু নকল করিয়া লইয়াছিলাম। অনেক চেষ্টা করিয়াও পুঁথিখানি হস্তগত করিতে পারি নাই। পুঁথিখানির শেষ অংশটুকু এই।

মনোহর মালতীর অকুল পিরীত।
গাহিব সকল লোক মন হরষিত॥
এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশি ভাষায় মুঞি পঞ্চালি ভণিল॥
অন্ত অন্তে অন্ত রএ সিন্ধু তার পাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজিরার পাঁচ॥
পণ্ডিত জনার ঘিন্না মুর্খের গোহারি।
শিরে ধরি কাব্য কথা দিলুং সঞ্চারি॥
মোহাম্মদ কবিরে কহে ভাবিয়া আকুল।
কি জানি ডুবিব শেষে এইকূল অইকূল॥

ইহা হইতে দেখা যায়, ৯৯৭ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকটির লেখা সমাপ্ত হয়। কিন্তু, ইহার রচনা আরম্ভ হয় আরও পাঁচ বৎসর আগে, অর্থাৎ ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে।

সম্প্রতি ইহার রচনার তারিখ লইয়া একটু গোল বাধিয়াছে। মরহুম আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব (মৃত: ১৯৫৩ খ্রী:) ১৯৪৯ সালের ২২শে জুলাই তারিখের পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন,

"সম্প্রতি মধুমালতী পুঁথির একটি প্রতিলিপি আমার হস্তগত হইয়াছিল। পাঁচটি টাকার জন্য পুস্তকটি কিনিতে পারিলাম না। হায় রে অদৃষ্ট! সে কথা বলিয়া লাভ কি? ইহার শেষ পত্রে ভণিতার আগে হেঁয়ালীতে একটা তারিখ ছিল, তাহা এই:–

'অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ রস বিন্ধ তার কাছ।
পঞ্চালি ভণিতে হৈল হিজরির পাচ॥'

ইহার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিলাম না, পারিলে সদ্ব্যবহার করিবেন।"

আমি কয়েকবার এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি; তথাপি সত্যপাঠ বা অর্থ ঠিক করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমার বিবেচনায় পাঠটি এইরূপ হইতে পারে :

"অঙ্গ সঙ্গে রহে রস বিন্দু তার কাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরীর পাঁচ॥"

'অঙ্গ', 'রস' এবং 'বিন্দু' এই তিনটিই বিবেচ্য। নব রস ও বিন্দুর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। তবে 'অঙ্গ' কি? প্রাচীনকালে লোকে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করিত; অষ্টাঙ্গে প্রণামও বহু প্রচলিত ছিল; অষ্টাঙ্গ যোগের কথাও ভাবিতে হইবে। তবে কি পুঁথিটি ৮৯০ হিজরীতে অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল? তাহা হইলে দুই তারিখের মধ্যে (১৫৮৮–১৪৮৫) প্রায় ১০৩ বৎসরের ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কোন্ তারিখটি গ্রহণীয়, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়গুপ্ত এবং ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপিলাই 'মনসা-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। তবে কি তাঁহাদেরও পূর্বে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি মুহম্মদ কবীর 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন? তাহার স্থির সিদ্ধান্ত-মূলক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে এই কথা বলিতে পারি যে, কবি মুহম্মদ কবীরের ভাষা বিজয়গুপ্ত বা বিপ্রদাসের ভাষা হইতে প্রাচীন। তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :

১। দ্বিতীয়বার একবচনে আধুনিকতর 'কে' বিভক্তির স্থলে সর্বত্র 'ক' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়; যথা– 'কুমারক' 'নৃপতিক', উজীরক' ইত্যাদি।

২। মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ায় প্রাচীনতর 'অসি' প্রত্যয়; যথা–

"মোর দুঃখ তবে জথ আপনে **জানসি**।
তেকাজে লেখিছি পত্র যণরে প্রিয়সি॥"

৩। প্রাকৃত ভাবাপন্ন শব্দ ও কথার বহুল ব্যবহার; যথা–

(ক) "**খাখার**" ঘোষিব লোকে ভএ নাহি লাজ।"
(খ) "চতুর্দ্দিকে মুক্তা ধাইছে **আউদল** কেশ।"
(গ) "**নৌআলি জৌবনি বালি** সাজিছে নবরঙ্গে।"
(ঘ) "রজতের বৈঠা সব হেম **কেরুয়াল**।"

৪। আক্ষি, তুক্ষি, গেলেন্ত, দেখন্ত প্রভৃতি রূপ সর্বত্র সমানভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫। কতকগুলি প্রাচীন বাংলার (তুল :–শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন) শব্দের ব্যবহার; যথা : ধামালি, নেহা, গোহারি, কেহ্নে (কেনে), কোণ্ডর, বঙ্ক, আওনেগমনে, ওর, কেরুয়াল প্রভৃতি।

"মায়ের বচনে তবে বোলন্ত কোঁওরে।
মেলানি দেউ মোরে জাইব ছফরে॥"

কি করিয়া এমন হইল বলিতে পারি না। বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের ভাষা মুহম্মদ কবীরের ভাষার তুলনায় অনেকখানি আধুনিক,– তাঁহাদের ভাষায় প্রাচীনত্বের লক্ষণ একরূপ নাই বলিলেই চলে।

কাব্যটি ফারসী হইতে অনূদিত হইয়াছিল, না হিন্দী হইতে অনূদিত হইয়াছিল, তাহাও আর এক সমস্যা। এই প্রসঙ্গে কবির কয়েকটি ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি :

(১) "মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি।
আছিল ফারসী ছন্দ রচিল পঞ্চালী।"

(২) "মোহাম্মদ কবিরে কহে সুরস পঞ্চালী।
আছিল ফারসি কিতাব করিল হিন্দুয়ালী॥"

(৩) "মোহাম্মদ কবিরে কহে শুন সাধুগণ।
রঙ্গ কথা শুনিবারে বিদরে পরাণ॥"

আমি যেই পুঁথি হইতে ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছি (অবশ্য তারিখসহ) তাহাতে দেখা যায় :

"এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশি ভাষায় মুঞি পঞ্চালী ভণিল॥

এই কাব্যের পরিবেশ ও পরিকল্পনা "গোলে-বকাওলী' জাতীয়। মনে হয়, মূল গল্পটি হিন্দীতে ছিল, কোন ভারতীয় মুসলমান কবি (আমীর খসরুর ন্যায়) এই মূল হিন্দী হইতে গল্পটিকে ফারসী ভাষায় কাব্যিক রূপ দিতে গিয়া পরী প্রভৃতি ইরানী উপাদান ঢুকাইয়া দেন। এই ফারসী কাব্য হইতেই বাংলায় কবি মুহম্মদ কবীর গল্পটি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কাব্যে বর্ণিত গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ :

কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা সূর্যভানের ঔরসে ও রাণী কমলা সুন্দরীর গর্ভে বহু দান-ধর্ম ও আরাধনার ফলে রাজ-দম্পতির আঁটকুড়ে নাম ঘুচাইয়া মনোহরের জন্ম হয়। জ্যোতিষীরা রাজপুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেও রাজাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে মনোহর কোন চন্দ্রমুখীর জন্য দেশান্তরী হইবেন বটে, কিন্তু পরে স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যপালন করিবেন।

মহারস রাজ্যের রাজা বিক্রম-অভিরামের ঔরসে ও রাণী রূপসমঞ্জরীর গর্ভে মধুমালতীর জন্ম হইয়াছিল। তিনিও রাজ-দম্পতির একমাত্র সন্তান ছিলেন। অপরূপ লাবণ্যবতী মধুমালতীর সম্বন্ধেও মনোহরের অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

পঞ্চদশ বর্ষে রাজপুত্র মনোহর শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত হইলে, রাজা সূর্যভান্ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। যথাসময়ে

রাজ্যাভিষেকের মহোৎসব সম্পন্ন হইল। উৎসবান্তে ক্লান্ত হইয়া নবীন রাজা মনোহর রাজপুরীর এক উদ্যানে পালঙ্ক পাতিয়া শায়িত হইতেই ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলেন। এই সময়ে কতকগুলি 'পরীজাদী' মহারস রাজ্যের উপর দিয়া উড়িয়া কঙ্গিরা রাজ্যে আসিবার সময় দেখিতে পান যে, মহারস-রাজকন্যা মধুমালতী পালঙ্কে ঘুমাইতেছেন, আর–

"সোনার প্রদীপ জ্বলে পালঙ্কের পাশে।
মণিমুক্তা রিমিঝিমি তিমির বিনাশে॥
নৌয়ালি জৌবনি বালি সাজি নব রঙ্গে।
সোনার পোতলা জেহ্ন শুতিছে পালঙ্কে॥"

এই মধুর দৃশ্য স্মৃতি-পটে অঙ্কিত রাখিয়া পরী জাদীরা যখন কঙ্গিরা রাজ্যে পৌছিলেন, তখন তথায় তদবস্থায় মনোহরের চিত্র দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া কৌতুক উপভোগ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। ফলে,–

"কন্যার পালঙ্ক পাশে কুমার পালঙ্ক।
পরীসব থুইল নিয়া ধীরে এক সঙ্গ॥"

এই কাণ্ডটি করিয়া পরীজাদীরা অন্তরীক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন; মনোহর ও মধুমালতী উভয়ে উভয়ের পালঙ্কে বিভোর হইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। রাত্রির শেষভাগে উভয়েই জাগিয়া গেলেন। মধুমালতী আপন পালঙ্ক-পার্শ্বে এক 'ভিন পুরুষ'কে শায়িত দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া শয্যায় বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনোহরের অবস্থাও অনুরূপ। তিনি সম্মুখে এক অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া "মনে চিন্তে প্রতেক্ষ কিবা দেখিএ স্বপন।" একেবারেই চোখের সম্মুখে "জৌবনি মাতলি কন্যা হেলি হেলি পড়ে" অবস্থায় বিদ্যমান দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এ কন্যা মানবী নহে অপছরি জেহ্ন।"

অতঃপর উভয়ের সহিত উভয়ের আলাপ-পরিচয় হইল। প্রসঙ্গক্রমে মনোহর মধুমালতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,–

"আর ত কি নাম তোক্ষা কহ ত সুন্দরী।
উড়িল পাঞ্জর গুয়া রাখ বন্দী করি॥"

ইহাতে মধুমালতীর হৃদয়ে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, তাঁহার যাবতীয় সুপ্ত-বাসনা জাগরিত হইল। তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করিলেন :–

"দরশনে প্রাণ মোর রহে কিবা ধাএ।
ন জানম পরশিলে আর কিবা হএ॥"

এইভাবে নানা আলাপ-প্রসঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে এতদূর প্রেমভাব জাগিয়া উঠিল যে, তাঁহারা এই অপ্রত্যাশিত প্রীতির নির্দশন স্বরূপ অঙ্গুরী ও পালঙ্ক বিনিময় করিলেন। তারপর–

"দোঁহ জনে প্রেমানন্দে নিশি উজাগর।
নিদ্রাএ মোহিত পড়ে পালঙ্ক উপর॥"

এই সময়ে পরীজাদীরা ফিরিয়া আসিয়া একজনকে অপরের পালঙ্কে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া যথাস্থানে মনোহরকে পালঙ্কসহ রাখিয়া আসিলেন।

প্রভাত হইল। উভয়েই আপন আপন স্থানে জাগরিত হইলেন। রাত্রির অতীত অবস্থা ভাবিয়া এবং প্রভাতের বর্তমান ব্যাপার দেখিয়া, তাঁহারা বোকা বনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এ স্বপ্ন, না সত্য?' সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই বিচারেও প্রবৃত্ত হইলেন যে,—

"যদি আহ্মি হেন রূপ দেখিতু স্বপনে।
পাইলু নিশান কেহে দিল কোন জনে॥
প্রতেক্ষ দেখিতু যদি তবে কেহো নাই।
তবে কেহে অঙ্গুরী পালঙ্ক মোর ঠাঁই॥"

এইভাবে তাঁহাদের প্রতীতি জন্মিল যে, এই ব্যাপার স্বপ্ন নহে, সত্য। তখন উভয়ে উভয়কে লাভ করিবার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। রাজা সূর্যভান ও বিক্রম-অভিরাম যথাক্রমে স্বীয় পুত্র ও কন্যার কথা জানিতে পারিলেন।

যথাসময়ে মনোহরের প্রেমাভিযান শুরু হইল। তিনি বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া অভীষ্টান্বেষণে যাত্রা করিলেন; বহুদূর গিয়া এক নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—

"সে নদীতে নৌকা আছে পরম সুন্দর।
বিজলীর হোন্তে নৌকা খেলএ লহর॥
নব ইন্দু-ছন্দ জিনি নৌকার গঠন।
আগে পাছে গাছল দোলএ ঘন ঘন॥
রজতের বৈঠা সব হেম কেরুয়াল।
চলিতে চঞ্চল অতি ন ছোয় কীলাল॥"

মনোহর স্বসৈন্যে নদীপথে চলিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ দৈবযোগে-কর্মদোষে নদীতে ঝড় উঠিল, আর—

"ধীরে ধীরে মহানদী ওখারা হইল।
নৌকা সব নিয়া এক ভূমিতে ফেলিল॥"

মনোহরের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত জলে ডুবিয়া মরিল। তিনি একখণ্ড কাষ্ঠ অবলম্বনে তীরে উঠিয়া রক্ষা পাইলেন। সম্মুখে এক অঘোর অরণ্য। একা পথ চলিতে চলিতে তিনি 'টঙ্গী' দেখিতে পাইলেন। ইহাতে আশ্রয় লইতে গিয়া এক পরীবালার সহিত তাঁহার দেখা হইলে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—

"এক রূপ লাগি মুঞি হৈলুঁ দেশান্তরী।
আর রূপে চাহে মোর প্রাণ নিতে হরি॥"

ইঁহার নাম 'পায়মা' (পুঁথির দুই এক স্থলে 'ফাতেমা')। ইনি জটবহররাজ চন্দ্রসেনের কন্যা। কোন দৈত্য কর্তৃক অপহৃতা হইয়া তিনি এই টঙ্গীতে বন্দী-জীবন যাপন করিতেছিলেন। মনোহর দৈত্যকে বধ করিয়া পায়মাকে উদ্ধার করেন এবং জানিতে পারেন যে, তিনি মধুমালতীর সখী। এই খবর পাইয়া মনোহর পায়মাকে তাঁহার পিতার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তথায় মধুমালতীর সঙ্গে কুমারের দেখা হয়; কিন্তু মধুমালতীর মাতা কুল-কলঙ্কের ভয়ে মন্ত্রবলে তাঁহাকে শুক পক্ষীতে রূপান্তরিত করিয়া দেন। শুক-রূপিণী মধুমালতী উড়িতে উড়িতে মাণিক্যরাশের রাজা তারাচাঁদের হাতে ধরা পড়েন। রাজা তারাচাঁদ শুকের মুখে পরিচয় পাইয়া ইহাকে মহারসরাজ্যে

পৌছাইয়া দেন। মহারস-রাজ মালিনীর বাড়িতে শুক-রূপিণী কন্যাকে দেখিতে পান। সেখানে তারাচাঁদের মুখে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া রাজা মনোহরকে আনাইয়া মধুমালতীর সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করেন। মধুমালতীর সহিত মনোহর পায়মাকেও লাভ করিয়াছিলেন।

কবি মুহম্মদ কবীরের বর্ণন-ভঙ্গী অত্যন্ত চমৎকার। তাঁহার এই কাহিনী-কাব্যখানি আখ্যানের সৌন্দর্যে ও বর্ণনার মাধুর্যে পরম উপভোগ্য। মেঘাবৃত সূর্যের আলোকের ন্যায় প্রাচীন ভাষার বেড়াজাল ভেদ করিয়াও, কাব্যটির যে-রস আজও পাঠককে প্রলুব্ধ করে, তাহা ইহার কাব্যগত শান্ত ও সৌম্য রস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা-যুগের বাংলা-সাহিত্যের সাধারণ আলোচনা

পূর্ব-পরিচ্ছেদে স্বাধীনতা-যুগের বাংলা-সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কথঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে কাব্যের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে কোন কোন কথা বলা হইলেও, এই যুগের সাহিত্য-সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

সামগ্রিকভাবে এই যুগের বাংলা-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, বিষয়-বস্তুর দিক হইতে মুসলমানদের সাহিত্য হিন্দুদের সাহিত্য হইতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের বাংলা-সাহিত্যকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা :–

১। **কাহিনী-কাব্য** : এই কাহিনী-কাব্যগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা :–

(ক) মুসলিম কাহিনী-কাব্য :–
- (অ) ইউসুফ-জলিখা–শাহ্ মোহাম্মদ সগীর
- (আ) হানিফা ও কয়রা-পরী–সাবিরিদ খান
- (ই) সয়ফুল-মুলক্–দোনাগাজী
- (ঈ) লাইলী-মজনু–বাহরাম খান

(খ) ভারতীয় কাহিনী-কাব্য :–
- (অ) মনোহর-মধুমালতী–মুহম্মদ কবীর
- (আ) বিদ্যাসুন্দর– সাবিরিদ খান

২। **ধর্মীয়-কাব্য** :– এই ধর্মীয় কাব্যগুলি তিন ভাগে বিভক্ত :–

(ক) শরা-শরিয়ৎ-সম্বলিত কাব্য :–
নসিহৎনামা–আফজল আলী

(খ) মুসলিম ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব্য :–
- (অ) রসূল-বিজয়–জৈনুদ্দীন
- (আ) রসূল-বিজয়–সাবিরিদ খান
- (ই) গাজী-বিজয়–শেখ ফয়জুল্লাহ্

(গ) হিন্দু ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব্য :–
- (অ) গোরক্ষ-বিজয়–শেখ ফয়জুল্লাহ্

৩। সংস্কৃতি-সমন্বয়-সঞ্জাত কাব্য :–

- (অ) সত্যপীর–শেখ ফয়জুল্লাহ্
- (আ) পদাবলী–চাঁদ কাজী, শেখ কবীর, আফজল আলী

৪। শোকগাথা :
জয়নবের চৌতিশা–শেখ ফয়জুল্লাহ

৫। জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় কাব্য :–
- (ক) সায়াৎনামা–মোজাম্মিল।
- (খ) নীতিশাস্ত্রবার্তা–মোজাম্মিল।

৬। সঙ্গীত শাস্ত্রীয় কাব্য :–
রাগমালা–শেখ ফয়জুল্লাহ

উক্ত বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে, স্বাধীনতার যুগে মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে 'কাহিনী-কাব্য' ও 'ধর্মীয়-সাহিত্যই' প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়-মূলক সাহিত্যও আরম্ভ হইয়াছে। পরবর্তী যুগে মহর্রমের করুণ কাহিনী অবলম্বন করিয়া বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, যে জারীগান জন্মলাভ করিয়াছিল, 'জয়নবের চৌতিশা' রচনার মধ্য দিয়া তাহার ভিত্তি প্রোথিত হইল। মুসলমানেরা জ্যোতিষ ও সংগীত-শাস্ত্রও বাদ দিল না।

১। কাহিনী-কাব্য

বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিতে গিয়া কাহিনী-কাব্যের প্রতিই সর্বাগ্রে মুসলমানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। বাঙালী মুসলমানদের আবিষ্কৃত গ্রন্থের মধ্যে শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জলিখা'-ই প্রাচীনতম। তখনও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচিত হয় নাই। সাহিত্য যে ধর্ম-প্রধান না হইয়া রস-প্রধান হইতে পারে এই কথা তখনও বাংলার হিন্দু সাহিত্যিকগণ কল্পনাই করিতে পারে নাই। বাংলার মুসলমানদের মনেই এই কথা সর্বাগ্রে উদিত হইয়াছিল। তাই, এই সমাজের মধ্যে সগীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। রস-প্রধান সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সগীর শ্রোতৃমণ্ডলী ও পাঠকবর্গকে আনন্দ পরিবেশনের দৃঢ়সংকল্প লইয়াই বাংলার প্রাচীনতম কাহিনী-কাব্য 'ইউসুফ-জলিখা' লিখিয়া যুগের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্বোধনী বাণী এইরূপ :–

> "কিতাব কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ
> ইছুফ জলিখা কথা অমৃত অশেষ॥
> কহিব কিতাব চাহি সুধারস পুরি।
> শুনহ ভকত জন শ্রুতিঘট ভরি॥
> দোষ খেম গুণ ধর রসিক সুজন।
> মোহাম্মদ সগীর ভণে প্রেমক বচন॥"

কবির মন কতখানি রস-সচেতন, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই কাব্যের মধ্য দিয়া শ্রোতার মনে এবং পাঠক-হৃদয়ে একটা রস-ঘন আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করাই কবির মূল উদ্দেশ্য, ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার এই কাব্যের লক্ষ্য নহে। কবি সগীর এইভাবে রস-প্রধান সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লইয়া যে-যুগের

যবনিকা উন্মোচন করিলেন, তাহার বিশাল মঞ্চে আরও প্রতিভাশালী অভিনেতা অচিরে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাবিরিদ খান, দোনাগাজী ও দৌলত উজীর বাহরাম খানই প্রধান। বাহরাম খানের 'লাইলী-মজনু'-র কাহিনী ও দোনাগাজীর 'সয়ফুল মুলুকের' কাহিনী মুসলিম জগতের সর্বত্রই সুপরিচিত। ষোড়শ শতাব্দীর কাহিনী-কাব্যে শালীনতায়, শিল্প-মহিমায় ও সাহিত্য-সম্পদে 'লাইলী-মজনু' একরূপ অতুলনীয়। 'হানিফা ও কয়রাপরীর' প্রেম-কাহিনী কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই মনে হয়; কল্পনার বিশালতা ও বৈচিত্র্যে, ঘটনা-সন্নিবেশের অপূর্ব কৌশলে ও বর্ণনা-চাতুর্যে এই কাব্যও অসাধারণ। দোনাগাজী কবি আলাওলের পূর্ববর্তী হইলেও প্রাঞ্জলতা ও কাব্যকলায় আলাওলের পাণ্ডিত্যও তাঁহার নিকট হার মানিয়াছে।

এই সমুদয় শিল্প-সুষমা-মণ্ডিত মুসলিম কাহিনীর প্রচার ও প্রসারে সমাজে যে-সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় কাহিনীগুলিকেও বাংলা-সাহিত্যের আসরে পাংক্তেয় করিয়া তুলিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বাংলা-ভাষায় ভারতীয় কাহিনীর এই যে সাহিত্যিক মর্যাদা দান,—এমন একটা ব্যাপারও বাংলার মুসলমানদের হাতেই ঘটিল। মুহম্মদ কবীরের 'মনোহর-মধুমালতী' এবং সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'মনোহর-মধুমালতী'-র মূল উপাখ্যান-ভাগে ও ঘটনা-সন্নিবেশে ফারসী কাব্যের পরীর আমদানী এবং গ্রীক পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রভাব দেখিতে পাওয়া গেলেও, ইহা যে একান্তই ভারতীয় কাহিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, হিন্দীতেও এই উপাখ্যান প্রচলিত ছিল এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'মধুমালতী-কথা' নামে একখানি হিন্দী কাব্যেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মুহম্মদ কবীরের পরবর্তী যুগে বাংলায় যে-কয়খানা 'মধুমালতী' কাব্যে এই কাহিনী সাহিত্যিক রূপ লইয়াছিল, তন্মধ্যে মুহম্মদ কবীরের কাব্য শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিবার ক্ষমতা রাখে। 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান যে ভারতীয়, সে-কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কাশ্মীরের খ্যাতনামা কবি বিহ্লণ তাঁহার 'চৌর-পঞ্চাশিকা' নামক খণ্ডকাব্যে এই উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলিয়া অনুমিত মৈমনসিংহের কবি কঙ্ক 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের প্রাচীনতম কবি কিনা বলা যায় না। সত্যপীরের মাহাত্ম্যকীর্তন প্রসঙ্গে তিনি যে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহা নিছক কাব্যরস আস্বাদনের জন্য লিখিত হয় নাই। গৌড়ের সুলতান ফীরূয শাহের সময় (১৫৩২) দ্বিজ শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর লেখেন, তাহাতেও কালিকা-মাহাত্ম্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দ্বিজ শ্রীধরের ভাষা হইতেও অধিকতর প্রাচীনত্বের চিহ্ন বহন করিয়া কবি সাবিরিদ খান নাটকীয় ভঙ্গীতে যে 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই সাহিত্যিক গৌরবে বিশেষ মণ্ডিত। নাট্য-কলার মধ্য দিয়া একমাত্র কাব্য-রস সৃষ্টি ব্যতীত ইহার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না।

৭। ধর্মীয়-কাব্য

ইহা খুবই সত্য যে, মধ্যযুগীয় (তুর্কী আমল ও স্বাধীনতা-যুগের) বাংলা-সাহিত্য একান্তই ধর্মকেন্দ্রিক। মুসলিম আমলের পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধদের এবং মুসলিম আমলে হিন্দু শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলা-সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে থাকে। মুসলমান-আগমনের পর পীর-ফকীর ও আলিম-উলমাদের ইসলাম প্রচারে নূতন করিয়া যে চিন্তার মুক্তি বিঘোষিত হইল, তাহাতে মুসলমানদের চেয়ে

হিন্দুদের ধর্মীয় চেতনাই অধিক প্রকট হইয়া উঠে। সুতরাং, বাংলা-সাহিত্যে এই ধর্মীয় কোন্দলের প্রভাব একান্তই স্বাভাবিক।

এই প্রভাবের ফলে, মুসলমানদের মধ্যে দুই শ্রেণীর বাংলা-সাহিত্য দেখা দেয়; তাহার একটি হইল, (১) খাঁটি ইসলামী শরা-শরায়েত সম্বলিত কাব্য এবং অন্যটি হইল (২) হিন্দুর দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক 'বিজয়-কাব্যে'র অনুরূপ মুসলিম মহাপুরুষদের মাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক 'বিজয়-কাব্য'। এই মুসলিম 'বিজয়-কাব্য'গুলি ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব্যও বটে। এইগুলিতে ইসলামের চেয়ে ইসলামী উপকথার ভাগই বেশী। তবু ইহাদের নায়ক-নায়িকার অধিকাংশই একান্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

এই যুগের খাঁটি শরা-শরায়েত-সম্বলিত কাব্যের মধ্যে এ-পর্যন্ত মাত্র একখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহা কবি আফজল আলীর 'নসীহৎনামা'। তিনি পদাবলীও রচনা করিয়াছিলেন। কবি মারফৎপন্থী ছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি পরবর্তী কবি আলাওলের পথ-প্রদর্শক ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। কারণ, আফজল আলী যেমন নিছক ধর্মতত্ত্বের লেখক হইলেও পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, আলাওলও তেমন 'তোহফা'র ন্যায় নিছক ধর্মতত্ত্বের লেখকও হইলেও পদাবলী রচনায় হাত দিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, অন্ততঃ বাংলা-সাহিত্যের মধ্যযুগ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিলেও 'হিন্দু' বলিয়া আখ্যাত হইবার ভয় সমাজে দেখা দেয় নাই।

বাংলা-সাহিত্যের 'বিজয়' আখ্যায় চিহ্নিত কাব্যগুলি নায়কের স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনের সহিত কোন-না-কোন বিশিষ্ট দেব-দেবীর প্রাধান্য বা মাহাত্ম্য প্রচার নির্দেশ করে। 'বিজয়'-শব্দের সাধারণ অর্থ 'প্রতিপক্ষের পরাভব' ব্যতীত আর এক অর্থ 'প্রাধান্য' বা 'শ্রেষ্ঠত্ব' এবং আরও এক অর্থ 'গমন' বা 'প্রস্থান'। বাংলা 'বিজয়-কাব্য'গুলিতে এই শব্দের শেষোক্ত দুই অর্থের দ্যোতনা রহিয়াছে। বাংলার মুসলমানেরাও তাঁহাদের 'বিজয়'-কাব্যে শব্দটির এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায়, 'রসূল-বিজয়' ও 'গাজী-বিজয়' কাব্যে 'বিজয়'-শব্দের ঐ দ্যোতনাই গৃহীত হইয়াছে। তবে, হিন্দুরা 'বিজয়-কাব্যে' দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিলেও মুসলমানেরা তাহা করেন নাই। কোন দেব-দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিত না বলিয়াই হউক, কিংবা 'রসূল' কি 'গাজীর' ন্যায় ধর্মীয় মহাপুরুষদিগকে দেববাদী হিন্দুদের নিকট অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন অবতার শ্রেণীর মানুষ সাজাইয়া স্বীয় ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলিবার ইচ্ছার বশেই হউক, মুসলমান কবিগণ বিজয়-কাব্যগুলির মধ্যস্থতায় ইসলামের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছেন। এই কাব্যগুলির প্রতি ছত্রে তাঁহাদের ধর্মীয় প্রেরণার অভিব্যক্তি ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

এতদ্ব্যতীত এই কাব্যগুলির পশ্চাতে আরও একটি প্রেরণা ক্রিয়া করিয়াছিল বলিয়া মনে করিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে। চিরদিনই ইতিহাস রচনার বিশেষ খ্যাতি মুসলমানেরা পাইয়া আসিয়াছে। ভারতের ইতিহাসই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মুসলমান কবিদের 'বিজয়-কাব্য' রচনায় তাঁহাদের ধর্মপ্রচার প্রেরণার সহিত ইতিহাস লেখার প্রবৃত্তিও যে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ক্রিয়া করে নাই, তাহা কি করিয়া বলা যায়? অনৈতিহাসিক উপাখ্যান-প্রধান হিন্দু 'বিজয়-কাব্যের' স্থলে এই যুগের মুসলমানেরা ঐতিহাসিক উপ্যাখ্যান-প্রধান 'বিজয়-কাব্য' রচনা করিয়া বাংলা-সাহিত্যে ইতিহাস

লেখার এক নবীন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের 'বিজয়-কাব্য'গুলি মূলতঃ ইতিহাস। 'গাজী-বিজয়' কাব্যই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার খ্যাতনামা পীর ইসমাইল গাজীর কাহিনী লইয়াই এই কাব্য লিখিত হইয়াছিল। শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ-বিজয়' রচনার মূলসূত্রও এইখানেই পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ হিন্দু তথা বৌদ্ধ সিদ্ধা হইলেও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার সিদ্ধাই বা অলৌকিক কাহিনী পীরদের কেরামতীর সামিল ও সগোত্রীয় ব্যাপার। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধার কেরামতী বর্ণনা করিয়া শেখ ফয়জুল্লাহ্ স্বীয় ইতিহাস-প্রীতির সহিত ধর্মীয় উদারতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। ফিরদৌসী ইরানের প্রাক্-ইসলাম যুগীয় বীরদের কাহিনী 'শাহনামায়' লিপিবদ্ধ করিয়া যদি মুসলমান রূপে গৌরবের সহিত পরিচিত হইতে পারেন, 'গোরক্ষ বিজয়' লিখিয়াও শেখ ফয়জুল্লার মুসলমানরূপে পরিচিত হইতে কাহারও সঙ্কোচ বোধ করা নিতান্তই গোঁড়ামির পরিচায়ক।

৩। সংস্কৃতি-সমন্বয়-সঞ্জাত কাব্য

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী সমগ্র উত্তর-ভারতে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের যুগ। যেই পরিবেশে এই সময়ে উত্তর ভারতে কবীর (১৩৯০–১৪৪০ খ্রী:), নানক (১৪৬৯–১৫৩৯ খ্রী:), চৈতন্য (১৪৮৬–১৫৩৩ খ্রী:) প্রভৃতি হিন্দু-মুসলিম সাধকদের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছিল, ঠিক সেই পরিবেশেই বাংলাদেশে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য ও পদাবলী সাহিত্য-রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল। মোটের উপর, যুগ-ধর্ম বশেই এই সময়ে ইসলাম ও হিন্দু-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি বিষয়ের পারস্পরিক সমঝোতা আবশ্যক হয় এবং মুসলিম সূফী ও হিন্দু সাধকদের উদার মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভিব্যক্তিরূপে তাঁহাদের মতবাদ-প্রচার ও প্রসারের মধ্যস্থতায় হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার পথ দ্রুত পরিষ্কৃত হইতে থাকে। সাহিত্যেও এই সাংস্কৃতিক-সমন্বয় উত্তর-ভারতের সর্বত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। সাহিত্য সমাজ-মনের প্রতিফলন বলিয়া, ইহা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। বাংলায়ও এই সাংস্কৃতিক সমঝোতা সত্যপীরের কাহিনী ও পদাবলী রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমনটি না হওয়াই ছিল একটা অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ব্যাপার। তাই, একমাত্র উদার ও মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত অন্য যে-কোন দৃষ্টি-কোণ হইতে এই কাব্যগুলির বিচার করিলে, ইহাদের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়।

বাংলা-সাহিত্যে সত্যপীর কাহিনী-কাব্য এক বিরাট অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। এই কাব্য-রচয়িতার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক রহিয়াছেন। তন্মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাই প্রাচীনতম। তিনি "মুনি, রস, বেদ, শশী" শকাব্দে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ১৪৬৭ বা ১৪৯৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কি কারণে ডক্টর সুকুমার সেন এই তারিখকে "মুনি, বেদ, রস, শশী" শকাব্দ বা ১৬৪৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে করেন বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, ষোড়শ শতাব্দীতে কোন বাঙালী মুসলমান কাব্য রচনা করিতে পারেন বা করিয়াছিলেন। তবে, তিনি শেখ ফয়জুল্লার 'সত্যপীরে'র সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এতদিন এই দলিলটির অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করিতেন না।

সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচার করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে কাব্যটি অন্যান্য 'সত্যপীর কাব্য' হইতে কতকটা বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক। প্রাচীনতম 'সত্যপীর-কাব্য' বলিয়া ইহা বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক হইবারই কথা। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণের পূজার কথা পাওয়া যায়; তবে ইহা যে অর্বাচীন ও প্রক্ষিপ্ত, তাহা পাশ্চাত্য পুরাণ-গবেষকগণ স্বীকার করিয়াছেন; কেননা স্কন্দপুরাণের এই অংশে মুসলিম-প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সত্যপীর-কাহিনী খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের হিন্দু-মুসলিম-সংস্কৃতি-সঞ্জাত সৃষ্টি। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয়, 'সত্যপীর' অর্থাৎ 'পীরই সত্য' এই ধারণার বশবর্তী হইয়া মুসলমান কর্তৃক 'সত্যপীর-কাব্য' রচিত হইয়াছিল। হিন্দুরা এই সত্যপীরকে পরে 'সত্যনারায়ণে' রূপ দিয়া থাকিবেন।

'পদাবলী'-সাহিত্যও বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম-সংস্কৃতি-সঞ্জাত সৃষ্টি। ইহাতে সূফীদের 'গজলিয়াৎ'-সাহিত্যের চিন্তাধারা, প্রকৃতি, গঠনগত প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে কতকটা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৪। শোকগাথা

কোন 'ট্রাজিক' বা বিষাদাত্মক ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া কাব্য রচনা করার রীতি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে প্রবর্তিত হয় নাই। অথচ "করুণতম চিন্তাধারার অভিব্যক্তিতেই সর্বাপেক্ষা হৃদয়স্পর্শী গানের সৃষ্টি" (our sweetest songs are those that tell of saddest thought) বলিয়া ইংরেজ কবি ঘোষণা করিয়াছেন। এই জাতীয় সৃষ্টিতে বাংলা-সাহিত্য যখন একেবারেই দীন, তখন মুসলিম কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ 'জয়নবের চৌতিশা' রচনা করিয়া বাংলা-সাহিত্যের একটি নূতন দিকের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

'চৌতিশা' বা চৌত্রিশ অক্ষরের পদ্য-নিবন্ধ বাংলায় এক শ্রেণীর কাব্য। ফারসীতে এবং তৎসূত্রে উর্দুতে আলিফ, বে, তে, সে প্রভৃতি আরবী বর্ণমালার বর্ণের প্রত্যেকটির একক ব্যবহার দ্বারা চরণের পর চরণের অন্ত্যানুপ্রাস ঘটাইয়া যেরূপ কবিতা লেখা হয়, সেইরূপ সংস্কৃত-সাহিত্যে বর্ণমালার চৌত্রিশ অক্ষরের প্রত্যেকটিকে এককভাবে প্রতি চরণের আদিতে বসাইয়া দেব-দেবীর স্তব রচনা করার একটা প্রাচীনতম পদ্ধতি দেখা যায়। সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব রচনা করার প্রাচীন রীতি বাংলায় আমদানী করা হইয়াছিল। এই প্রাচীন কাব্য-রচনা রীতিটিকে কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ একেবারেই ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি এই রীতিতে চিরাচরিত স্তব লেখার কথা ভাবিতেই পারেন নাই। তাঁহার 'চৌতিশা'য় কারবালার করুণ কাহিনীর সহিত জড়িত ইমাম হুসেন পরিবারভুক্ত বিবি জয়নবের বিষাদ-কাহিনী বিলাপের আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই হিসাবে 'জয়নবের চৌতিশা' আমাদের দেশের 'জারী-গানের' প্রাচীনতম রূপ এবং কারবালার ঘটনা-সম্বলিত 'মকতুলহুসৈন' জাতীয় কাব্যগুলির পূর্বরূপ।

৫। জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় কাব্য

জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কাব্য রচনার প্রাথমিক কৃতিত্বও বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের প্রাপ্য। কবি মোজাম্মিলের 'সায়াৎনামা' ও 'নীতিশাস্ত্রবার্তা' এই শ্রেণীরই গ্রন্থ। এই

গ্রন্থগুলিতে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পারিভাষিক বিষয়াদির আলোচনা না থাকিলেও জনসাধারণের জ্ঞাতব্য দিন, ক্ষণ, শুভাশুভ-আদি জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্পৃক্ত নানা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কোথাও কোথাও সূফীদের মধ্যে 'ইলমু-স্-সাআৎ' বা শুভাশুভ সম্বন্ধীয় বই দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা গ্রন্থগুলি তাহারই অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তাহার সহিত ঐ জাতীয় বঙ্গীয়-জ্ঞান যুক্ত হইয়া এই পুস্তকগুলি লিখিত হইয়াছিল।

৬। সংগীত-শাস্ত্রীয় কাব্য

সংগীত-শাস্ত্রে মুসলমানদের খ্যাতি চির-প্রসিদ্ধ। ভারতীয় সঙ্গীতেও মুসলমানের দানের অন্ত নাই। বাংলা ভাষায় সংগীত-শাস্ত্রীয় কোন কাব্য ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখিত সংগীত-শাস্ত্রের কোন কাব্য বা পুস্তক শেখ ফয়জুল্লার 'রাগমালা'র পূর্বে দেখিতে পাওয়া যায় না। রাগ-রাগিণীর আলাপ ও গানে তাহার উদাহরণ দেওয়াই এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। শেখ ফয়জুল্লার 'রাগমালা' বাংলা-ভাষায় সঙ্গীত-শাস্ত্রীয় কাব্যের প্রাচীনতম নির্দশন। ইহা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হইয়া থাকিবে।

উপসংহার

এই আলোচনা হইতে দেখা যায়, স্বাধীনতার যুগে বাংলার মুসলমানেরা বাংলার হিন্দুদের সাহিত্যের অনুকরণ করেন নাই। তাঁহারা স্বাধীনভাবে নিজেদের সাহিত্যিক-পথ নিজেরাই বাছিয়া লইয়াছিলেন। এই যুগের হিন্দুদের বাংলা-সাহিত্য রামায়ণ, ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত ধর্মীয়-গ্রন্থের অনুসরণে এবং রাধাকৃষ্ণ, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর কাহিনী অবলম্বনে কেবল ধর্মীয় খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা তাঁহাদের সাহিত্যের একাংশকে ধর্মীয় খাতেই পরিচালিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা ইসলাম ধর্মীয় কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা সাহিত্যে নির্ভয়ে 'রোমান্স্' বা প্রেম-কাহিনী, খাঁটি ইতিহাস, শোকগাথা, জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশাস্ত্রে কৃতিত্বের সহিত পথনির্দেশ করিয়াছেন।

এই যুগে হিন্দুর বাংলা-সাহিত্যে যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুসলিম প্রভাব পড়িয়াছে, মুসলমানদের বাংলা-সাহিত্যেও তেমনই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হিন্দু-প্রভাব পড়িয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, হিন্দুরা মুসলমান কিংবা মুসলমানেরা হিন্দু হইয়া যাওয়ার ফলে এমনটি হইয়াছিল। এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান যুগ যুগ ধরিয়া পাশাপাশি বাস করার ফলেই যে এই প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমানের সংস্কৃত চর্চা এবং হিন্দুর ফারসী চর্চাও এই প্রভাবের অন্যতম কারণ।

চতুর্থ অধ্যায়

মুঘল-আমলের বাংলা-সাহিত্য

১৫৭৬–১৭৫৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুঘল-আমলের রাজনৈতিক পটভূমি

বাংলায় মুঘল-আমলের স্থায়িত্বকাল (১৫৭৬–১৭৫৭) প্রায় একশত আশী বৎসর। এই সময়ে উত্তর ভারতীয় মোগলাই বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে ক্রমে বাংলায় প্রবেশ করিয়া দেশে এক নূতন সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। সাহিত্যের দিক হইতে মুঘল-আমলের রাজনৈতিক পটভূমি এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরই পটভূমি।

আমরা দেখিয়াছি, মুঘল-আমলের পূর্বে দেশের রাজধানী গৌড়ই ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক স্নায়ুকেন্দ্র। আফগান সুলতান সুলেমান কররানীর রাজত্বকালে (১৫৬৫–১৫৭২) গৌড় হইতে প্রায় ১৫ (পনের) মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত 'তণ্ডা' বা 'তাঁড়া'য় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ফলে গৌড়ে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের অবসান না ঘটিলেও, তাহার পূর্ব-মহিমা অবলুপ্ত হয়।

মুঘল-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মহামারীতে (১৫৭৫) গৌড় ধ্বংস হইল। গৌড়ে তখন প্রায় ১২,০০০০০ বার লক্ষ লোকের বাস। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সবই মরিয়া গেল, মাত্র কয়েক সহস্র লোক খোদার এই গজবের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নগর ত্যাগ করিয়া দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে ফকীর-দরবেশ, আলিম-উলমা, আমীর-উমরা এবং পণ্ডিত-আচার্যও ছিলেন। (এইরূপ দেশত্যাগীদের বংশধরদিগকে চট্টগ্রামে এখনও 'গৌড়িয়া' বলে)। গৌড় নগরী যে শুধু এইভাবে ধ্বংস হইল, তাহা নহে; ইহার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যও চিরতরে অবলুপ্ত হইল। মহামারীর ফলে গৌড়ের সাংস্কৃতিক জীবন বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। কারণ, তাঁড়া গৌড়ের নিকটবর্তী ও মুঘল-অধিকারভুক্ত থাকায় গৌড়ত্যাগী ব্যক্তিদের বড় কেহই তাঁড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই।

গৌড় ধ্বংসের পরও প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ (১৫৭৫–১৫৯৫) তাঁড়া বাংলার মুঘল-রাজধানী ছিল। এতদ্সত্ত্বেও বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁড়ার প্রাধান্য দেখা যায় না। কারণ, এই কুড়ি বৎসরের বাংলার ইতিহাস বাঙালীর সৃষ্টি-তৎপরতার ইতিহাস না হইয়া, অস্তমিত আফঘান ও উদীয়মান মুঘলশক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত অমীমাংসিত ফলাফলময় স্থানীয় সংঘর্ষের এক বিরক্তিকর কাহিনী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে

মুঘল ও আফঘান শক্তি কখনও সম্প্রসারিত, আবার কখনও সঙ্কুচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের জনসাধারণের শান্তি লাভ হয় নাই। অগত্যা ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর রাজা মানসিংহ বাধ্য হইয়া তাঁড়া হইতে রাজমহলে বাংলার মুঘল-রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

এই সময়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল; তন্মধ্যে উত্তর-বঙ্গে কোচবিহার রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে মল্লরাজ্য, পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রামের উত্তরাংশসহ ত্রিপুরা-রাজ্য, বাংলার পূর্ব-উত্তর সীমান্তে কামরূপ রাজ্য, এবং পূর্ব দক্ষিণ সীমান্তে আরাকান রাজ্য (চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণতীরসহ) প্রভৃতি প্রধান। এই সমস্ত প্রত্যন্ত আঞ্চলিক রাজ্যে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য-চর্চার ধারা অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু, বাংলার মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে সাহিত্য-চর্চার সঞ্জীবনী শক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইত ক্ষীণতর হইয়া চলিল। এই সময়ে বাংলার এই সমস্ত অঞ্চলে সাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, কেবল অতীতের সেই দিকগুলির—সেই বৈষ্ণব ইতিহাস, সেই পদাবলী, সেই দেব-দেবী মাহাত্ম্য, সেই কৃষ্ণ-চরিত, সেই রামায়ণ, সেই মনসা-কাহিনী, সেই ধর্ম-কাহিনী প্রভৃতির পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে। প্রত্যন্ত আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে কিন্তু অবস্থা একটু অন্যরূপ ছিল। এইগুলি গৌড়ের কিংবদন্তী রক্ষা করিয়াছে সত্য তাহার সহিত সাহিত্যের নূতন নূতন দিক উন্মুক্তিতেও বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এই ব্যাপারে চট্টগ্রামের উত্তরাংশসহ ত্রিপুরা এবং দক্ষিণাংশসহ আরাকান রাজ্যদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে মুঘল অধিকারের প্রথম পঁচিশ বৎসর, বাংলার মুঘল-অধিকৃত অংশে শান্তি ছিল না। ১৫৯৪ হইতে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে আত্মবিবরণী দান প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দক্ষিণ রাঢ়ের দুঃখ-দুর্দশার যে-চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা দক্ষিণ-রাঢ়ের একার চিত্র নহে, বরং বঙ্গের মুঘল-অধিকৃত অংশের একটি নিখুঁত ছবি। কবির ভাষায় দেশের চিত্র এইরূপ :

"উজির হৈল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায়ে বুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল খিল ভূমি লেখে নাল
বিনি উপকারে লিখায় ধুতি।
পোতদার হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় তঙ্কা প্রতি॥
মিথ্যা হে জগতি ভণ্ড পরদ্রব্যে করে দণ্ড
ডাকা দেই দিবস দুপুরে।
বিষম রাজ্যের লোক পরদ্রব্য খাইতে জোঁক
দেখিতে দেখিতে নিত্য হরে॥
* * *
কোটালিয়া বড় পাপ সজ্জনের কালসাপ
কড়ির কারণে বহু মারে।

আথালি পাথালি কড়ি লেখা জোখা নহি দেড়ি
যত দিয়া যেবা নিতে পারে॥
* * *
জমাদার প্রতি নাছে প্রজারা পলায় পাছে
দুয়ারে চাপিয়া দেই থানা।
প্রজারা ব্যাকুল চিত্ত বেচে ধান্য গরু নিত্য
টাকাকের দ্রব্য দশ আনা॥"

মোট কথা, দেশে তখনও তেমন কোন নূতন সাংস্কৃতিক পরিবেশ দেখা দেয় নাই। নেহাৎ প্রাণের টানে এই সময়েও অনেকে সাহিত্য চর্চা করিয়াছেন বটে, তবে তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা পূর্ব-যুগের অনুবৃত্তি মাত্র। ইঁহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ উতরিয়া গিয়াছেন সত্য, তথাপি তাঁহাদের মধ্যেও প্রকৃত প্রাণ-প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় না।

বঙ্গে মুঘল-শাসন প্রতিষ্ঠা করিতেই সম্রাট আকবরের রাজ্যকালের শেষ ত্রিশ বৎসর (১৫৭৫—১৬০৫) অতিবাহিত হয়। "দরবার-ই-নৌরতন-ই-আকবরী"-এর ন্যায় গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াও, সম্রাট আকবর বাংলা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। দিল্লী ও আগ্রা হইতে প্রেরিত সুবাদারেরা স্বল্পকাল শাসন-কার্য চালাইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন; তাঁহারা দেশের সাহিত্যিক উন্নতি বিধানের কথা ভাবিতেই পারেন নাই। বোধ হয়, এই কারণেই বিশাল বাংলা-সাহিত্যের মাত্র একটি স্থলে সম্রাট আকবরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গের সপ্তগ্রামের কবি মাধব আচার্য ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে যে 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেন, তাহাতে লিপিবদ্ধ কবির আত্ম-বিবরণীতে সম্রাট আকবর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় :

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার॥
প্রতাপে তপন সম বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে তার তুল্য রাজা নাহি ক্ষিতি॥"

লক্ষ্য করিবার বিষয়, উদ্ধৃত উক্তিটি কবির কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক কথা নহে, ইহা সম্রাট আকবরের অসাধারণ ক্ষমতা-দৃপ্ততা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক উক্তি মাত্র। আকবরের প্রবল প্রতাপের উল্লেখ করাই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য; রাজানুগ্রহ লাভের কোন কথা বলা, বা তজ্জন্য রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কবির উদ্দেশ্য নহে।

আকবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জাহাঁগীর (১৬০৫—১৬২৭) দিল্লীর সম্রাট হইলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে ইসলাম খাঁর সুবাদারীর সময় (১৬০৮—১৬১৩) বাংলায় মুঘল-শাসন সুব্যবস্থিত হয়। আফঘান (পাঠান) সর্দার, আরাকানী মঘ ও হার্মাদ (পর্তুগীজ) জলদস্যুকে দমন করিয়া বঙ্গে মুঘল-শাসন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজই ইসলাম খাঁর প্রধান সমস্যা হইয়া পড়িয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় বাংলার মুঘল-রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দেশের শাসন-ব্যবস্থায় তাহার ফলও হইল চমৎকার। অচিরেই আফঘান (পাঠান) সর্দারেরা বশ্যতা স্বীকার করিল, আরাকানী মঘ ও হার্মাদ জলদস্যুরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত

হইল, বাংলায় মুঘল-শাসন সুশৃঙ্খল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং ভারতের অন্যান্য মুঘল সুবার সহিত বাংলাও সুদৃঢ়ভাবে একসূত্রে গ্রথিত হইল।

ইহার পরই হইতেই বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দিল্লী ও আগ্রার সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অনুসরণ জোরে চলিতে লাগিল। ফলে, দেশে এক নূতন সভ্যতা ও নবীন সংস্কৃতির ভিত্তি নীরবে প্রোথিত হইয়া গেল। জাহাঁগীর প্রায় বাইশ বৎসর রাজত্ব করিলেও, এই যুগে বাংলা-সাহিত্যে কোথাও তাঁহার উল্লেখ নাই।

জাহাঁগীরের পর তৎপুত্র শাহজাহান দিল্লীর সম্রাট হইলেন। শিল্প-সুষমায় ও সমৃদ্ধি-বৈভবে তাঁহার রাজত্বকাল (১৬২৭–১৬৫৮) মুঘল-যুগে আদর্শ স্থানীয়। এই সময়ে বাংলায় মুঘল-সাংস্কৃতিক প্রভাব যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পড়িয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুঘল-স্থাপত্য-শিল্পের যে সমস্ত অভিজ্ঞান এখনও বাংলায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রাচীনতম নিদর্শন-মালার অধিকাংশই সম্রাট শাহজাহান বাদশাহের সমকালবর্তী। ন্যায়পরতা ও সুশাসনের জন্যও তাঁহার রাজত্বকাল চিরপ্রসিদ্ধ। বাংলা 'মহাভারত' রচয়িতা (রচনা-কাল ১৬০৫) কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর দাস ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যে 'জগন্নাথ-মাহাত্ম্য' রচনা করেন, তাহাতে তিনি সম্রাট শাহজাহান সম্বন্ধে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন :

"রাজচক্রবর্তী শাহজাহাঁ দিল্লীপতি।
ধর্ম ন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতি॥
রাজ্যের হৈল পতি সন পঞ্চদশ।
মহান প্রতাপী হয় বৈরিজয় যশ॥"

এখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সম্রাট শাহজাহানের ধর্মপরায়ণতা, ন্যায়পরতা ও প্রবল-প্রতাপ সম্বন্ধেই কবি সাক্ষ্য দিতেছেন, বাংলা-সাহিত্যের উৎসাহদাতা হিসাবে সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞ উক্তি ইহাতে নাই। বাংলা-সাহিত্য তাঁহার কাছ হইতে কোন প্রকারের সাক্ষাৎ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করিলেও, তাঁহার সময়ে নিরবচ্ছিন্ন সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে, দেশে সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে যে বিশেষ অনুকূল ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলার এই সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সম্রাট ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকাল (১৬৫৮–১৭০৭), এমন কি, তৎপর আরও অর্ধ-শতাব্দী (১৭০৭–১৭৫৭) পর্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। কেননা, দিল্লীতে সাময়িকভাবে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক গোলযোগ এবং আরাকানী মগ ও হার্মাদ উৎপাত দেশের অভ্যন্তর-ভাগের শান্তি নষ্ট করিতে পারে নাই। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সুশাসন ও ক্ষমতা সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া, ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'কালিকামঙ্গলে' কবি কৃষ্ণরাম দাস লিখিয়াছেন :

আরং শাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্বজনে বলে।
নবাব শায়িস্তা খাঁ অধিকারী সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে॥

এখানেও মনে রাখা আবশ্যক যে, রাজা হিসাবে রামের সহিত ঔরঙ্গজীবের তুলনা তাঁহার সুশাসন ও প্রজাপালন-গুণের পরিচায়ক এবং "রিপুর উপরে কাল" আখ্যা তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতাপের দ্যোতক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খাঁর 'লাইলী-মজনুঁ' সম্রাট ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে একবার অনুলিখিত হইয়াছিল। এই অনুলিখকও একজন কবি ছিলেন। তিনি স্বীয় কবিত্ব ফলাইতে গিয়া তাঁহার পাণ্ডুলিপির গোড়ায় নিতান্তই অবান্তরভাবে সম্রাট ঔরঙ্গজীব সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রশস্তি জুড়িয়া দিয়াছেন। যদি 'লাইলী-মজনুঁ'-র আরও কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে, এই প্রশস্তির উপর নির্ভর করিয়া 'লাইলী-মজনুঁ'কে ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইত এবং ইহা যে, পরবর্তী যোজনা, তাহা বুঝিতে পারা কষ্টকর হইত। এই প্রশস্তির এক স্থলে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের প্রতাপ ও ধার্মিকতার উল্লেখ আছে। এই অজ্ঞাতকুলশীল মুসলিম কবি লিখিয়াছেন :

"আওরঙ্গ সাহা দিল্লীশ্বর মহামতি।
অশ্বপতি গজপতি নরলোকপতি॥
সহস্রেক ছত্রধারী অধিক তাহান।
পৃথিবী পুজিত সাহা মহাবলবান॥
মহারোল অবিরল চতুরঙ্গ দল।
সৈন্যের নাহিক অন্ত যোদ্ধা এ সকল॥
কথেক কহিতে পারি তাহান মহিমা।
দয়াল ধার্মিক সাহা দিতে নাহি সীমা॥"

ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের শেষদিকে বাদশাহের পৌত্র আজীমু-শ্-শান (১৬৯৭–১৭১২) যখন ঢাকার সুবাদার তখন মুরশিদকুলী খাঁ বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। ১৭০৩ হইতে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলার নায়েব-সুবাদারও ছিলেন। সুবাদার আজীমু-শ্-শানের সহিত দেওয়ান মুরশিদ কুলী খাঁর বিবাদের ফলে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে দেওয়ানী কার্য-বিভাগ মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। সুবাদারের পদ হইতে আজিমু-শ্-শানের অপসারণের পরে, বাংলার রাজধানীও মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত হইল এবং মুরশিদকুলী খাঁর নামানুসারে মকসুদাবাদের নামও মুর্শিদাবাদ রাখা হইল। এখন হইতে বাংলার মুঘল-সংস্কৃতির কেন্দ্র হইল 'মুর্শিদাবাদ'।

ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র শাহ্ আলম (১৭০৭–১৭১২) দিল্লীর সম্রাট হইলেন। তিনি বিনয়ী, নম্র ও উদার ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। শাহ্ আলমের রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী হইলেও বাংলা ভাষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল হইতে সম্রাট শাহ্ আলমের যে-সমস্ত মুদ্রা (সিক্কা) বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে তাম্রমুদ্রা 'পয়সার' এক পৃষ্ঠে বাংলা হরফে "এক পাই সিক্কা" কথাটি মুদ্রিত হইয়াছিল। বোধ হয়, সুদীর্ঘ মুঘল-আমলে ইহাই বাংলা-ভাষার একমাত্র সরকারী স্বীকৃতি। অবশ্য বহু আধা-সরকারী ব্যাপারে এবং চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবিজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা-ভাষার বহুল-প্রচলন ছিল।

মুরশিদকুলী খাঁ বাংলার দেওয়ান ও নায়েব-সুবাদার হিসাবে নিযুক্ত হইলেও কার্যতঃ তিনি বাংলার সুবাদার ও দেওয়ান ছিলেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নামে ও কামে উভয় প্রকারে বাংলার সুবাদার হন এবং ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার সুবাদারের অধীন ছিল। এই সময়ে দিল্লীর

মুঘলশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ায় সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত সুবাদারগণের "অনেকেই রাজ-সরকারের" বার্ষিক খেলাৎ বা খাজানা আদায় দিয়া নামে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করিলেও, কামে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই অর্ধ-স্বাধীন সুবাদারগণ অচিরেই অসীম ক্ষমতাদ্যোতক 'নবাব' উপাধি ব্যবহার করিতে শুরু করিলেন, ফলে ধীরে ধীরে দেশে 'সুবাদার' উপাধি একরূপ অচল হইয়া উঠিতে লাগিল। দিল্লীর বাদশাহের নামে কেবল মুদ্রা ও 'সিক্কা' চলিত এবং তাহা লইয়াই বাদশাহেরা সন্তুষ্ট থাকিতে লাগিলেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়া মুরশিদকুলী খাঁ তাঁহার সুবাদারীর সময় (১৭১৭–১৭২৭) হইতে বাংলার 'নবাব' হইলেন। তিনি পুত্রহীন ছিলেন বলিয়া তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দীন ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্বশুরের মৃত্যুর পর বাংলার 'নবাব' হইলেন। শুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁর (১৭৩৯–১৭৪০) সময় পর্যন্ত বাংলায় নবাবরূপী সুবাদারের শাসন চলিল। অতঃপর বিহারের নায়েব-সুবাদার সরফরাজ খাঁ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কিভাবে বাংলার 'নবাব' হইলেন, তৎসম্বন্ধে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র (১৭১২–১৭৬০) তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে (রচনা-১৭৫২) সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই বর্তমান উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। কবি বলেন :

"শুজা খাঁ নবাব-সুত সরফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়-রায়াঁ॥
ছিল আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেন তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দী হইলা নবাব।
মহবৎ-জঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব॥"

আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০–১৭৫৬) নবাব সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার 'নবাব' হইলেন। তখন মুহম্মদ শাহ্ দিল্লীর সম্রাট। আলীবর্দী খাঁ দিল্লীর বাদশাহকে বহু খেলাৎ ও উপঢৌকন দিয়া 'নবাবী' সনদ ও 'মহবৎ-জঙ্গ' উপাধি লাভের পর মুর্শিদাবাদে জাঁকিয়া বসিলেন। প্রায় আশী বৎসর বয়সে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার দৌহিত্র মীর্যা মুহম্মদ সিরাজদ্দৌলা (১৭৫৬–১৭৫৭) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে মুর্শিদাবাদের পলাশী প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের এক যুদ্ধে নবাব পরাজিত, বন্দী ও নিহত হইলে পর, বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয় এবং মুসলিম-শাসনের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুঘল-আমলের সাংস্কৃতিক-পটভূমি

এই যুগের সাংস্কৃতিক পটভূমি ইহার পূর্ববর্তী যুগের সাংস্কৃতিক পটভূমি হইতে পৃথক। এই পার্থক্য অংশতঃ স্বাভাবিক বিবর্তনমূলক এবং অংশতঃ মুঘল-প্রভাব-সঞ্জাত। এই নবীন-সংস্কৃতি বিশিষ্ট মোগলাই ছাপ বহন করায় দিল্লী ও আগ্রার সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে বিশেষ পৃথক ছিল না।

এই যুগেই ভারতীয়-মুসলিম সংস্কৃতিতে মোগলাই প্রভাব নবীন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। সামাজিক ও ধর্মীয় সহনশীলতার অভিব্যক্তি-প্রদীপ্ত-ঔদার্য, পূর্ব হইতে অধিক মাত্রায় প্রকট হইয়া, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিতে থাকে। পূর্ববর্তী আরব, তুর্কী ও আফগান শাসকদের ন্যায় আকবর ও জাহাঁগীর গোঁড়া বাদশাহ ছিলেন না। এই সময়ে ধর্মীয় ঔদার্য এতদূর বাড়িয়া উঠে যে, এমন কি 'তৌহিদের' ন্যায় মৌলিক ধর্মীয় নীতির নূতন ব্যাখ্যা শুরু হইয়া যায়। এই ধর্ম ও আচারহীনতার বিরুদ্ধেই শেখ আহমদ সরহিন্দী (১৫৬৩–১৬২৫) স্বয়ং এবং সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁহার 'ফৎওয়া-ই-আলমগীরী'-র মধ্যস্থতায় অভিযান চালাইয়াছিলেন। দারা শিকোর 'মজমউ-ল-বাহরৈন' বা 'দ্বিসমুদ্র সঙ্গম' গ্রন্থই এই সময়ের ভারতীয় মুসলিম সাংস্কৃতিক-ঔদার্যের ভিন্নমুখী অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মুসলিম বাংলা-সাহিত্যেও ইহার প্রতিধ্বনি মিলিতেছে।

ভারতে 'শিয়া-মতবাদের' প্রবেশ ও প্রসারও এই সময়েই ঘটে। ইহা এদেশের সাংস্কৃতিক-বিবর্তনের আর এক ধারা। ভারতের সিংহাসন-চ্যুত সম্রাট হুমায়ূনকে তাঁহার সিংহাসন-উদ্ধারে সাহায্য করিতে গিয়া যে সমস্ত ইরানী সৈন্য ভারতে প্রবেশ করে, তাহাদের সহিত ভারতে শিয়া-মত প্রবেশ করিয়াছিল; অতঃপর এই মত ভারতে বর্ধিত হইতে থাকে। বহু উচ্চপদস্থ মুঘল-রাজপুরুষ, যাঁহাদের মধ্যে বাংলার শাসন-কর্তাও ছিলেন, শিয়া-মতাবলম্বী ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপিত হওয়ায়, বসরা ও বন্দর-আব্বাস হইতে বহু শিয়া-সাধক ও বণিক বাংলায় আগমন করেন। ইরানের রাজনৈতিক গোলযোগও বহু শিয়া-মতাবলম্বী ইরানীকে বাংলায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। নবাব মুরশিদ কুলী খাঁ এবং তাঁহার অধস্তন পুরুষদের নবাবী আমলে বাংলার শিয়ারা একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সংক্ষেপে, এই সাংস্কৃতিক ও অর্ধ-ধর্মীয় পটভূমিতে 'মকতুল হুসৈন' ও 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর কাব্য গড়িয়া উঠে।

এই সময়কার মুসলিম সংস্কৃতি-বিবর্তনের কারণগুলির মধ্যে উত্তর-ভারতীয় বহু কলন্দর, দরবেশ ও ঔলিয়া আখ্যাধারী সুফী-সাধকের বঙ্গে আগমনও অন্যতম।

এদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই সুফী-সাধক আগমনের একটা ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান ছিল। তখন এই ধারার প্রধান উৎস ছিল ভারতের বাহিরে অবস্থিত মুসলিম দেশসমূহে। মুঘল-আমলে এই ধারা যে শুধু প্রবল হইতে প্রবলতর আকার ধারণ করিল তাহা নহে, ইহার প্রধান উৎস হইল উত্তর-ভারত। ভারতের বাহিরে অবস্থিত মুসলিম দেশসমূহ হইতে যে-সমস্ত সূফী উত্তর-ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়গুলিতে 'চতুর্দশ খান্দান' প্রধান হইলেও, অপ্রধান খান্দানভুক্তি সূফীর সংখ্যাও কম ছিল না। মুঘল-আমলে ইঁহাদের অনেকেই বাংলায় প্রবেশ করেন। তন্মধ্যে সুহরবর্দী, চিশ্‌তী, কলন্দরী, মদারী, অদহমী, নকশ্‌বন্দী ও কাদিরী সম্প্রদায়ভুক্ত সূফীরাই প্রধান ছিলেন। বাংলার জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনে কলন্দরী, মদারী ও অদহমী সম্প্রদায়-ভুক্ত সূফীদের প্রভাব যেরূপ ব্যাপকভাবে এক হইয়া যায়, তেমনটি অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সূফীর প্রভাব হয় নাই। এজন্য, ইহাদের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

কলন্দরী :— শেখ শরফুদ্দীন বু-আলী শাহ্‌ কলন্দর (মৃত্যু : ১৩২৪ খ্রী:) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। পানিপথই তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এবং এখানেই তিনি সমাহিত আছেন। ইসলামে বৈরাগ্য নাই বলিয়া সংসারধর্ম পালনের সহিত পারলৌকিক ধর্মও পালন করিতে হয়। কিন্তু, বু-আলী কলন্দরের মতে :

"ইহকাল ও পরকাল— এই দুইটি কি কখনও একসঙ্গে হাতে আসে ?
হে স্বার্থপর! এইরূপ বাজে-কাজ করিও না!
অসার সংসার ও (সারাৎসার) খোদা এক সঙ্গে পাইতে চাও?
ইহা নিছক কল্পনা, একটা অসম্ভব ব্যাপার এবং বদ্ধ পাগলামি॥"

বু-আলী কলন্দরের সংসারত্যাগী মন্ত্র-শিষ্যরা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ ছাইয়া ফেলে। তাহাদের প্রচার-তৎপরতা ও প্রভাব এতই বৃদ্ধি পায় যে, মুঘল-আমলে সূফীসাধক বুঝাইতে বাংলা ভাষায় 'কলন্দর' শব্দই ব্যবহৃত হইত। এই সময়ের খ্যাতনামা হিন্দু কবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী-মঙ্গল'-কাব্যই (রচনা ১৫৯৪–১৬০৬) ইহার প্রধান প্রমাণ। সুফী-সাধকদের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন, "কলন্দর হৈয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি" কিংবা "ঋণ কড়ি নাহি দাও, নহ কলন্দর।"

মদারী :— বদীউদ্দীন শাহ্‌-ই-মদার মদারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অযোধ্যার কানপুরের নিকটবর্তী মকনপুরে ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন ও সমাহিত হন। ইনি বঙ্গদেশেও আগমন করিয়াছিলেন। ফরীদপুর জেলার মাদারীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার মাদারবাড়ি ও মার্দশা গ্রাম আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে বলিয়া কিংবদন্তী আছে। শাহ্‌-আল্লাহ নামে তাঁহার এক শিষ্য শহর-ই-নৌ বা গৌড়ে মদারী-

মত প্রচার করেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান শাহ শূজা এক 'সনদ' দিয়া শাহ সুলতান হুসেন মুরিয়হ্‌ বরহিনা নামক এই সমস্ত সম্প্রদায়ের বঙ্গীয় 'খলীফা'কে বহু বিশিষ্ট অধিকার দান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অধিকারের মধ্যে 'মাদারী মিছিল' বাহির করিবার অধিকারও একটি। উত্তর-বঙ্গের নানা স্থানে এখনও 'মাদারের বাঁশ' তোলার বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয় এবং তাহাতে 'মাদারী' গান গাওয়া হয়।

অদহমী :— বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ ইব্‌রাহীম ইবন অদ্‌হম, (মৃত্যু: ৭৪৩ খ্রী:) এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতে তাঁহার মন্ত্রশিষ্যেরা 'খিজরীয়া' নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা আরবদেশের পৌরাণিক সাধু 'খিজর'-এর চিরঞ্জীব হওয়ায় এবং অলৌকিক কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষমতায়, বিশেষ করিয়া পানির মালিক রূপে চির-বিরাজমান বলিয়া লৌকিক-বিশ্বাসে আস্থাপরায়ণ। উত্তর-ভারতীয় 'খিজরীয়া'-সম্প্রদায় কখন বাংলায় প্রবেশ করেন, তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন। 'খিজর' বা 'খোয়াজ-খিজির' বাংলায় আসিয়া 'খিজির পীরে' পরিণত হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাখরগঞ্জ, ফরীদপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ, পাবনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় নদীতীরে অবস্থিত সাধারণ লোক এখনও খোয়াজ-খিজির বিশ্বাস করে। নদীতে বা সমুদ্রে নৌকা-ডুবি হইলে এখনও নাকি 'খিজির-পীর' নিমজ্জমান লোকদিগকে রক্ষা করেন। কলিকাতার 'খিদিরপুর' (জোয়াদের 'দ' উচ্চারণে) এবং ঢাকা জেলার লৈখ্যা-নদীর তীরে অবস্থিত 'খিজিরপুর' এখনও খিজিরপীরের স্মৃতি বহন করিতেছে। বাংলায় বেরা-ভাসান উৎসব কিছুদিন আগেও খিজিরপীরের উদ্দেশ্যেই প্রতিপালিত হইত। মুঘল-যুগে এই বেরা-ভাসান উৎসব সরকারী স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। ঢাকার মুঘল সুবাদার মুকররম খাঁ (১৬২৬–১৬২৭) সরকারীভাবে এই উৎসব উদ্‌যাপন করেন। এতৎসত্ত্বেও 'খিজির-পীর' তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বুড়ীগঙ্গায় ডুবিয়া মরিলেন। মুরশিদকুলী খাঁ (১৭০৪–১৭২৭) যখন বাংলার নবাব, তখন 'বেরা-ভাসান' উৎসব আবার সরকারী স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। নবাব সিরাজুদ্দৌলাও ভাগীরথী তীরে এই উৎসবে যোগদান করিতেন। এই বিবরণী হইতে বঙ্গে অদহমী বা খিজরীয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবের ব্যাপকতা সম্বন্ধে সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সূফী পীরদের প্রভাবে বাংলার লোক-সঙ্গীত পুনর্জীবন লাভ করিল। শুধু যে পূর্ববঙ্গের 'মুর্শিদা-গানে' এই পীর-বাদের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইল তাহা নহে, এখানকার অধিকাংশ মুসলমান কবিই কাব্যারম্ভে পীরের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া রচনায় হাত দিয়াছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ফারসী ভাষায়ও বহু সূফী গজল ও কবিতা রচিত হইল। তাহার ভাব যেন—

"ধর্মাধর্মের কোন্দল যত একখানে মিশে যায়,
স্বপন সে এক,—বিবিধ মুখে সে বিবিধ ব্যাখ্যা পায়।"

বাংলা-ভাষায়ও এই সময়ে সূফী-সাহিত্য কম রচিত হয় নাই। ধর্মীয় ঔদার্য বা ধর্মীয় শৈথিল্যই এই সাহিত্যের মূল সুর। হিন্দুদের মধ্যে 'সত্যপীর' বা 'সত্যনারায়ণ'-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক সাহিত্য-সৃষ্টি এবং মুসলমানদের মধ্যে 'যোগ-কালন্দর' রচনার বাহুল্যও উক্ত সূফী-সাহিত্য-রচনার প্রভাবেই সম্ভবপর হইয়াছিল। যদিও কাব্য হিসাবে এ-সব রচনার কোন বিশেষ মূল্য নাই, তথাপি এই সময়কার বাংলার হিন্দু-মুসলিম মনের সম্যক পরিচয় পাইতে হইলে, এইগুলির আলোচনা একান্তই আবশ্যক। মুঘল-আমলেই

বাংলাদেশে ফারসী-ভাষার চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রাক্‌-মুঘল আমলে এদেশে রাজকার্য নির্বাহের ভাষা ফারসী থাকিলেও, ধর্মীয় ভাষারূপে মুসলমানদের মধ্যে আরবী ভাষার চর্চা প্রধান ছিল। এই সময়ের কোন শিলালেখায় বা মুদ্রালিপিতে ফারসী-ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ঐতিহাসিকের মনে পূর্বোক্ত ধারণাই বদ্ধমূল হয়। আরবীকে ধর্মীয় ভাষারূপে সর্বোচ্চ স্থান দিয়া, ফারসীকে রাজকার্যের জন্য চালাইয়া, আর সমস্ত কাজে দেশীয় যে-কোন ভাষার ব্যবহার করিতে তখনও কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই। এই কারণে বাংলার হিন্দুদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাষারূপে তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃতের এবং হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে বাংলা-ভাষার বহুল-ব্যবহার চলিত। এই প্রসঙ্গে বাংলার স্বাধীনতার যুগের অবসান-কালীন একখানা বাংলা-লিপির উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম বীর ঈসা খাঁ (১৫৭৫–১৫৯৯) ছিলেন সম্রাট আকবরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী; বছর ত্রিশেক পূর্বে আবিষ্কৃত তাঁহার একটি কামানে উৎকীর্ণ বাংলা লিপিটি উক্ত মন্তব্যের বিশেষ পরিপোষক। লিপিটি (প্রতিলিপি চিত্রে দ্রষ্টব্য) এইরূপ :

"সরকার শ্রীযুত ইছা খাঁ
ন মসন্দালি সন হাজার
"১০০২"
{ ১০০২+৫৯৩=১৫৯৫ খ্রী: }

মুঘল-আমলে, শুধু রাজকার্যে নহে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ফারসী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইতে থাকে। এই কারণেই বাংলায় মুঘল আমলের কোন মুদ্রালিপি বা শিলালেখ আরবীতে উৎকীর্ণ হয় নাই। এই সময়ে নানাভাবেই ফারসী ভাষা প্রচলিত হইতে লাগিল : মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসী, মস্‌জিদ-গাত্রে ফারসী, গৃহ-নির্মাণ লিপিতে ফারসী, শাহী-ফরমানে ফারসী, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফারসী, রাজস্ব বিভাগে ফারসী, শিক্ষা-দীক্ষা ও আলাপ-আলোচনায় ফারসী দেদার চলিতে লাগিল। বিদ্যাবত্তা, চাকরি-বাকরি এমন কি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও অচিরেই ফারসী হইয়া উঠিল। অগত্যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফারসী শিখিতে শুরু করিলেন। এইভাবে ফারসী-ভাষা চর্চার যে ফল হইল, তাহা দেশের সাংস্কৃতিক-জীবনে এবং তৎসূত্রে সাহিত্যিক-জীবনে কয়েকভাবেই দেখা দিয়াছিল। মুঘল-আমলের প্রায় অধিকাংশ বাংলা-সাহিত্য, বিশেষ করিয়া মুসলিম বাংলা-সাহিত্য ফারসী ভাষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠে। মুসলমানদের মধ্যে আলাওল (১৬০৭–১৬৮০) এবং হিন্দুদের মধ্যে ভারতচন্দ্র (১৭১২–১৭৬০) এই দুই কবির কাব্যে ফারসী প্রভাবের অত্যধিক ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই যুগের হিন্দু-সমাজের কথাও ভুলিলে চলিবে না। সাংস্কৃতিক দিক হইতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, এই সময়ে নূতন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রচার ও প্রসার বাঙালী হিন্দুর জীবনে এক নবীন সঞ্জীবনীধারা প্রবাহিত করিয়াছে।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের কাজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া একরূপ বন্ধ ছিল। এই সমাজ যেন চৈতন্যদেবকে হারাইয়া সম্বিৎহারা হইয়াছিল। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই তিন বৈষ্ণব মহাজন এই মত

প্রচারের প্রথম যুগে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর সমস্তই যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে শ্রীনিবাস (১৫২২–১৬০৮) নরোত্তম (১৫৩১–১৬১১) ও শ্যামানন্দের (১৫৩৫–১৬৩০) আবির্ভাবে বাংলার বৈষ্ণব-সমাজ আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ইঁহারা বাংলায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে-ভাবে বৈষ্ণব মত প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার চমকপ্রদ কাহিনী বহু বৈষ্ণব-বাংলা-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; তন্মধ্যে ভক্তি-রত্নাকর, প্রেম-বিলাস, নরোত্তম-বিলাস, অনুরাগ-বল্লী প্রভৃতিই প্রধান।

বাংলার জনসাধারণের উপর এই বৈষ্ণব-মহাজনদের প্রভাব অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর। ফলে, বাংলার বাউল, মুর্শিদা, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি ও সুরের পল্লী-সঙ্গীতে কীর্তনের প্রভাব ফুটিয়া উঠিল; 'রাধা ছাড়া সাধা' ও 'কানু ছাড়া গান' রহিল না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, কবির শেখর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব পদকর্তারও আবির্ভাব হইল। রেনেটি, গড়নহাটি, মনোহর সাঁই প্রভৃতি বিশিষ্ট রীতি ও ভঙ্গী লইয়া কীর্তন-অনুষ্ঠান জনসাধাণের মধ্যে পদকর্তাদের পদগুলিকে প্রিয় করিয়া তুলিতে লাগিল। পাছে এই সমস্ত পদ চিরতরে বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় বিদগ্ধ-বৈষ্ণবেরা কয়েকটি পদ-সঞ্চয়ন-গ্রন্থে পদগুলিকে স্থান দিয়া ইহাদিগকে একটা স্থায়ী সাহিত্যিক-মর্যাদা দান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিকে সংগৃহীত রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত-সমুদ্র' বৈষ্ণব-দাসের 'পদকল্পতরু' এবং গৌরসুন্দর দাসের 'সংকীর্তনানন্দ' গ্রন্থের নাম করা যায়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'গীত-চিন্তামণি' বাংলার বৈষ্ণবদের প্রাচীনতম পদ-সংগ্রহ। ইহাতে পঁয়তাল্লিশ জন কবির প্রায় তিন শতাধিক পদ সংগৃহীত আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকেই এই গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে 'রাগমালা' বা 'ধ্যানমালা' নাম দিয়া মুসলমান কবিগণ বহু পদসঞ্চয়ন-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই সঙ্কলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে ফাজিল নাসির মুহম্মদ কৃত 'রাগমালা' প্রাচীনতম। ইহা চট্টগ্রাম জেলার সুলতানপুর গ্রামের জমিদার ওয়াহিদ মুহম্মদের আদেশে ১০৮৯ মঘীতে (বা ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে) সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে হিন্দু কবি ব্যতীত বহু মুসলিম কবির পদও সংগৃহীত আছে।

এই মুঘল-আমলেই, বাংলার সংস্কৃতিতে আরও একটি নূতন উপাদান সংযুক্ত হয়। ইহা ইউরোপের পর্তুগীজ উপাদান। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলার সহিত পর্তুগীজদের প্রথম পরিচয় ঘটে। এই বৎসরে দোম্‌ জোয়াও-দ্যা-সিল্‌ভেইরা (Dom Joao-da-Silveira) নামক এক পর্তুগীজ নাবিক চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করেন। গৌড়ের সুলতান মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৫৩৩–১৫৩৮) চট্টগ্রাম হইতে গৌড়ে এক পর্তুগীজ প্রতিনিধিদল প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু সুলতানের কাছে এই প্রতিনিধিদল কোন পাত্তা পাইলেন না। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল বাকলারাজ (বাখরগঞ্জ-রাজ) পরমানন্দ রায়ের সহিত, পর্তুগীজদের এক সন্ধি হইল, ইহাতে বাকলার সহিত পর্তুগীজদের বাণিজ্য-সূত্র স্থাপিত হইল। অতঃপর, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাকলা (বাখরগঞ্জ), সন্দিকন বা চণ্ডিকন, (যশোহর), শ্রীপুর (ঢাকা), ভুলুয়া (নোয়াখালী), কাৎরাভু (ময়মনসিংহ-ঢাকা) প্রভৃতি অঞ্চলের ভূঞাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পর্তুগীজেরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অধিকন্তু, তমলুক, হিজলী, হুগলী (Porto Pequeno) ঢাকা,

সন্দীপ, চট্টগ্রাম (Porto Grande) প্রভৃতি বন্দরে বাণিজ্য-ব্যপদেশে পর্তুগীজদের বসতি স্থাপিত হয়। এইভাবেই বঙ্গে পর্তুগীজ-প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে।

আমাদের দেশে 'পর্তুগীজ-জলদস্যুর' উৎপাতের কথা বিস্মৃত হইবার নহে। তারা 'হার্মাদ' পর্তুগীজ আর্মেডা– Armada শব্দের অপভ্রংশ) নামে কুখ্যাত হইয়া এদেশে চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের অন্ততঃ দুই স্থলে এই ভয়াবহ জলদস্যু হার্মাদদের উল্লেখ দেখা যায়। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে (রচনা ১৫৯৪–১৬০৬) তাহাদের সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন :

"ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে॥"

ইহাতে পশ্চিম বঙ্গের হার্মাদ-উৎপাতের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে ইহাদের উৎপাত আরও ভয়াবহ এবং ব্যাপক ছিল। তৎসম্বন্ধে কবি আলাওল (১৬০৭–১৬৮০) তাঁহার 'পদ্মাবতী' কাব্যে (রচনা ১৬৫১ খ্রী:) লিখিয়াছেন :

"কার্যগতি যাইতে পথে বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন॥
বহুযুদ্ধ আছিল, শহীদ হৈল তাত।
রণক্ষতে ভোগযোগে আইলুং এথাত॥"

পর্তুগীজেরা আমাদের দেশে শুধু জলদস্যু বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই জীবন অতিবাহিত করেন নাই; দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সহিতও তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ফলে, দেশে পর্তুগীজ-প্রভাব কালক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে : দেশীয় রাজা ও ভূঞাদের সেনা-বিভাগে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়ে, নানা স্থানে মসজিদ ও মন্দিরের সহিত গীর্জাও স্থাপিত হইতে থাকে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের ন্যায় দেশের সামাজিক জীবন হইতে পৃথকভাবে বাস না করিয়া, তাহারা অবাধ গতিতে দেশীয় লোকদের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে থাকে। কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে তাহাদের বংশধরেরা এখনও 'টেঁশ-ফিরিঙ্গী' অথবা 'মেটে-ফিরিঙ্গী' নামে পরিচিত।

প্রকৃতপক্ষে পর্তুগীজেরাই পদ্য-পরিপ্লাবিত বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার গদ্যের ব্যবহার করেন। অবশ্য, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে গিয়াই তাহাদিগকে এই কার্যে হাত দিতে হইয়াছিল। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার সোসা (Father Sosa) একটি খ্রীষ্ট-ধর্মীয় প্রচার-পুস্তিকা বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন। এখন ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইলেও, দোম্-এন্তনিও-দ্যা-রোজারিও (Dom-Antonio-da-Rozario) নামক এক ধর্মত্যাগী বাঙালী হিন্দুর (ধর্মত্যাগ–১৬৬৩) "ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ" এখনও বর্তমান আছে। ম্যানুয়েল-দ্যা-অস্সুম্পকাও (Manoel-da-Assumpcao) নামক আর এক পর্তুগীজ-পাদ্রী 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' নামক পুস্তকটিকে রোমান হরফে প্রত্যক্ষরিত করেন। এই পাদ্রীটি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (Crepar Xastrer Orth Bhed) নামক আর একখানা খ্রীষ্টানী প্রচার-পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন এবং অন্যান্য পাদ্রীদিগকে ধর্ম-প্রচারে সাহায্য করিবার জন্য একখানা বাংলা ব্যাকরণ ও একখানা বাংলা অভিধান সঙ্কলন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ই বাংলা-ভাষার সর্বপ্রথম ব্যাকরণ ও

অভিধান। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিস্‌বন্ শহরে পাদ্রী অস্‌সুম্পকাও-এর পুস্তক তিনটি মুদ্রিত হয়।

বাংলার সংস্কৃতিতে পর্তুগীজ-প্রভাব অত্যধিক ব্যাপক ও গভীর। নানাবিধ দোষের অধিকারী হইলেও, পর্তুগীজেরা এই সময় হইতে আমাদের ভাষায় একটি স্থায়ী আসন দখল করিয়া রাখিয়াছে। চাষবাসের ক্ষেত্রে পর্তুগীজেরাই আমাদের দেশে উত্তর-আমেরিকা হইতে তামাক (পর্তুগীজ Tobaco) ও গোল-আলু (পর্তুগীজ Patata) দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল হইতে 'কাজু-বাদাম' বা 'হিজলী বাদাম' (ইংরেজী Cashew nut পর্তুগীজ-ব্রাজিল Acajoba) পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে পেঁপে (পর্তুগীজ Papaya), আনারস (পর্তুগীজ Anannas), কামরাঙ্গা (পর্তুগীজ Carambola), গয়াম বা পেয়ারা (পর্তুগীজ Guyava, Pera) প্রভৃতি আমদানী করিয়াছিলেন। আমাদের গৃহের বারান্দা (পর্তুগীজ Varanda) ও জানালা (পর্তুগীজ Jenala) এবং ইহার আসবাব-পত্রের মধ্যে কেদারা (পর্তুগীজ Cadeira), মেজ (পর্তুগীজ Mesa), চাবি (পর্তুগীজ Chabe), বালতি (পর্তুগীজ Balde), পেরেক (পর্তুগীজ Prego), তোয়ালে (পর্তুগীজ Toalha), আলপিন (পর্তুগীজ Alfinete), সাবান (পর্তুগীজ Sabao) প্রভৃতিও পর্তুগীজ সভ্যতার জয় আজও ঘোষণা করিতেছে।

মুঘল-আমলের বাংলা-সাহিত্যের, তাহা মুসলমানের হউক আর হিন্দুরই হউক, আলোচনায় এই সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রভাবকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কেননা, যে-যুগের যে-পরিবেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহাকে তৎপূর্ব-বা-পরবর্তী যে কোন সময়কার মাপকাঠিতে বিচার করিলে তৎপ্রতি অবিচার করা হয়। কারণ, সাহিত্য প্রধানতঃ যুগধর্ম বলিয়া যুগপ্রভাবকে এড়াইয়া সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুঘল-আমলের কবি ও কাব্য-পরিচিতি
(মুখবন্ধ)

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ-অনুসন্ধিৎসা লইয়া এই দেশের মুসলমানেরা আজ পর্যন্ত তাঁহাদের অতীত ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহে ও ইহার অধ্যয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রবৃত্ত না হইলেও, মরহুম মৌলবী আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ (মৃত্যু; ১৯৫৩) প্রমুখ দুইচারিজন সাহিত্য-সাধকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ যাবৎ যে-সমস্ত অমূল্য উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মোটামুটি আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলায় মুঘল-আমলে বহু মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। আমাদের এই আলোচনা মুখ্যতঃ মরহুম সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের সংগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। ইহার সহিত আমার নিজের ক্ষুদ্র সংগ্রহও যুক্ত হইয়াছে। জনাব অধ্যাপক আলী আহ্‌মদ সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহ স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য না হইলেও, তাঁহার "বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ" আলোচনা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত "বাঙ্গলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি" নামক গ্রন্থটিও এই আলোচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

এত কবি ও এত কাব্যের পরিচয় দান এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। তাই বিশিষ্ট কবি ও কাব্যের আলোচনা যথাসাধ্য সংক্ষেপ করিয়া পরিচ্ছেদটিকে ক্ষুদ্র করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে সকল বিষয়ে সম্যক আলোকপাত সম্ভবপর না হইলেও, যাহাতে যুগটির সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে একটা মোটমুটি ধারণা জন্মে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত কবিদের সময় নির্ণয়ে মুহম্মদ মুকীম নামক এক কবির উক্তি বিশেষ সহায়ক বলিয়া এই স্থলে উক্তিটির উদ্ধৃতি আবশ্যক। কবি মুকীম চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের লোক। তাঁহার 'ফায়েদুল মুকতদী' নামক গ্রন্থটির রচনাকাল এইরূপ :

"ঋতু বেদ চন্দ্র শত আশী আর নয়।
ইতি সার জান মঘী সনের নির্ণয়॥"

'অঙ্কস্য বামাগতি' রীতিতে এই তারিখটি দাঁড়ায়— ১০৪৬+৮০+৯=১১৩৫ মঘী + ৬৩৮ = ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা কবির শেষ রচনা। ইহার পরে কবি আর কোন কাব্য লেখেন নাই। তাহা হইলে কবির আনুমানিক জীবনকাল ১৭০০ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরা যায়। ১৭৬০ হইতে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, রচিত তাঁহার* 'গোলে

বকাওলী' নামক কাব্যে কবি চট্টগ্রামবাসী অতীত ও বর্তমান কবিদের একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়াছেন। ইহা এইরূপ :

"এবে প্রণামি আমি পূর্ব কবি জান।
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান॥
মুহম্মদ খান, বিতর্পণ (?) দৌলত কাজী বর।
এহি তিন আর এক আছএ তৎপর॥
গৌড়বাসী রৈল আসি রোসাঙ্গের ঠাম।
কবিগুরু মহাকবি আলাওল নাম॥***
শিরোমণি আলাওল মরণে জিওন।
শেষ গুণী গুরু মানি প্রণামি চরণ॥
আর বৃদ্ধ মহাশৈক্য আবদুল নবী নাম।
গয়াছক (গয়াস খাঁ), মুজাম্মিল সুধীর উপাম॥
হাবুত রোয়াজা, সেক পরাণ, পরাগল।
ফাজিল নাছির, তাহির সকল॥
আলী মুহম্মদ আর চামু বুধ জান।
পূর্ব ধীর নামে নামে প্রণামি চরণ॥
অখনের পণ্ডিত আছএ যথাতথা।
সে সব প্রণাম করি কহিবাম গাথা॥
শাহা আলী রাজা পদ করিয়া প্রণাম।
হারী নাম, আলী মিঞা পদেতে সালাম॥
মুন্সী নাম মুহম্মদ মুকীমে বন্দিয়া।
শ্রীযুত দানিশ কাজী পদ প্রণামিয়া॥
অগ্রামী প্রনামিয়া চলিলুং পাছে পাছে।
করীম রহীম বলি প্রভু নাম আছে॥"

এই ফিরিস্তিটি চট্টগ্রামের বহু কবির সময় নির্ণয়ে বিশেষ সহায়ক। এই দিক হইতে ইহার মূল্য অত্যধিক।

এই যুগের আলোচনায় ইতিহাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। আলোচনায় যাহাতে কোথাও ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি,

*কবির এই কাব্য রচনার কোন তারিখ নাই। তবে তিনি লিখিয়াছেন—

উত্তরে পর্বতরাশি দক্ষিণে সাগর।
স্বর্গপ্রায় স্থল নাম চাটিগাঁ শহর॥...
ইংরেজ নৃপতি সে যে ফিরিঙ্গির জাত।
ইছবি ছুছান নিত্য পাদরী সাক্ষাৎ॥...
চিরদিন ইংরেজে এথা মহীপাল।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ তস্করের কাল॥

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলেই দেখা যায়, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা মীর কাসিমের নিকট হইতে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের অধিকার লাভ করেন। সুতরাং 'গুলে বকাওলী' ১৭৬০ হইতে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

কেন না ইহার অভাবে বাংলার মুসলিম সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে এ-যাবৎ সম্যক ধারণা করিতে পারা যায় নাই। দেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও প্রভাবের ধারা হৃদয়ঙ্গম করিতেও এই ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর আবশ্যকতা অত্যধিক। মোটের উপর, ঐতিহাসিকতা রক্ষায় এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। তবে, ইহা আমার বিগত পঁচিশ বছরের গবেষণার ফল বলিয়া, এই বিষয়ের ভাবী গবেষকদিগকে ইহা যে পথ দেখাইয়া দিবে, সে-বিষয়ে আমি একরূপ নিশ্চিন্ত।

সয়্যিদ সুলতান

(আনুমানিক ১৫৫০–১৬৪৮)

কবি সয়্যিদ সুলতান মুসলিম বাংলার মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন। নিম্নে কবির আত্ম-বিবরণী হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি। কেন না ইহাই তাঁহার কাল নির্ণয়ের একমাত্র না হইলেও প্রধান উপাদান। ইহাকে উপেক্ষা করিয়া কবির কাল নির্ণীত হইতে পারে না :–

"বিচমিল্লাহির রহমানিররহিম।
আল্লার মহিমা জান কহিতে অসীম॥
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরাকার।
আদ্যেত আছিল যাহা করিমু প্রচার॥
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রছুল খোদার।
নূর মুহম্মদ বলি জগতে প্রচার॥
তৃতীয়ে প্রণাম করি আছবা সবারে।
চতুর্থে প্রণাম করি পীর পেগাম্বরে॥
এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুয়ায়।
প্রকাশ্যে সকল কথা মনে নাহি লয়॥
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি॥
হিন্দু মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রছুলের কথা কেহ না সোঙরে॥
গ্রহ শত রস যোগে অব্দ গোঙাইল।
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ ন কহিল॥
আরবী ফার্ছি ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মুর্খসুত॥
দুক্ষ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা যথ কহিমু অধিক॥
লস্করের পুরখানি আলিম বসতি।
মুঞি মূর্খ আছি এক ছৈয়দ সন্ততি॥
আলিমান পদে আক্ষি মাগি পরিহার।
খেমিবা পাইলে দোষ ন করি গোহার॥

ছৈয়দ ছুলতানে কহে কেনে ভাবি মর।
সহায় রছুল যার তরিবে সাগর॥

উপরোদ্ধৃত অংশটুকু কবির 'শব-ই-মিরাজ' গ্রন্থের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ। এতদ্ব্যতীত কবির আর কোন গ্রন্থে তাঁহার কোন আত্মবিবরণী পাওয়া যায় নাই। সুতরাং, অন্ততঃ কবির সময় নির্ণয়ের জন্য ইহাই আমাদের প্রধান সম্বল। কালজ্ঞাপক "গ্রহ শত রস যোগে" কথার ব্যাখ্যার উপরই তাঁহার কাল-নির্ণয় নির্ভরশীল। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ব্যতীত আর কেহই এই পর্যন্ত কবির সময় সম্বন্ধে সার্থক আলোচনা করেন নাই। কবি মুহম্মদ খানের সহিত কবি সয়্যিদ সুলতানের 'গুরুশিষ্য' সম্বন্ধ আবিষ্কার তাঁহারই কীর্তি। এতদ্ব্যতীত কতিপয় প্রাচীন পুঁথির আলোচনার সাহায্যে তিনি "গ্রহ শত রস যোগে" পাঠের 'যোগে' শব্দের 'যুগে' ব্যাখ্যা দিয়া "কবি সয়্যিদ সুলতানের' সময় ও অন্যান্য আরও দুই এক বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, কবি সয়্যিদ সুলতান "গ্রহ শত রস যুগেই' তাঁহার 'শব-ই-মিরাজ' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রহ শত —৯০০
রস —৯ (রস শব্দে ৬ এবং ৯ দুই-ই হয়। বৃহত্তর সংখ্যাটি গ্রহণই বাঞ্ছনীয়)
যুগ —৪

৯৯৪ হিজরী—১৫৮৫ অথবা ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

তাহা হইলে, কবির 'শব-ই-মিরাজ' গ্রন্থ রচনার তারিখ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ে কবির বয়স ৩৫ বা ৩৬ বৎসর বলিয়া ধরা হইলে, তিনি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহা না হইলে বিরাট বিরাট এতগুলি গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর হইত না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যের কথা ও সময় সম্বন্ধে স্মরণ রাখিলে তাঁহার মৃত্যুকাল ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বলিয়া ধরিতে হয়। ইহাতে কবির বয়স ৯৮ আটানব্বই বৎসরে দাঁড়ায়। ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে।

কবি মুহম্মদ খান কবি সয়্যিদ সুলতানের শিষ্য ছিলেন। মুহম্মদ খান গুরুর আদেশে 'কিয়ামৎনামা' রচনা করেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' রচিত হইয়াছিল "দশ শত বাণ শত বাণ দশ দধি" শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৫৭ শকাব্দে বা ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, এবং 'কিয়ামৎনামা' রচিত হইয়াছিল—"বাণ বাহু সম অব্দ আর বাণ শত॥ বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া "দধি" শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৭ শকাব্দে বা ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। "সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ" রচনা কালে মুহম্মদ খানের বয়স ৩৫ বৎসর ধরিলে, তিনি আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এই সময়ে সয়্যিদ সুলতানের বয়স আনুমানিক ৫০ বৎসর ছিল। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি মুহম্মদ খান সয়্যিদ সুলতানের আদেশে 'কিয়ামৎনামা' রচনা সমাপ্ত করেন। এই সম্বন্ধে মুহম্মদ খানের সাক্ষ্য এইরূপ :

"নবী-বংশ রচিছিলা পুরুষ-প্রধান।
আদ্যের উৎপন্ন বলে করিলা বাখান॥

রছুলের অফাতে রচিয়া না রচিলা।
অবশেষে রচিবারে মোকে আজ্ঞা দিলা॥"
—(কিয়ামৎনামা।)

এই 'নবী-বংশ' রচয়িতা 'পুরুষ প্রধান' কে, তাহার সম্বন্ধেও মাথা ঘামাইবার আবশ্যক করে না। ইঁহার সহিত কবির কি সম্বন্ধ ছিল, তাহাও 'মকতুল হুসৈন' নামক গ্রন্থে তিনি বলিয়া দিয়াছেন :

'সাহা ছোলতান পীর কৃপার সাগর।
সেবকবৎসল প্রভু গুণে রত্নাকর॥
তাহান আদেশ-মাল্য শিরেত ধরিয়া।
মুহম্মদ খানে কহে পঞ্চালি রচিয়া॥
—(মকতুল হুসৈন)

১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে কবি সয়্যিদ সুলতান অধিক কাল বাঁচেন নাই। কেননা, সয়্যিদ সুলতানের 'ওফাৎ-রসুল'-কাব্যের পরিকল্পনায় চারি আসহাবের ও কারবালার ঘটনা বর্ণনার কথা স্থান পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি নিশ্চয় বার্ধক্যবশতঃ তাহা লিখিয়া যাইতে না পারিয়া, তাঁহার কবি-শিষ্য মুহম্মদ খানকে এই দুই বিষয় লিখিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাই, মুহম্মদ খান লিখিয়াছেন :

"রছুলের অফাতে রচিয়া না রচিলা।
অবশেষে রচিবারে মোকে আজ্ঞা দিলা॥
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলি।
চারি আছবার কথা কৈলু পদাবলি॥
দুই ভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া।
প্রলয়ের কথা সব দিলু প্রচারিয়া॥
অন্তে তবে বিরচিলু প্রভু দরশন।
ইহা হোন্তে ধিক কথা নাহি কদাচন॥
দুই পঞ্চালিকা যদি একত্র করয়।
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধি যুক্ত হয়॥
—(কিয়ামৎনামা)

অতএব, সয়্যিদ সুলতানের মৃত্যুর সময়কে 'কিয়ামৎনামা' রচনার (১৬৪৬) সময় হইতে আরও দুই বৎসর পিছাইয়া ধরিলে, তাঁহার জীবনকাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলিয়া ধরিতে হয়।

এখন দীর্ঘ গবেষণার ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কবি সয়্যিদ সুলতান চট্টগ্রামের 'চক্রশালা' পরগনার (রাজ্যের) অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তী কবি মুকীম তৎপূর্ববর্তী চট্টগ্রামবাসী কবিদের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া সর্বাগ্রে সয়্যিদ সুলতানের নাম করিয়াছেন এবং আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি বর্তমান পটিয়া থানার অন্তর্গত 'চক্রশালা'-র মীর (সৈয়দ) বংশীয় পীর ছিলেন। অধিকন্তু, কবি মুহম্মদ খানের 'মকতুল হুসৈন' নামক কাব্যের অন্তর্গত 'হানিফার পত্র পাঠ' খণ্ডে 'এজীদের উত্তর' নামক অংশ মুজাফর নামক এক কবির রচনা। তিনি আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন :

"ছোলতান-দৌহিত্র চক্রশালা ঘর।
কহে হীন মুজাফরে এজিদ-উত্তর॥"

অতএব, কবি সয়্যিদ সুলতানের বাড়ি যে চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। বংশে খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়াই কবি মুজাফর নিজেকে কবি সয়্যিদ সুলতানের বংশধর (দৌহিত্র) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

তবে কি কবি সয়্যিদ সুলতান 'শব-ই-মিরাজ' গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, ("লস্করের পুরখানি আলিম বসতি। মুঞি মূর্খ আছি এক ছৈয়দ সন্ততি॥") তাহা ঠিক নহে? না, তাহাও ঠিক। বুঝা আবশ্যক যে, 'লস্করের পুর' এবং 'লস্কর পুর' এক অর্থ দ্যোতনা করে না। লস্কর পরাগল খাঁর রাজধানী পরাগলপুর অর্থাৎ 'লস্করের পুর' (লস্কর পরাগল খাঁ যেই পুরে বাস করিতেন সেইপুর,—'লস্করপুর' বা লস্করের নামে নাম দেওয়া হইয়াছে যেই 'পুরের' সেই 'পুর' নহে।) তখন বর্ধিষ্ণু ও খ্যাতনামা ছিল। সেই পরাগলপুরে পীর-মুরীদী-ব্যপদেশে সয়্যিদ সুলতান সাময়িকভাবে বাস করিতেন। তথায় থাকাকালে তিনি 'শব-ই-মিরাজ' লিখিয়াছিলেন বলিয়া "মুঞি মুর্খ আছি এক ছৈয়দ সন্ততি"-র মত উক্তি করিয়াছেন লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, 'আছি ক্রিয়ায়' স্থায়ী-পৈতৃক ভূমে বাস করা নাও বুঝাইতে পারে এবং দেখা যাইতেছে, তিনি সত্যই তাহা করেন নাই।

কবি সয়্যিদ সুলতান কতগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। এ-যাবৎ তাঁহার নিম্নলিখিত গান ও পুস্তকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :

(ক) নবী বংশ
(খ) শব-ই-মিরাজ
(গ) রসুল-বিজয়
(ঘ) ওফাৎ-ই-রসুল
(ঙ) জয়কুম রাজার লড়াই
(চ) ইব্‌লীস-নামা
(ছ) জ্ঞান-চৌতিশা
(জ) জ্ঞান-প্রদীপ
(ঝ) মারফতী-গান
(ঞ) পদাবলী

এই পুস্তকগুলির পরিচয় নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে :—

(ক) নবী-বংশ :— কবি সয়্যিদ সুলতানের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'নবী-বংশ' কাব্যটিকে 'ম্যাগনাম ওপাস' Magnum Opus) বা কবির শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম গ্রন্থ বলিতে পারা যায়। ইহা বিষয়-বৈচিত্র্য ও আকারে সপ্তকাণ্ড 'রামায়ণ'কেও হার মানাইয়াছে। এই কাব্যটিকে বাংলা মহাকাব্যের একটি মহান আদর্শ বলা চলে। শরীয়তী বা শাস্ত্রীয় ইসলাম বিরুদ্ধ ধারণা লইয়াই 'নবী-বংশের' আরম্ভ বলিয়া মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে তাহা নহে। এ-কথা সত্য যে, 'নবী'-র বাংলা প্রতিশব্দ 'অবতার' বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি যে হিন্দুর অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন, তেমন কথা বলা উচিত নহে। কারণ, তাঁহার 'নবী-

বংশ' আদ্যন্ত পাঠ করিলে দেখা যায়, ইসলামী তৌহীদবাদ বা নিরাকার আল্লার নিছক একত্ববাদ প্রচার করিবার জন্য এদেশের চিরপরিচিত অবতারবাদকে কাব্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাই, তাঁহার নবী-বংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও হরি বা কৃষ্ণ অবতার বা নবী রূপে চিত্রিত হইয়া যথাক্রমে সাম, যজু, ঋক ও অথর্ব,—এই চারিটি আসমানী কিতাব লাভ করিয়াছেন, যাহা বেদ, তাহাই শ্রুতি, তাহাই আসমানী কিতাব, বটে। কিন্তু কালক্রমে শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায়, বেদগুলি সমুদ্র-জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আদম, শীশ, ইদ্রিশ, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, দাউদ, সুলেমান, ঈসা ও হজরত মুহম্মদ (দ:) পৃথিবীর পাপ ধ্বংস করিয়া তৌহীদ প্রচার করিবার জন্য জগতে প্রেরিত হইলেন। কবির ভাষায় হজরৎ মুহম্মদ (আ:) সম্বন্ধে :

"এই চারি বেদে সাক্ষী দিছে করতার।
অবশেষে মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার॥"

কুরআন-শরীফের পূর্ববর্তী তৌরীৎ, জব্বুর, ইঞ্জিল প্রভৃতি আসমানী কিতাব এবং অসংখ্য সহীফহ্ ঐ ঐ মতাবলম্বীদের দ্বারা বিকৃত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হইয়া বাতিল বা মনসূখ হইয়াছে বলিয়া আমরা এখনও বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কবি যদি শ্রুতি বা বেদকে আসমানী কিতাব ধরিয়া লইয়া 'মনসূখ' হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং তাহাতে হজরৎ মুহম্মদের (দ:) আবির্ভাবের কথা রহিয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহাতে এমন কোন অন্যায় হইয়াছে কি?

কবির 'নবী-বংশ' সম্বন্ধে আমরা যে-মতই আজ পোষণ করি না কেন, ইহা যে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ ও প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে কবির নিজের কথাই উদ্ধৃত করা হইল :

"কহে ছৈয়দ ছোলতানে শুন নরগণ।
এহি হিন্দী নবী-বংশ শুন দিয়া মন॥
আছিল আরবী ভাষে হিন্দী করিলুঁ।
বঙ্গদেশী বুঝে মত প্রচারিয়া দিলুঁ॥
ন বুঝি আরবী-শাস্ত্র জ্ঞান ন পাইলা।
হিন্দুয়ানী ভাষা পাই আচার জানিলা॥"

ইহার বিষয়-বস্তু এত বিশাল ও বিচিত্র যে, এখানে তাহার আলোচনা সম্ভবপর নহে। 'সৃষ্টি-পত্তন' অর্থাৎ বিশ্ব-সৃষ্টির কাল্পনিক কাহিনী লইয়াই কাব্যখানির আরম্ভ এবং হজরৎ মুহম্মদ (দ:)-এর আবির্ভাবে আসিয়াই ইহার শেষ। মাঝখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নরসিংহ বামন, রাম, কৃষ্ণ হইতে আদম, শীশ, নূহ, ইবরাহীম,মূসা, ঈসা (আ:) ইত্যাদি সকলকেই পয়গাম্বর শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা 'কসসূল-আম্বিয়া' নামক গ্রন্থের অনুবাদ নহে, তবে ঐ শ্রেণীর একটি মৌলিক কাব্য। কবি তাঁহার 'শব-ই-মিরাজ' নামক অন্য কাব্যে 'নবী-বংশের' বিষয়-বস্তু এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন :

"তোহ্মার সবের মুঞি জান হিতকারী।
ইমা ইছলামের কথা দিলাম প্রচারি॥
যেরূপে সৃজন হৈল এ তিন ভুবন।

যেরূপে সৃজন হৈল সুরাসুরগণ।
যেরূপে আদম হাওয়া সৃজন হইল।
যেরূপে যতেক পয়গম্বর উপজিলা॥
বঙ্গেত এসব কথা কেহ না জানিল।
নবী-বংশ পাঁচালীতে সকলে শুনিল॥"

—(শব-ই-মিরাজ)

কবি সয়্যিদ সুলতান যে বিষয় লইয়া 'নবী-বংশ' রচনা করিয়াছেন তাহা মোটামুটি কবিত্ব প্রদর্শনের পরিপন্থী। এহা ধর্মীয় কাহিনী, সুতরাং কবির পক্ষে কল্পনার বিলাস ও কবিত্ব দেখাইবার সুযোগ কোথায়? এতৎসত্ত্বেও, ভাবের ঔদার্যে, কল্পনার বিলাসে, সৌন্দর্য-বোধের চমৎকারিত্বে তাঁহার ভাষা কাব্যখানির সর্বত্র যেরূপ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে নানা ছন্দে ঝংকৃত হইয়া উৎসারিত হইয়াছে, তাহার তুলনা মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে একরূপ বিরল। উদাহরণ স্বরূপ হজরত আদম (আ:)-এর সহিত বীবী হাওয়ার বিচ্ছেদ-বর্ণনার অংশটুকুর কথা উল্লেখ করা যায়। কবি এই অংশে অন্যান্য বিষয়াদির সহিত প্রাচীন সাহিত্যিক রেওয়াজ হিসাবে বারমাসীর (বা দ্বাদশ মাস ধরিয়া বিরহী বা বিরহিণীর দুঃখ-বর্ণনার) প্রবর্তন করিয়াছেন। কাব্যের অন্য কোথাও এমন সুষ্ঠুভাবে 'বারমাসী'র প্রবর্তন করা যাইত না। এই 'বারমাসী'র সামান্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

জ্যেষ্ঠ অশিষ্ট ভেল তাপিত তপন।
কুস্তুরী কুঙ্কুম অঙ্গে লাগে হুতাশন॥
দক্ষিণ সমীর মোর শমন সমান।
অনল হইয়া নিতি দগধে পরাণ॥
আষাঢ়ে সংসার ভরি জলে বেয়াপিত।
পিউ পিউ পক্ষী নাদ অতি সুললিত॥
আহ্মার চাতক পিয়া রৈল দেশান্তর।
জলদ হইয়া আছি আছি একসর॥
শ্রাবণ সঘন বরিখয়ে জলধারে।
গিরিপরে শিখী সবে সুখে নাদ করে॥
মুঞি পাপী শিখিনীর জল নিল হরি।
সন্তাপে সাগর মধ্যে রহি একসরী॥
ভাদর মাসেত অতি বরিখে গম্ভীর।
ঘোর অন্ধকার নিশি শূন্য এ মন্দির॥
কীট সব কোলাহল শুনি মনে ভীত।
একসর শয়নে কম্পিত চিত নিত॥"

কাব্যের নানা স্থানে বিবিধ অলঙ্কারের ব্যবহারও কবির সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। অনুপ্রাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি, সমাসোক্তি প্রভৃতির ব্যবহারে কাব্যখানি চমৎকার। অনুপ্রাসের উদাহরণ উপরের উদ্ধৃতাংশে পাওয়া যাইবে। উপমার একটা নির্দশন এইরূপ :

"ঢাকিয়া বসনে অঙ্গ সখীগণ লই সঙ্গ,
বাহিরিলা রাজার কুমারী।
জেন আকাশের শশী মর্তেত নামিল আসি
নক্ষত্র সকল সঙ্গে করি।"
—(নবী-বংশ)

সমাসোক্তির একটা নমুনাও এই প্রসঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে, যেমন :

"শুনহ পবন তুহ্মি আহ্মার বচন।
কহিঅ সোয়ামীর পদে মোর নিবেদন॥"

(খ) **শব-ই-মিরাজ** :— কবির কাব্যগুলির মধ্যে এই গ্রন্থের একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। কবির যে আত্ম-বিবরণী গোড়ায় উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা এই 'শব-ই-মিরাজ' গ্রন্থেরই ভূমিকা বা প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদ। ইহা হইতে দেখা যায়, কবি সয়্যিদ সুলতান ৯৯৪ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৮৫—৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত এই কাব্য রচনা কালে বাংলা-ভাষায় ধর্মের কথা প্রকাশ করার জন্য কবি যে সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাও তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও ইহার শিক্ষা-দীক্ষার একটি উজ্জল চিত্র।

এই কাব্যখানিও একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। যে রাত্রে হজরত মুহম্মদ মুস্তফার 'মিরাজ' বা 'আধ্যাত্মিক উন্নয়ন' অর্থাৎ স্বর্গ-পরিভ্রমণ-ঘটনা ঘটে, সে-ঘটনার বর্ণনা দানই এই কাব্যের মুখ্য বিষয়। তথাপি হজরতের 'বিহিশ্‌ৎ ও দুজখ' দর্শন, বিভিন্ন আসমানে ফিরিশ্‌তা ও নবী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ এবং অনুরূপ বহু ঘটনায় এই পুস্তকটি একদিকে যেমন বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে, তেমনই অন্য দিকে বিষয়-বৈচিত্র্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। হজরতের মিরাজ-বর্ণনা কাব্যের মুখ্য বিষয়-বস্তু হইলেও, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া 'মিরাজ' পর্যন্ত বহু ঘটনা কবি এই কাব্যের অঙ্গীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। মিরাজ-রাত্রে, জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তা 'বুররাক'-বাহন-সহ হজরতের সম্মুখে উপস্থিত, তিনি হজরতকে আসমানে লইয়া যাইবেন, অথচ হজরত মুহম্মদ মুস্তফা জিব্‌রাঈলকে চিনিতে পারিতেছেন না। তাই জিব্‌রাঈল হজরতের নিকট নিম্নলিখিত আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন। নমরূদ কর্তৃক হজরত ইবরাহীম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে পর—

মুঞি সঙ্গে ন থাকিতুম যদি সেই কালে।
দহিত তাহার অঙ্গ জ্বলন্ত অনলে॥
ফেরাউন যখনে মুছার লাগ লৈল।
সমুদ্রের কূলে নিয়া মারিতে চাহিল॥
মুঞি ন থাকিতুম যদি তাহার সহিত।
সাগরেত বাহাল ন হৈত কদাচিত॥
মুঞি যে আছিলুং ইছা পয়গম্বর সনে।
যখনে মারিতে গেল ইহুদের গণে॥
মুঞি তানে ইঙ্গিতে অন্তর করি থুইলু।
ইহুদের হাথেত ইহুদ কাটাইলু॥
পৃথিবীত যথেক রছুল হইয়াছে।

মুঞি সে আইসম যাম সভানের কাছে॥
মোর নাম জিব্রাইল জান মহাশয়।
আল্লার ফর্মানে আইলুম তোহ্মার আলয়॥"

হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (দ:) জিবরাঈল ফিরিশতাকে সঙ্গে লইয়া আসমানে উঠিয়াছেন, তথায় বিহিশৎ-দোজখ পরিক্রমা চলিয়াছে, বিহিশতে 'হুরী' বা বিদ্যাধরীগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে।

(গ) **রসূল-বিজয়** :— এই কাব্যখানিও প্রকাণ্ড। ইহার শেষ পত্র সংখ্যা ১০৮। দীর্ঘ তুলট কাগজের দুই পিঠে কাব্যখানি লিখিত। ইহাতে 'নবী-বংশ' ও 'শব-ই-মিরাজ' প্রভৃতি রচনার সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দেওয়া আছে। হজরৎ মুহম্মদ মুস্তফা (দ:)-র ধর্ম প্রচার ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বর্ণনার মাধ্যমে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করাই লক্ষ্য ছিল বলিয়া, তাঁহাকে এই কাব্যখানি রচনা করিতে হইয়াছিল। ইহা কবি জৈনুদ্দীনের 'রসুল-বিজয়' জাতীয় গ্রন্থ বলিয়া এই স্থলে ইহার পৃথক পরিচয় অনাবশ্যক।

(ঘ) ওফাৎ-ই-রসূল :— কবি সয়্যিদ সুলতানের অন্যান্য গ্রন্থের আকারের তুলনায় ইহা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। দীর্ঘ তুলট কাগজের দুই পিঠে লেখা ২৫ পৃষ্ঠায় কাব্যখানি সমাপ্ত। কাব্যখানিকে মরহুম মৌলবী আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব 'নবী-বংশ' নামক কাব্যের একাংশ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু, আসলে তাহা নহে। কাব্যের মধ্য দিয়া ইসলাম ধর্ম-কাহিনী প্রচারের পরিকল্পনায় কবি সয়্যিদ সুলতান যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

(১) নবী-বংশ—সৃষ্টি-পত্তন হইতে হজরৎ মুহম্মদ মুস্তফা (দ:)-র নবুয়ৎ পর্যন্ত ঘটনার সমাবেশ।
(২) শব-ই-মিরাজ—তাঁহার নবুয়ৎ প্রাপ্তির পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য মি'রাজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের ঘটনা-সমাবেশ।
(৩) রসুল-বিজয়—মি'রাজের পর হজরতের ইসলাম প্রচারের কথাগুলির সমাবেশ।
(৪) ওফাৎ-ই-রসূল—ধর্ম প্রচারের পরবর্তী রসূলের তিরোভাব হইতে খুলাফা-ই-রাশিদীনগণের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনার সমাবেশ।

কবির ইচ্ছা ছিল যে, চারি আসহাবের কাহিনী, তৎপরবর্তী মুহররমের ঘটনা এবং কিয়ামৎ—এই তিন বিষয়ে আরও তিনটি গ্রন্থ রচনা করিবেন। কিন্তু, বার্ধক্যবশতঃ তিনি তাহা করিয়া যাইতে না পারিয়া তাঁহার শিষ্য মুহম্মদ খাঁকে কবির এই অসমাপ্ত কার্য সমাধা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত তিনটি পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা যে সয়্যিদ সুলতানের ছিল, তাহা 'ওফাৎ-ই-রসূলে'র উপসংহার পাঠে জানিতে পারা যায়। উপসংহারটির আবশ্যক অংশ এইরূপ :

"তবে যদি পয়গম্বর শরীর এড়িল
সবে মিলি আবুবকরেরে রাজ্য দিল॥
এ দুই বছর তিন মাস দুই দিন।
রাজ্য দেশ পালিলেন্ত হইয়া প্রবীণ॥****
যদি সে নিধন আবুবকর হইলা।

উমর খত্তাব তবে পৃথিবী পালিলা॥
পাঁচ দিন ছয় মাস এ দশ বছর।
পৃথিবীতে অধিকারী আছিল উমর॥****
উমর খত্তাব যদি শহীদ হইল।
তার পাছে আমীর ওছমান রাজ্য পাইল॥
ওছমান নৃপতি ছিল দ্বাদশ বৎসর।
পরস্তাব তাহান আছএ বহুতর॥
ভিন্ন এক পুস্তক রচিতে পারি যবে।
কদাচিত সেই কথা কহিতে পারি তবে॥
অধিক উত্তম কথা কিতাবে দেখিয়া।
আলিম সভাতে দিল বাঙ্গলা রচিয়া॥
আলিম সকলে জানি ন জানে ইহারে।
সেই পাপে ধরিবেক আলিম সবেরে॥
পীর সব চরণে সহস্র প্রণাম।
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম॥

ইহা হইতে দেখা যাইবে, সয়্যিদ সুলতান অতি সংক্ষেপে তিন খলীফার বিষয় উল্লেখ করিয়া 'ওফাৎ-ই-রসূল' শেষ করিয়াছেন। ইহার পর বিস্তৃতভাবে চারি খলীফা, কারবালার বৃত্তান্ত ও কিয়ামৎ-কাহিনী বর্ণনার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু, বার্ধক্যবশতঃ তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। 'ওফাৎ-ই-রসূল' রচনার পরেই কবি বুঝিয়াছিলেন যে, বার্ধক্যবশতঃ আর কোন কাব্য রচনা সম্ভবপর নহে। তাই তিনি তাঁহার কবি শিষ্য মুহম্মদ খাঁকে তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মোট কথা সৃষ্টিপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া কিয়ামৎ পর্যন্ত বর্ণনা করার যে পরিকল্পনা কবি সয়্যিদ সুলতান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পরিকল্পনার চতুর্থ পুস্তক হইল তাহার 'ওফাৎ-ই-রসূল'। অবশিষ্ট তিনখানি পুস্তক—(১) 'সাহাবার কথা', (২) 'মকতূল হুসৈন' ও (৩) 'কিয়ামৎনামা' কবির শিষ্য মুহম্মদ খান কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

'ওফাৎ-ই-রসূল' কাব্যে কবির পূর্ববর্তী রচনার মাধুর্য একরূপ নাই বলিলেও চলে। বিষয়টি মুসলমানদের পক্ষে যে অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়বিদারক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু, সেই যে প্রধান করুণ রস, তাহাও এই কাব্যে সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। কবি বৃদ্ধ-বয়সে রস-প্রকাশে অক্ষম হইয়া না পড়িলে কাব্যটির এমন দুর্দশা ঘটিত বলিয়া মনে হয় না। এই স্থলে আজরাঈল ফিরিশ্‌তা কিভাবে হজরতের প্রাণ হরণ করিলেন এবং হজরৎ কিভাবে তাঁহার উম্মৎদের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, সেই চিত্রটি যতখানি করুণ ও ভাবগম্ভীর হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। তথাপি, বিষয়-মাহাত্ম্যে পুস্তকটি অজস্র প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার বহু প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে।

(ঙ) জয়কুম রাজার লড়াই :— ইহা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য; পত্র সংখ্যা মোট আঠার। ইহাতে 'জয়কুম' নামক কোন কাফির-রাজের সহিত হজরৎ মুহম্মদ মুস্তফা ও হজরৎ আলীর যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। আমার ধারণা ইহা কোন পৃথক পুস্তক নহে। ইহা সয়্যিদ সুলতানের 'রসূল-বিজয়' নামক বিরাট কাব্যখানির একটা অংশ মাত্র, এই অংশটুকু পৃথকভাবে লিখিয়া প্রচারিত হওয়ার ফলে, একটি পৃথক পুস্তকরূপে দাঁড়াইয়া

যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। পুস্তকটির বিষয়-বস্তু, আদি ও অন্ত ভাগ ইহার স্বাধীন সত্তার পরিপন্থী।

(চ) ইব্‌লীস-নামা :— ইহার অপর নাম 'নূর ফরামূশ-নামা' ইহাও একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। ইহার পদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশত এবং আদ্যন্ত পয়ার ছন্দে রচিত। কাব্যখানি 'নবী-বংশের' পরেই রচিত হইয়াছিল। কবি তাঁহার 'শব-ই-মিরাজ' কাব্যে বাংলা-ভাষায় ধর্ম কথার প্রচারের যে দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহার একস্থলে বলিয়াছেন :

"পয়গাম্বর সবের মহিমা প্রচারিলুং।
পাপমতি ইব্লিছের অযশ ঘোষিলুং॥"

এই কাব্য-প্রচারে শয়তানের অপকীর্তি ঘোষণা কবির প্রধান লক্ষ্য হইলেও ইহার মধ্য দিয়া দুইটি উপদেশ-বিতরণও তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল; ইহার একটি হইল,—গুরু যতই খারাপ কাজ করুক, শিষ্যের শ্রদ্ধার পাত্র। আর একটি হইল,—অহঙ্কারই পতনের মূল। শয়তান শুধু ফিরিশ্‌তা ছিলেন না, জ্ঞানে-ধ্যানে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে সমস্ত ফিরিশ্‌তার গুরু ছিলেন। অহঙ্কার-বশে আদম (আ:) কে আল্লাহর আদেশ সত্ত্বেও সজিদা না করায় শয়তানের পতন ঘটে। তাহার পরও আল্লাহ্ তায়ালা অন্য ফিরিশ্‌তাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার যেন ইবলীসের সহিত সম্ভ্রমভরে আলাপ করেন। তাই কাব্যের উপসংহারে কবি লিখিয়াছেন :

"শিষ্যের প্রকৃতি যদি হয় ফিরিস্তার।
ইব্লিছ যদি সে হয় গুরুর ব্যাভার॥
তথাপিহ গুরুক নিন্দিতে ন জুয়ায়।
গুরুক মান্যতা করিবে সর্বথায়॥
"নিরঞ্জন আদেশ করিল ফিরিস্তারে।
মান্য করি বোলাইতে ইব্লিছ গুরুরে॥
এত জানি আপনা গুরুক ন নিন্দিব।
কদাচিত অহঙ্কার বোল ন বুলিব॥"

(ছ) জ্ঞান-চৌতিশা :— ইহা একখানি ক্ষুদ্র 'যোগ-কালন্দর' শ্রেণীর গ্রন্থ, ইহার চরণ-সংখ্যা প্রায় দেড় শত। ইহা কবির অতি অল্প বয়সের রচনা। তখন কবির বুদ্ধি যেমন অপরিণত, মতিগতিও শিশুর তুল্য। এই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন :

"হীন অতি শিশুমতি ছৈয়দ ছোলতান।
ক্ষীণ বুদ্ধি রচিলেন চৌতিশা যে জ্ঞান॥"

(জ) জ্ঞান-প্রদীপ :— ইহাও একখানি 'যোগ-কালন্দর' শ্রেণীর গ্রন্থ। তবে ইহা কবির পরিণত বয়সের রচনা। কবি এখন তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ এবং শাহ্ হুসৈন নামক এক গুরুর শিষ্য। বোধ হয়, অল্প বয়সে লিখিত 'জ্ঞান-চৌতিশা'র দোষত্রুটি ও অজ্ঞতার বিষয় অবগত হইয়া কবি সাধক সয়্যিদ সুলতান পরিণত বয়সে এই তত্ত্বজ্ঞান-পূর্ণ কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে সুফী-সাধক-তত্ত্বের সহিত সন্ন্যাসীর যোগ-সাধন-তত্ত্ব মিশিয়া গিয়াছে। এই তত্ত্বজ্ঞান তিনি কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন? কবি এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন,—

"শাহা হোছন গরু সমুদ্রের তুল।
একে একে পাইলুম জ্ঞান সে অমূল॥"

কবির মতে, যাতা তত্ত্বজ্ঞান তাহাই 'মারিফৎ'। জগতে 'আহ্‌ল্‌-ই-মারিফতের' বা তত্ত্বজ্ঞানীর সংখ্যা যখন কম, তখন এই ব্যাপারে অধিকারী-ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। 'ইলমু-ল্‌-মারিফহ্‌' বা তত্ত্বজ্ঞান-বিদ্যা সকলেই অল্পবিস্তর শুনিয়া বা পড়িয়া জানিতে পারে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য গুরুর নিকট হইতে দীর্ঘ শিক্ষা গ্রহণের আবশ্যক। গুরু-নিষেধাৎ অথবা অন্য কারণবশত: কবি সয়্যিদ সুলতান যেখানেই লেখায় কোন গূঢ়-বিষয় ভাল করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, সেখানেই তিনি পাঠককে 'প্রেমানন্দের' শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন।

'জ্ঞান-প্রদীপের' বক্তব্য-বিষয় সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইলে হাদীসের "মন আরফা নফসহু, ফকদ আরফা রব্বহু" উক্তিটির উল্লেখ করিতে হয়। ইহার অর্থ—"যে তাহার নিজেকে বুঝিয়াছে, সে তাহার প্রভুকে জানিয়াছে।" তাই কবি কাব্যখানি তনের বিচার লইয়া শুরু করিয়াছেন :

আউয়ালে আল্লার নাম কবিয়া যে সার।
ছৈয়দ ছোলতানে কহে তনের বিচার॥
আঠার হাজার আলম যাহার সৃজন।
বিনি অপরাধী সেই প্রভু নিরঞ্জন॥
বিনি চক্ষু দেখে সে যে বিনি কানে শুনে।
সকলের আহার যোগায় নিরঞ্জনে॥

এই 'তনের বিচারে' দরবেশদের লাহুত, নাসূত, জবরুত, মলকূত, প্রভৃতি মকাম, জিকর, রাবিতা, মরাকিবা প্রভৃতির বিষয় বর্ণনা করিয়া—

"ভক্তি করি বন্দি শাহা হোছন চরণ।
ছৈয়দ ছোলতানে কহে যোগের বাখান॥"

এই 'যোগের বাখান' কিরূপ, তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাইবে :–

"মেরুদণ্ড ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই নাড়ি।
যেন বৃক্ষ দুই পাশে লতা আছে বেড়ি॥
দক্ষিণে ইঙ্গলা নাড়ি যেন দিবাকর।
বাম পাশে পিঙ্গলা নাড়ি যেন সুধাকর॥
ইঙ্গলা বহয় গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা।
মেরুদণ্ড মধ্যে বহে নাম যে সুষুমা॥
তিন নাড়ি এক হই আছে ভুরু বাট।
জ্ঞানী সবে বলে তাই ত্রিবেণীর ঘাট॥"
—(জ্ঞান-প্রদীপ)

(ঝ) **মারফতী গান** :– মধ্যযুগের অধিকাংশ খ্যাতনামা দরবেশ কবি ছিলেন। তাঁহাদের গজলগুলি 'দিবান' বা 'কুল্লীয়াৎ' প্রভৃতিতে সংগৃহীত হইয়া এখনও পাক-

ভারতে বিদ্যমান। দরবেশ কবি সয়্যিদ সুলতানও অসংখ্য 'মারফতী গান' রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই গানের 'কুল্লীয়াৎ' জাতীয় কোন সংগ্রহ-গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই বটে, তবে নানা 'রাগমালা'-গ্রন্থে কবির কিছু সংখ্যক গান উদ্ধৃত হইয়া রক্ষিত আছে। তাহা হইতে একটি গান নিম্নে তুলিয়া দিলাম :

রাগ-ধানসি কেদার

রে মন! কব না কহিমু, কত নিবেদিমু,
কত চেতাইমু তোকে।
দিনের ভিতরে, নাম নিরঞ্জন,
বারেক না লইলু মুখে ॥ধ্রু॥

পুত্র পরিজন সব অকারণ
ভুলি রৈলু মায়া-মোহে।
যেন আঁখি ঠার, লোভ আদি সার,
ঘোরময় বাজী শোহে॥

সম্পদ্‌ সহায়, সুখ ব্যবসায়,
প্রভুপদ না সেবিলে।
গতি গুরু ভার যেহেন কাণ্ডার॥
পঙ্কময় আটকিলে।
কহে ছোলতান, জীবন স্বপন,
মরণ জানিঅ সার।
সে পন্থ ছাড়িয়া, অসারে মজিয়া
ভুলি রৈলু অনিবার॥

(ঞ) **পদাবলী** :– কবি সয়্যিদ সুলতান শুধু মারফতী গান রচনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সেই সময়ের সাহিত্যিক রেওয়াজের অনুসরণে বহু 'পদাবলী' রচনা করিয়াছিলেন এই পদগুলির কিছু কিছু 'রাগমালা' বা গান-সংগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে।

কবি সয়্যিদ সুলতান চট্টগ্রামের 'পটিয়া' থানার অন্তর্গত চক্রশালার বাসিন্দা ছিলেন। ১৫৫০ হইতে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন; চট্টগ্রামের পরাগলপুরে তাঁহার স্থায়ী আস্তানা ছিল। তাঁহার পীরের নাম শাহ হুসৈন এবং শিষ্যদের মধ্যে কবি মুহম্মদ খাঁ-ই অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে আরও এক জনের নাম পাওয়া যায়; তিনিও একজন পদকর্তা ছিলেন, তাঁহার নাম 'ফতে খান'। (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি'—দ্রষ্টব্য)। সয়্যিদ সুলতান যে শুধু একজন কবি ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন সাধকও ছিলেন। কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিভা বিভিন্নমুখী ছিল, তিনি একাধারে কবি, ঐতিহাসিক, তত্ত্বজ্ঞানী ও গান-রচক ছিলেন। যুগধর্ম অনুসারে তাঁহার মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিলেও, বাংলা-ভাষায় ইসলাম ধর্মের ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা প্রচার করাই তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে—

"কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন।
ন বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন॥
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা।

প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা॥"
—(শব-ই-মিরাজ)

বাঙালী মুসলমান শুধু 'প্রস্তাব' অর্থাৎ প্রেমোপাখ্যান ও গাল-গল্প লইয়া ভুলিয়া আছে, ধর্মের কথা কিছুই জানে না। তাহাদিগকে এই ধর্মের কথা জানাইতে গিয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন যে,

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষ তাহার অমূল্য রতন॥
—(শব-ই-মিরাজ)

সুতরাং বাংলা-ভাষায় ধর্মের কথা প্রচার করিতে হইবে। তিনি তাহাই করিলেন, 'নবী বংশ', 'শব-ই-মিরাজ', 'ইবলীস নামা', 'রসূল-বিজয়' প্রভৃতি লিখিত হইল। কিন্তু, ইহাতে ফল হইল কি? গোঁড়া সম্প্রদায়ের লোকেরা কবিকে 'মুনাফিক' বলিয়া আখ্যা দিলেন। কবির আপন সাক্ষ্য হইতেই এই কথা জানিতে পারা যায় :

"যে সবে আপনা বোল ন পারে বুঝিতে।
পঞ্চালী রচিলুং করি আছএ দোষিতে॥
মোনাফেক বলে মোরে কিতাবেত পড়ি।
কিতাবের কথা দিলুম হিদুয়ানী করি।"
—(শব-ই-মিরাজ)

কবি ইহাতে দমেন নাই।

"মোহোর মনের ভাব জানে করতারে।
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে।"

এই বলিয়া তিনি আপন কর্তব্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাংলা-ভাষায় ইসলাম ধর্মের কথা লিপিবদ্ধ করা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশেষ দূষণীয় ও পাপকাজ বলিয়া গোঁড়া মুসলমানগণ মনে করিতেন। কবিকে এই গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

শেখ পরান
(আনুমানিক ১৫৫০–১৬১৫)

এই কবির সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। এযাবৎ তাঁহার দুইখানা পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, একটির নাম 'নূরনামা' এবং অপরটির নাম 'নসীহৎনামা'। পুস্তক দুইটির কোনটিতে রচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। তথাপি তাঁহার সময়-নির্ণয়ে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। ইনি অপর এক কবি শেখ মুত্তলিবের পিতা ছিলেন। এই কবি শেখ মুত্তলিবের 'কিফায়িতু-ল্-মুসল্লীন' নামক গ্রন্থে রচনার তারিখ এইরূপ :

'সপ্তম হৈল পুনি এবাদত নাম।
যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম॥'

আরবী 'আব্‌জাদ' রীতি অনুসারে পুস্তক সমাপ্তির তারিখ এইরূপ :

ইবাদৎ	( )	–৪৭৭
নাম	( )	–৯১
তমাম	( )	–৪৮১
মোট–		১০৪৯ হিজরী অর্থাৎ ১৬৩৯ খ্রী: ।

শেখ মুত্তলিব অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তাই তিনি সাংসারিক দুর্ঘটনার জন্য বেশী লেখাপড়া করিতে পারেন নাই বলিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তাঁহার 'কিফায়িতু-ল্-মুসল্লীন' মৌলবী রহমতুল্লাহ্ নামক এক আলিমের কাছে শুনিয়া লিখিত। এই মৌলবী সাহেবই "অন্নবস্ত্র দিয়া বহু যতন করিয়া" তাঁহাকে পালন ও শিক্ষাদান করেন। তাহা হইলে, ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কবির বয়স যদি ৩৯ বৎসরও হয়, তিনি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির অল্প বয়সে অর্থাৎ ১৪ কি ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা মারা গিয়াছিলেন। তাহা হইলে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরের দিকে কবি শেখ পরান জীবিত ছিলেন না, অন্ততঃ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে কবির শেখ পরান যে জীবিত ছিলেন না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কবি শেখ পরান পূর্বে-আলোচিত কবি সয়্যিদ সুলতানের সম-সাময়িক ছিলেন। তিনি 'নূরনামা' গ্রন্থে কবি সয়্যিদ সুলতানের নাম ও 'নবী-বংশে'-র উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখটি এইরূপ :

"ফাতেমাকে বিভা কৈল আলী মতিমান।
নবী-বংশে রচিছেন্ত ছৈয়দ ছোলতান॥"

অতএব, তিনি আর সে-কাহিনীর দীর্ঘ বর্ণনা করিলেন না। শেখ পরান যে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তাহাও তাঁহার পুত্র শেখ মুত্তলিবের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারা যায়,—

"সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরান সুজন।
তাহার নন্দন-হীন মোত্তালিব ভান।"
—কিফায়িতু-ল-মুসল্লীন)

কবির 'নূরনামা' গ্রন্থে 'রোজ-ই-আজল' অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় 'নূর-ই-মুহম্মদী'র সৃষ্টি এবং তাহা হইতে অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টির কথা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থটি ধর্মীয় বিষয়-সমন্বিত বলিয়া কবিত্বহীন।

'নসীহৎনামা' গ্রন্থটি মৌলিক রচনা নহে। ইহা ঐ নামীয় কোন ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ অথবা ফারসী ভাষায় লিখিত ধর্মীয় কথার সার-সংগ্রহ। এই বিষয়ে কবি বলেন :

"ফারছি ভাষে সেই কথা আছিল লিখন।
বাংলা ভাষায় কৈলুং বুঝিতে কারণ॥"

এই পুস্তকের বিষয়-বস্তুর কয়েকটির নাম করিতেছি, যথা—অজু ও নামাজের ফরজ, চারি কুর্সী ও মজহাবের নাম, গোসলের ফরজ, সপ্ত ইমানের কথা, অজুদের নাম, রগের নাম, শরীরের লোমের সংখ্যা প্রভৃতি। পরিশেষে কবি নিবেদন করিয়াছেন :

"কিতাবেতে যেন মত আছয়ে লিখন।
তেনমতে পদবন্ধে করিলুং রচন॥
তবে পণ্ডিতেরা সবে কৃপা কর মন।
মোর প্রতি দোষ পাই খেমিবা তখন॥"

হাজী মুহম্মদ

(আনুমানিক ১৫৫০–১৬২০)

১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসের 'মাহে-নও' পত্রিকায় মরহুম আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব কবির 'নূর-জামাল' নামক একখানা কাব্যের পরিচয় প্রকাশ করেন। সেইদিন পর্যন্ত এই কবির খবর কেহ জানিত না। মরহুম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব কবির সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদ দিতে সমর্থ হন নাই।

হাজী মুহম্মদ আমাদের একজন প্রাচীন কবি। তিনি কবি শেখ পরান (১৫৬০–১৬২৫) ও সৈয়্যিদ সুলতানের (১৫৫০–১৬৪৮) সমসাময়িক তো বটেই, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী লোকও হইতে পারেন। কবি শেখ পরান 'নসীহৎনামা'য় লিখিয়াছেন :

"ছুরতনামার মধ্যে ইমানে ছিফত।
রচিছেন্ত হাজী মোহাম্মদ ভাল মত॥
তেকারণে এথা মুঞি ন কৈলুং সমাপ্ত।
কিঞ্চিৎ কহিলুং বুঝিতে ইঙ্গীত॥
সএক পরাণে কহে শুন গুণিগণ।
সভানের পদতলে করম নিবেদন॥"

ইহা হইতে দেখা যাইবে, কবি হাজী মুহম্মদ শেখ পরানের পূববর্তী লোক; অন্ততঃ পূর্ববর্তী না হইলে প্রবীণ সমসাময়িক ব্যক্তি। আমরা তাঁহার আবির্ভাব-কাল ১৫৫০ হইতে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

উক্ত উদ্ধৃতি হইতে আরও দেখা যাইতেছে, কবি হাজী মুহম্মদ 'নূর-জমাল' ব্যতীত আরও একখানা কাব্য লিখিয়াছিলেন, ইহার নাম 'সুরৎনামা'। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই পুস্তকটি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে কবি শেখ পরানের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, 'ঈমানের সিফৎ' বা মুসলিম ধর্ম-বিশ্বাসের মহিমাই ইহাতে পরিকীর্তিত হইয়াছিল।

কবি হাজী মুহম্মদের 'নূর-জামাল' একাধারে শরীয়ৎ ও তরীকৎ বা মারফত সম্বন্ধীয় পুস্তক। ইহার প্রথম ভাগে শরীয়তের নানা তথ্য স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে 'তোওবা'-র মাহাত্ম্য (ফজীলৎ) সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপ :

এবাদত কর হেন জান সে আপন।
বিনি তওবায় ফল নহে কদাচন॥
যে করিলা গুনা-খাতা তওবা কর তারে।
আশা ন করিহ পরে তওবা করিবারে॥
তওবা করিলে গুনা বকশিব আল্লায়।

যদি আর সেই গুনা ন করে বন্দায়॥
অকর্ম যে ন করিহ আপনে জানিতে।
লোক সঙ্গে অনুক্ষণ থাকিহ পীরিতে॥

পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে 'তরীকতের' কথা স্থান পাইয়াছে। লাহুৎ, নাসূৎ, মলকূৎ, জবরূৎ প্রভৃতি মারফতী 'মকাম'গুলি কিভাবে একটির পর একটি করিয়া লাভ (হাসিল) করা যায়, তাহার বর্ণনা ও লক্ষণাদির সহিত নানা দার্শনিক তত্ত্বও এই অংশে স্থান পাইয়াছে। কি করিয়া 'মলকূৎ-মকাম' লাভ হয়, সে বিষয়ে কবি বলিতেছেন :

'নূর-জমালে কহে বাতিনে অনুক্ষণ।
আল্লা পরে আর কিছু না কল্পয়ে মন॥
দুনিয়ার সুখভোগে মন নহে ভোলা।
হামিসা ছাহেব সাথে হবে ওলামেলা॥
হক্কেতে ডুবিয়া মন থাকে অনুক্ষণ
আপনারে আপনে হারায় ততক্ষণ ****
এইরূপ হাল যদি হইল বান্দার
মলকুত হাসিল তবে হইল তাহার॥"

বলা বাহুল্য, 'নূর' দুই প্রকারের হইয়া থাকে,– 'জলাল' এবং 'জমাল'। 'জলালী-নূর' উগ্র বলিয়া সাধারণতঃ পরিত্যাজ্য এবং 'জমালী-নূর' মৃদু-মধুর বলিয়া সর্বথা কাম্য। এই জন্য কবি 'জমালী নূর' হাসিলের কথাই 'নূর-জমাল' কাব্যে বলিয়াছেন। এই স্থলে 'নূর-জমাল' অর্থাৎ 'জমালী-নূর' গোপন বা 'বাতিন' অবস্থায় থাকিয়া 'মলকূৎ-মকাম' লাভের অবস্থা বর্ণনা করিতেছে। এই অবস্থায় 'আল্লা' ছাড়া মন আর কিছু কল্পনা করে না, অথচ ঐহিক সুখ-ভোগের কথাও বিস্মৃত হয় না, সাধক সর্বদা সঙ্গীদের (সাহিব) সহিত মেলামেশা করেন, তাঁহার মন অনুক্ষণ সৎপথে থাকিয়া সত্যের (হক্কেতে) সন্ধানে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত হয়। এইরূপ অবস্থা-প্রাপ্ত হইলেই 'মলকূত-মকাম' হাসিল হইল বুঝিতে হইবে।

'তৌহীদ্-ই-অজুদী' ও 'তৌহীদ-ই-শহুদী'র তত্ত্বও এই পুস্তকে আছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এই তত্ত্ব উত্তর-ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রভাব এই কাব্যে সুস্পষ্ট। কবির মতে 'খোদা' এবং তাঁহার 'বন্দা' অভিন্ন, তথাপি 'বন্দাকে' 'খোদা' বলা যায় না। তাত্ত্বিকভাবে প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়, স্রষ্টা ও তাঁহার সৃষ্টি এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন। ইহা 'দ্বৈত' এবং' অদ্বৈতবাদের' সংমিশ্রণ। এই সঙ্গে কবির বক্তব্যটি তাঁহার ভাষাতেই উদ্ধৃত করা আবশ্যক :

"জাত ও ছিফাত সেই নূর অনুপাম।
নূর মোহাম্মদ তান রাখিলেক নাম॥
আপনার দোস্ত হেন তাহারে বলিলা।
সেই নূর হন্তে আল্লা সকল সৃজিলা॥
এক হন্তে হৈল দুই, দুই হন্তে সকল।
বীজ হন্তে বৃক্ষ যেন, বৃক্ষ হন্তে ফল॥

ফল বৃক্ষ বীজ এই তিন নাম হয়।
এক হয়ে তিন জান, তিনে এক হয়॥
বীজ বৃক্ষ ফল হন্তে কেহ ভিন্ন নয়।
তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন ন যায়॥
তেন মতে জানিহ যে আল্লা আর বন্দা।
আল্লা হন্তে বন্দা সব হইয়াছে পদা॥
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কায়।
তেনরূপে জানি সে বন্দা আর খোদায়॥"

'বন্দা' ও 'খোদা' অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টাযদি অভিন্ন হয়, তবে বন্দার মৃত্যুতে অর্থাৎ সৃষ্টির ধ্বংসে বা বিলয়ে 'খোদার' অর্থাৎ স্রষ্টার মৃত্যু বা বিলয় হয় না কেন, এমন প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। কবি এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন। দরিয়ার পানি যখন পবনে উথলিত হয়, তখন 'ঢেউ' বা তরঙ্গ দেখা দেয়। তরঙ্গকে লোকে দরিয়ার পানি বলে, কিন্তু কখনও কেহ তরঙ্গ ও দরিয়াকে এক বলে না, অথচ উভয় বস্তু একই পানির প্রকাশ! তরঙ্গ সাগরেই উঠে এবং সাগরেই বিলয় হয়। তরঙ্গের বিলয়ে সাগর বিলয় প্রাপ্ত হয় না। এইভাবে সমস্তই আল্লাহ্ হইতে উৎপন্ন হইলেও, সৃষ্টির বিলয়ে স্রষ্টা বিলুপ্ত হয় না। তাই কবির মতে :

"বন্দার আচারে কভু খোদা ন পীড়য়।
বন্দার মরণে কভু খোদা ন মরয়॥
আছিল আছিব সে যে আছে সর্বক্ষণ।
জন্ম মৃত্যু নাহি তান আওন গমন॥"

কবি একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি হজ্জ-ব্রত পালন করেন। তখনকার দিনে 'হজ্জ' করা একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। জীবনের সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়াই, তাঁহাকে ইসলামের পাঁচ ফরজের অন্তর্গত এই ফরজটি আদায় করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজে একজন নিষ্ঠাবান 'পীর'ও ছিলেন। মুহম্মদ শফী নামে তাঁহার এক শিষ্যের সাক্ষ্য হইতে ইহা জানা যাইতেছে।

এই 'নূর-জমাল' গ্রন্থে কবি মুসলমানদিগকে নানা ধর্মীয় উপদেশ দান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কাব্য-রচনার উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে বাংলা অক্ষর ও ভাষার প্রতি তৎকালীন গোঁড়া মুসলমানদের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহারও আভাস সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

নসরুল্লাহ্ খাঁ
(আনুমানিক ১৫৬০-১৬২৫)

আজ পর্যন্ত কবি নসরুল্লাহ্ খাঁ সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। মরহুম আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণেই' কবির অস্তিত্বের মূল সংবাদ সীমাবদ্ধ।

এযাবৎ আমরা কবির চারিখানা গ্রন্থের সংবাদ পাইয়াছি। গ্রন্থ চারিখানির নাম :- (ক) জঙ্গনামা, (খ) মুসার সোয়াল, (গ) শরীয়ৎনামা ও (ঘ) হিদায়িতুল ইসলাম (এইখানি দেখিবার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয় নাই)।

এইগুলির মধ্যে 'জঙ্গনামা' ও 'শরীয়ৎনামা' গ্রন্থে কবির দীর্ঘ আত্ম-বিবরণী বর্তমান। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার কোন গ্রন্থে রচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। তথাপি একরূপ নিশ্চিতভাবেই তাঁহার সময় নির্ণয় করা যায়। 'শরীয়ৎনামা' গ্রন্থে এই আত্মবিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে,-

"ধর্মবন্ত ধৈর্যমন্ত, মর্যাদার নাহি অন্ত,
নাম হামিদুদ্দী খান জান।
গৌড়দেশে বাঙ্গুনাম, দুই সিক অনুপাম,
সৈন্যপাল উজির প্রধান॥
তান পুত্র আগুয়ান অস্ত্রশস্ত্রে অনুপাম,
জগ ঘোষে বোরহানুদ্দী খান।
দৈবগতি দেশ ছাড়ি, অষ্ট মিত্র সঙ্গে করি,
রোসাঙ্গ দেশেত কৈলা গাম॥
তখন রোসাঙ্গ দেশে, কিবা আদ্য কিবা শেষে
অশ্ব আসোয়ার না আছিল।
হয় গজ ব্যূহ সংখ্য, দেখি তানে নৃপমুখ্য,
লস্কর-উজির তানে কৈল॥
ইব্রাহিম তান সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত
অশ্ববার কর্মে বিচক্ষণ।
শ্রীসুজাউদ্দী খান, অস্ত্রেশস্ত্রে অনুপাম
নাম ধরে তাহান নন্দন॥
বাবুখান (সেকরাজা) তানপুত্র প্রভুগত সুপবিত্র
লোকে বলে ফকির মোড়ল।
তান সুত গুণবান, কাজী ইসহাক খান,
ছিল দীন তা হন্তে উজল॥
তাহান ঔরস কর্ম, ছৈয়দানী গর্ভে জন্ম
শরীফ মনসুর খোন্দকার।
নসরুল্লাহ্ সুত তান, হীনবুদ্ধি অল্প জ্ঞান
রচিলেক পঞ্চালি পয়ার॥"

এই বিবরণী হইতে যে তথ্য ও বংশলতিকা সংগ্রহ করা যায়,-তাহা হইতে দেখা যাইবে, রোসাঙ্গ বা আরাকান-রাজ 'নৃপমুখ্যের' রাজত্বকালে কবির ঊর্ধ্বতম সপ্তম পুরুষ বুরহানুদ্দীন খান আরাকানে আসিয়া 'লস্কর উজির' বা সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই 'নৃপমুখ্য', পাঠান্তরে 'নৃপরঙ্ক' কে? আরাকানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইনি বর্মা ইতিহাসের 'নরমিখ্ল' (Narameikhlo) এবং আরাকানী ইতিহাসের মেঙৎ চৌ মৌন (Mengtsanmwun) ব্যতীত আর কেহ নহেন। এই আরাকান-রাজ 'নরমিখ্ল' খ্রীষ্টীয় ১৪০৪ হইতে ১৪৩৪ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সিংহাসনারোহণের পরে, তিনি 'অনন্থিউ' (Ananthiu) নামক কোন ব্রহ্ম-সামন্তরাজের ভগ্নীকে বলপূর্বক অপহরণ করায় ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্ম-রাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়া ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চব্বিশ বৎসর গৌড়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। গৌড় সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ

শাহ্ ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম সৈন্যের সাহায্যে আরাকান-রাজ নরমিখ্লকে স্বীয় সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। এই সময়েই (১৪৩০ খ্রী:) বুরহানুদ্দীন খান আরাকানে গিয়া 'নরমিখ্ল'-এর 'লস্কর উজির' হইয়া থাকিবেন। চারি পুরুষে একশত বৎসর ধরিয়া হিসাব করিলে কবি নসরুল্লাহ খান প্রায় ১৭৫ একশত পঁচাত্তর বৎসরের পরবর্তী লোক। তাহা হইলে তিনি ১৪৩০+১৭৫=১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

কবির 'জঙ্গনামা' নামক গ্রন্থের আত্মবিবরণী অনুসন্ধান করিলেও অনুরূপ তারিখ পাওয়া যায়। এই বিবরণীর আবশ্যক অংশ এইরূপ :

"কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেতে বিজ্ঞান।
পিতামহ কাজী ইসহাক গুণবান॥
তান পুত্র শরীফ মনসুর খোন্দকার।****
রাম্বু দেশ নরপতি নামে ফতে খান।
যারে মান্য করি বসাইল বিদ্যমান॥
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন-বিখ্যাত।
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত॥
গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া।
আনিলেক দিল্লীশ্বর ব্যূহে যেবা গিয়া॥
হেন জনে যাহাকে করিয়া আগুয়ান।
নমাজ করন্ত সঙ্গে যত মুসলমান॥****
তান পুত্র নসরুল্লা আমি হীনজ্ঞান।
পঞ্চালী পয়ারে কহি গুণিগণ স্থান॥

ইহা হইতে দেখা যায়, কবির পিতা মনসুর খান খোন্দকারকে রাম্বু (রামহু>রামু) বর্তমান 'রামু' (চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগে অবস্থিত) অঞ্চলের নরপতি ফৎহ্ খান (কাব্যের ফতে খান) নিকটে বসাইয়া সম্মান দেখাইয়াছিলেন, এবং রোসাঙ্গ বা আরাকানের যেই নরপতি দিল্লীর বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কাছ হইতে সৈন্য সাহায্য আনিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই নরপতিও কবির পিতাকে সসম্মানে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন।

এই ফৎহ্ খানও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইতিহাসে দেখা যায়, তিনি পর্তুগীজদের অধীনে তাহাদের এক নৌবহরের কাপ্তান ছিলেন। ১৬০০ হইতে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বিদ্রোহী হইয়া পর্তুগীজ-আড্ডা সন্দীপ অধিকার করেন। তখন পর্তুগীজ জলদস্যুর সর্দার গঞ্জালিস সন্দীপ ও তৎসন্নিহিত চট্টগ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অধিপতি। ফৎহ্ খান সন্দীপ অধিকার করিয়া সমস্ত পর্তুগীজকে হত্যা করেন। তখন গঞ্জালিস দক্ষিণ শাহবাজপুর (বাখরগঞ্জ জেলায়) দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ফৎহ্ খাঁর সহিত গঞ্জালিসের যে জলযুদ্ধ হয়, তাহাতে ফৎহ্ খান নিহত হইলে পর গঞ্জালিস সন্দীপের ও চট্টগ্রামের সামুদ্রিক অঞ্চলের অধিপতি হন। এই সময়ে আরাকান রাজবংশীয় 'অন্নপুরম' এক গৃহ-বিবাদের ফলে সন্দীপে গঞ্জালিসের শরণাপন্ন হন। এই 'অন্নপুরম'-ই দিল্লী গিয়া থাকিবেন। বহু বাদ-বিবাদের পরে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঞ্জালিস আরাকান-রাজ কর্তৃক গোয়ায় বিতাড়িত হইয়া বাংলার ইতিহাস হইতে চিরতরে মুছিয়া যান।

ইহা হইতে দেখা যাইবে, কবির পিতা ১৬০০ হইতে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। কবিও তখন নিশ্চয় প্রৌঢ়বয়স্ক। সুতরাং, কবি নসরুল্লাহ্ যদি ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৬০ কি ৬৫ বৎসর বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব, আমরা তাঁহার আবির্ভাব কালকে ১৫৬০ হইতে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরিতে পারি।

চট্টগ্রামের রামু অঞ্চলে কবির বাস ছিল। তাঁহার পীরের নাম হামীদুদ্দীন। 'জঙ্গনামা' পুস্তকের স্থানে স্থানে শ্রদ্ধাভরে এই পীরের উল্লেখ দেখা যায়। তখন চট্টগ্রাম শহরে 'কাছিম বাজার' বলিয়া এক বাজার ছিল এবং 'জাহাঁনোমা' নামে এক উচ্চ পর্বত ছিল। এই পর্বত হইতে বহু দেশ দেখা যাইত বলিয়াই নাকি ইহার 'জাহাঁনোমা' বা বিশ্বদর্শী নাম হইয়াছিল। এইবার কবির কাব্যগুলির পরিচয় দেওয়া যাক।

(ক) জঙ্গনামা :— ইহা কবির প্রথম কাব্য বলিয়া মনে হয়। এই অনুমান সাপেক্ষে কবির নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

তান পুত্র শীল ধর্ম, ছেদানী উদরে জন্ম
শরিফ মনছুর গুণবান॥
তান পুত্র অল্প জ্ঞান, হীন নছরোল্লা খান,
পঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি।
শুন সব গুণিগণ, কৌতূহল করি মন
ক্ষম মোর দোষ পাও যদি।

এই স্থলে 'শিশু বুদ্ধি' কথার ব্যবহারে মনে হয়, কবি তখনও অল্প বয়স্ক। অবশ্য বিনয়বশে এমন কথার ব্যবহারও অসম্ভব নয়। তবে, এই কাব্যে কবির ভাষা ও অন্ত্যানুপ্রাস অন্য গ্রন্থ হইতে বেশ শিথিল। তাহাতেও মনে হয়, কবি রচনায় তখনও পরিপক্বতা অর্জন করেন নাই।

কাব্যের বিষয়-বস্তু মামুলী। হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (দ:)-র সহযোগে বীরকেশরী হজরত আলী (রা:)-র কাফির রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ-বর্ণনাই কাব্যের মুখ্য বিষয়। এই দিক হইতে পুস্তকটি 'রসূল-বিজয়' জাতীয় গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, সকল যুদ্ধেই মুসলমানদের জয়লাভ ও কাফিরদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়।

কাব্যটিতে বহু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে এবং কবির ছন্দ সর্বত্র নিখুঁত না হইলেও, ছন্দঃ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান মন্দ ছিল না। নিম্নে প্রাচীন 'তরল পয়ার', অর্থাৎ প্রতি চারি অক্ষরের পরে অন্ত্যানুপ্রাস দিয়া যে পয়ার রচিত হয়, তাহার একটা নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি :

"মহীপাল এই বোল শুনি সৈন্যগণ।
সাজ রণ সর্বজন হৈল ততক্ষণ॥
যত বাদ্য নৃপ বিদ্যা মনে আনাইলা।
এক বারে বাদ্য পরে প্রহার করাইলা॥
দগরেত কাঠিঘাত হইলেক যবে।
কম্পমান ত্রিভুবন হই গেল ভবে॥

অশ্ববার পদাতির হৈল সিংহধ্বনি।
বীরগণ আস্ফালন বিদরে মেদিনী॥"

(খ) **মুসার সোয়াল** :– ইহা একটি ক্ষুদ্র কাব্য। নামটিই কাব্যখানির বিষয়-বস্তুর পরিচায়ক। কথিত আছে হজরত মূসা (আ:) 'তূর' নামক পর্বতে গমন করিয়া আল্লাহ্‌তা'য়ালার সহিত কথা কহিতেন। যখন যাহা আবশ্যক হইত, হজরত মুসা (আ:) তখন তাহা আল্লার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতেন। এইরূপ ভাবে হজরত মূসার (আ:) সহিত আল্লাহ্‌তা'য়ালার যে আলাপ হইয়াছিল, সেই আলাপ প্রশ্নোত্তর-রূপে এই কাব্যে বর্ণিত আছে।

প্রকৃতপক্ষে, ইহা একটি নমাজ-মাহাত্ম্যের পুস্তক। কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে, পয়গম্বরদের মধ্যে একমাত্র হজরত মূসার (আঃ) সহিতই আল্লাহ্‌তায়ালার আলাপ হইত, তৎপূর্ববর্তী বা পরবর্তী অন্য কোন পয়গম্বর বা মানুষের সহিতই আল্লাহ্‌তায়ালার আলাপ হইত, তৎপূর্ববর্তী বা পরবর্তী অন্য কোন পয়গম্বর বা মানুষের সহিতই আল্লাহ্‌তায়ালার আলাপ হয় নাই। তবে 'তূর' পর্বতে নহে, মিরাজে আরশে উঠিয়া হজরত মুহম্মদের (দ:) সহিত আল্লাহ্‌তা'য়ালার সাক্ষাৎকার ঘটে ও আলাপ হয়। আর হজরত মুহম্মদের (দ:) উম্মতেরা 'তূর' পর্বতে না গিয়াও দৈনিক পাঁচ বার নমাজে মিরাজ লাভ করিতে পারেন এবং তাহাতে (নমাজে) কোরআন তিলাওৎ করিয়া আল্লাহ্‌তা'য়লার সহিত আলাপ করিতে পারেন। কাব্যের উপসংহার ভাগে প্রদত্ত কবির কথাতেই এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা দেখিতে পাওয়া যায় :

"বাক্য আলাপিতে যদি চাহ প্রভু সঙ্গে।
হৃদ মন কোরানে দেহ মনোরঙ্গে॥
পঞ্চগানা নমাজ পড়হ এক মন।
সভা করি বস নিত্য নমাজীর সন॥
শাস্ত্র বুঝিবারে বহু নমাজীর গুণে।
একে একে কহিলাম শুন গুণিগণে॥"

কবি বলিয়াছেন কাব্যখানি ঐ নামের কোনো ফারসী পুস্তকের অনুবাদ। আমরা এই নামের ফারসী পুস্তকের সন্ধান আজও লাভ করি নাই।

(গ) **শরীয়ৎনামা** :– বিষয়-বস্তু ও ভাষা ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয়, ইহা কবির প্রবীণ বয়সের রচনা। এই সময়ে কবি পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ধার্মিকতার জন্য দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকিবেন। ধর্মের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া না থাকিলে, তিনি কখনও এমনভাবে পুস্তক আরম্ভ করিতে পারিতেন না :

বিচমিল্লাহির রহমানের রহিম
শরীয়ৎনামা বাণী কর অবধান।
অবশ্য মানিব যেই হয় মুছলমান॥
মুছলমান মুছলমানী কর্ম ন করিলে।
মুছলমান নহে হেন শাস্ত্র মাঝে বলে॥
'আমর' আর 'নিহী' যত আছে শরীয়তে।
সার সব কহি আমি শুন রঙ্গ চিতে॥

আল্লার হুকুমে যত 'আমর' বোলয়।
মানায়েরে 'নিহী' বলে আরবী ভাষায়॥
যতেক হুকুম কৈল প্রভু নিরাকার।
একে একে মানি লৈল রসুল আল্লার॥

ইহা হইতেই কাব্যের বিষয়-বস্তু সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইসলাম ধর্মের বিধানাদি যাহা পালনীয় এবং যাহা বর্জনীয় তাহার বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা লইয়াই কাব্যখানি রচিত। বলা বাহুল্য 'আমর' অংশে পালনীয় বিষয়ের এবং 'নিহী' অংশে বর্জনীয় বিষয়ের এই পুস্তক কথাই লিখিত হইয়াছে।

কতিপয় পদকর্তা

(আনুমানিক ১৫৬০–১৬৩০)

পদাবলী-সাহিত্যে 'ব্রজবুলি'র ব্যবহার একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। 'ব্রজবুলি' ব্রজধাম অর্থাৎ মথুরা বৃন্দাবনের বুলি বা ভাষা নহে। মথুরা-অঞ্চলের ভাষার নাম 'ব্রিজভাখা'। 'ব্রজবুলি' অন্য কোন বিশিষ্ট স্থানের ভাষা বা বুলিও নহে। ইহা একটি কৃত্রিম কাব্যিক ভাষা। মিথিলার হিন্দী-ঘেঁষা ভাষার সহিত, বিশেষতঃ মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির গানের ভাষার সহিত বাংলা-ভাষার সংমিশ্রণে বাংলার পদকর্তারা 'পদাবলী' সাহিত্যে যে কৃত্রিম ভাষার ব্যবহার করেন, তাহাই বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত। ইহা বাঙালী পদকর্তাদের নূতন সৃষ্টি ও বাঙালী মনীষার পরিচায়ক, যেমন উর্দুর সৃষ্টি উত্তর-ভারতীয় মুসলিম মনীষার পরিচায়ক। উর্দু উত্তর-ভারতীয় মুসলমানদের মৌখিক ও লৈখিক ভাষা, 'ব্রজবুলি' কিন্তু একমাত্র লৈখিক কাব্যিক ভাষা। এই কৃত্রিম 'বুলির' সহিত কতকটা অবিচ্ছেদ্যভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী বিজড়িত থাকায়, ব্রজধামের অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ লীলার একমাত্র ক্ষেত্র-জ্ঞাপক 'ব্রজ' শব্দ 'বুলি' শব্দের পূর্বে যুক্ত হইয়া, ইহা 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত হইয়া পড়ে। সুতরাং, পদাবলীতে 'ব্রজবুলি'র ব্যবহার একটা ভাষাগত সাহিত্যিক রেওয়াজ মাত্র, ইহা কোন বিশিষ্ট ধর্মমত, বিশ্বাস বা সম্প্রদায়গত ব্যাপার নহে। তাই, মুসলমান কবিরাও গানে এই ভাষার ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। কবি দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' কাব্যের (রচনা ১৬২২–১৬৩৮ খৃ) বারমাসীতে ব্যবহৃত 'ব্রজবুলিই' ইহার একটা প্রধান উদাহরণ। ইঁহার ভাষায় 'বুলি'ও আছে, 'প্রেম'ও আছে নাই কেবল 'রাধা' আর 'কৃষ্ণ', তথাপি ইহা 'ব্রজবুলি'।

বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদ হইতে 'ব্রজবুলি'তে পদাবলী রচনার প্রথা প্রবর্তিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত এই রেওয়াজ বাংলায় গান-রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে। গোবিন্দ দাস (১৫৩৫?–১৬১৩) জ্ঞানদাস (১৬৩০–১৬১৫?), বলরাম দাস (১৫৩০–১৬১০?), রায় শেখর (কবি গোবিন্দ দাসের কনিষ্ঠ সমসাময়িক), কবি বল্লভ (১৫৯৮) প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতনামা বৈষ্ণব পদকর্তারা এই সময়েই 'ব্রজবুলি'-তে অজস্র পদ রচনা করিয়া বাংলাদেশকে 'ব্রজবুলি'র মাধুর্যে ভরপুর করিয়া তোলেন। মোটের উপর, 'পদ'-রচনায় বা গানে, বিশেষতঃ প্রেম-সঙ্গীত রচনায় 'ব্রজবুলি'র ব্যবহার এই সময়ে একটা সাহিত্যিক রেওয়াজে দাঁড়াইয়া যায়।

এই 'সাহিত্যিক রেওয়াজ' অবলম্বনে বাংলার মুসলমানেরাও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচজন (যেমন–শাহ্ আকবর, নসীর মাহ্‌মুদ, কবীর, সালবেগ বা সালেহ্ বেগ এবং সয়্যিদ মরতুজা) মুসলিম কবির 'পদ' বৈষ্ণবদের বিখ্যাত পদ-সংগ্রহ 'গৌরপদতরঙ্গিণী' এবং 'পদকল্পতরু' নামক গ্রন্থে (সঙ্কলনের সময়–অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিক) স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, অন্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে এই সব মুসলমান কবির 'পদ' বহু প্রচলিত ছিল। এই মুসলমান পদকর্তাদিগকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিল বলিয়া মনে করা শুধু যে অজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা নহে, ইহা যুগ-ধর্মের প্রতি অবিচারও বটে। কারণ এই পদকর্তাদের অনেকেই যে গোঁড়া মুসলমান থাকিয়া খাঁটি ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা 'ব্রজবুলি'তে পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রাহকদের চারিজনের নাম ও পদ পাওয়া যাইতেছে। যখন বঙ্গদেশে 'ব্রজবুলি'তে পদ রচনার রেওয়াজ খুব জোরে চলিতেছিল, ইঁহারা নিশ্চয় তখনকার লোক, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমপাদের লোক। তাহা না হইলে তাঁহারা এমন নিখুঁত ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিতে পারিতেন না। ইঁহাদের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নিম্নে পাঠককে এই পদকর্তাদের রচনার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে পরিচিত করিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হইল :

(ক) **শাহ্ আকবর** :– এই যুগের মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে শাহ্ আকবরকে প্রাচীনতম বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। এ পর্যন্ত তাঁহার একটি মাত্র পদই পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা 'গৌরপদতরঙ্গিণী' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৫) উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা বৈষ্ণব-রস-সাহিত্যের 'গৌর-চন্দ্রিকা'-ভুক্তপদ। ইহাতে গৌরাঙ্গদেবের (চৈতন্যের) লীলা বর্ণিত আছে। যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের 'গৌর-চন্দ্রিকা' শাখাভুক্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ পদ রচয়িতারা প্রায়ই ষোড়শ শতাব্দীর কবি। এই দিক হইতে ভাবিতে গেলে শাহ্ আকবরকে ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলিয়াই মনে হয়। কেননা, তাঁহার পদটি এই শ্রেণীর পদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পদ।

শাহ্ আকবর সাধক ছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য-প্রশিষ্য ছিল। ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের নাম পাওয়া যায়, তাঁহার নাম আইনুদ্দীন। তাঁহার অন্ততঃ ১৫ পনেরটি 'পদ' পাওয়া যাইতেছে। ইতোমধ্যে নানা পত্র ও পত্রিকায় এই 'পদগুলি' প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) **নসীর মাহ্‌মুদ** :– ইঁহার একটি মাত্র 'পদ' বৈষ্ণবদের 'পদকল্পতরু' নামক গ্রন্থে (১৩২৯ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও তিনটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত তাঁহার পদটি ভাষার লালিত্য ও বাহাদুরীতে অপরূপ।

(গ) **কবীর** :– ইনি আমাদের পূর্বোক্ত শেখ কবীর কি না বলা যায় না। ইঁহার রচিত মাত্র একটি পদ 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের হোলী-খেলা বর্ণিত হইয়াছে।

(ঘ) **সালবেগ** (সালিহ্ বেগ) :– ইঁহার রচিত তিনটি 'পদ' বিখ্যাত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১৫৪২, ২৪৭২, ২৯৭২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থেও ইঁহার আর একটি পদ (৪৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) সঙ্কলিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Typical Selections from the Oryia Literature. Vol. II নামক গ্রন্থেও সালবেগের কয়েকটি পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার নামটি যে অসম্ভবভাবে বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি একটি পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার ভণিতায় দেখা যায়, "কহে সাহেল বেগ জগত-পামরা"। এই 'সাহেল' অর্থাৎ 'সালিহ্' বেগই কবি 'সালবেগ' বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। এই পদটি 'ব্রজবুলি'তে লিখিত।

সালবেগ বা সালিহ্ বেগ না-কি উড়িষ্যাবাসী। তাহাতে কাহারও আপত্তির কারণ নাই। তখন উড়িষ্যা-দেশ বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল। উড়িয়া ভাষায় লিখিত 'দার্ঢ্যভক্তি' নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, কোন পাঠান সেনাপতি এক হিন্দু বিধবাকে বলপূর্বক বিবাহ করেন; এই পাঠান সেনাপতির ঔরসে ও হিন্দু বিধবার গর্ভে কবি সালবেগের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পরবর্তী জীবনে এক পরম বৈষ্ণবভক্তে পরিণত হইয়া শেষ জীবন ব্রজধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এই কাহিনীর সঠিক প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস করা যায় না। এই কাহিনী কল্পিত বলিয়া মনে হয়।

মুহম্মদ খান

(আনুমানিক ১৫৮০–১৬৫০)

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত কোন অঞ্চলে কবির বাস ছিল। কবির পূর্বপুরুষ (সপ্তম স্থানীয়) রাস্তী খান চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন এবং হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে এই রাস্তী খানের মসজিদে এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিটি এখন আলাওলের মসজিদ-গাত্রে সংলগ্ন করিয়া রক্ষা করা হইয়াছে। আমাদের ধারণা, এই জোবরা গ্রামেই কবি মুহম্মদ খানের জন্ম হইয়াছিল। কবি মুকীম (১৭৭৩ খ্রী:) তাঁহার আত্মবিবরণীতে চট্টগ্রামের প্রাচীন কবিদের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া কবি সয়্যিদ সুলতানের (১৫৫০–১৫৪৮) পরেই কবি মুহম্মদ খানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মুহম্মদ খান কবি সয়্যিদ সুলতানের শিষ্য ছিলেন বলিয়াই মুকীম এই ক্রম রক্ষা করিয়া থাকিবেন। কবির "মক্‌তুল হুসৈন কাব্যের ভূমিকায় তাঁহার সুদীর্ঘ বংশ-বিবরণ ও পরিচয় আছে। তাহা এই স্থলে উদ্ধার করার কোন আবশ্যকতা আপাততঃ নাই, কারণ কবি তাঁহার রচিত দুইটি কাব্যে রচনার তারিখ দিয়াছেন।

এই পর্যন্ত তাঁহার সাতখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রচনার কাল-অনুসারে এই কাব্যগুলির ক্রম এইরূপ :

(ক) সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ।

(খ) হানিফার লড়াই।

(গ) আস্‌হাব-নামা। (ইহা 'মক্‌তুল হুসৈন'-এর অংশবিশেষ, কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে।)

(ঘ) মক্‌তুল হুসৈন।

(ঙ) কিয়ামৎ-নামা। ('মক্‌তুল হুসৈন'-এর একাদশ পর্ব।)

(চ) দজ্জাল-নামা। (ইহা 'কিয়ামত-নামার' অংশ, পৃথক পুস্তকরূপে প্রচারিত।)

(ছ) কাসিমের লড়াই। (ইহা 'মকতুল হুসৈন' গ্রন্থের অংশ, পৃথক পুস্তকরূপে প্রচারিত।)

'সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ' ও 'হানিফার লড়াই' এই দুইটি কাব্যের যে পাণ্ডুলিপি আমরা দেখিয়াছি, তাহার কোনটিতে কবি পীরের কথা বলেন নাই। অন্ততঃ কোন ভণিতার সহিত পীরের নাম আমাদের নজরে পড়ে নাই। এই জন্য আমরা মনে করি, কবি পীরের নিকট মুরীদ হইবার পূর্বে এই দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইটি কাব্যের ভাষা কবির অন্য গ্রন্থের ভাষা হইতে যথেষ্ট কাঁচা। তাঁহার অপর কাব্য তিনখানি তাঁহার পীর সয়্যিদ সুলতানের আদেশে রচিত। মনে হয়, কবি সয়্যিদ সুলতান তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে মুহম্মদ খানকে কবিত্বশক্তির অধিকারী দেখিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এই শেষ কাব্য তিনখানির ক্রম কবি মুহম্মদ খানই বলিয়া দিয়াছেন; যথা:

"নবী-বংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান।
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান॥
রছুলের ওফাতে রচিয়া ন রচিলা।
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা॥
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলি।
চারি আছহ্বার কথা কৈলু পদাবলী॥
দুই ভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া।
প্রলয়ের কথা সব দিলু প্রচারিয়া॥
অন্তে পুনি বিরচিলু প্রভু দরশন।
ইহা হন্তে ধিক কথা নাহি কদাচন॥
দুই পঞ্চালিকা যদি একত্র করয়।
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধি তবে হয়॥"
—(কিয়ামৎ-নামা)

এখানে শুধু দুইটি পুস্তকের কথাই বলা হইয়াছে। তাহার একটি কবি সয়্যিদ সুলতানের 'ওফাৎই-রসুল' এবং অপরটি কবির 'মকতুল-হুসৈন'। আদ্যের 'ওফাৎ-ই-রসুল' এবং অন্তের 'মকতুল হুসৈন' এই দুই পঞ্চালিকা বা গ্রন্থ একত্র করিলে পূর্বাপর সম্বন্ধ রক্ষা হইবে বলিয়া কবি বলিয়াছেন।

একটু পরেই দেখা যাইবে যে, 'চারি আসহাবের কথা', 'দুই ভাই (অর্থাৎ হাসন হুসৈনের) বিবরণ' এবং 'প্রলয়ের কথা' (অর্থাৎ কিয়ামতের কথা) কবি মুহম্মদ খান তাঁহার 'মকতুল হুসৈন' গ্রন্থের যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং একাদশ পর্বে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এইগুলি এক 'মকতুল হুসৈন' গ্রন্থের বিভিন্ন পর্ব। বলা বাহুল্য, একাদশ পর্ব বা কিয়ামতের কথা 'মকতুল হুসৈন' গ্রন্থের শেষ পর্ব হইলেও কবি এই গ্রন্থের সহিত এই পর্বটিকে এক করিয়াছেন। ইহা কাব্যটির উপসংহাররূপে পৃথকভাবে লিখিত হইয়া 'কিয়ামৎ-নামা' রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। তাই দেখিতে পাই, 'মকতুল হুসৈন' গ্রন্থের দশম পর্ব পর্যন্ত সূচী দিয়া কবি বলিতেছেন,—

"একাদশ অন্ত পর্ব পশ্চাতে কহিব।
প্রলয় হইতে যত অনর্থ ফলিব॥"

অতএব, 'কিয়ামৎ-নামা' পৃথকভাবে পরে একটি গ্রন্থে 'মকতুল হুসৈন' গ্রন্থের উপসংহাররূপে রচিত।

এইবার তাঁহার কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

(ক) সত্য-কলি বিবাদ-সংবাদ :— এই কাব্যখানি কবির প্রথম রচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ উপরে উল্লেখ করিয়াছি। কাব্যখানির রচনার তারিখ আছে, ইহা এইরূপ :

"সত্যগুরু শেষ হৈল অস্তে গেল সুর।
উজ্জ্বল করিল চন্দ্র নক্ষত্রের পুর॥
দশ শত বাণ শত বাণ দশ 'দধি।
রাত্রি হইয়া গেল সংসার অবধি॥
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম।
গুরুজন চরণেতে সহস্র প্রণাম॥"

ইহা হইতে এই তারিখ পাওয়া যায় :

দশ শত = ১০০০
বাণ শত = ৫০০
বাণ দশ = ৫০
উদধি (দধি) = ৭

মোট = ১৫৫৭ (এই সন 'শকাব্দ' ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।)
৭৮

মোট =১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ইহা একটি প্রকাণ্ড কাব্য। ইহার রচনা কাল ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। পুস্তকের গোড়ায় পুস্তকের নাম সম্বন্ধে কবি বলেন,—

"জনক জননী দোহে প্রণাম করিয়া।
গুরুজন পদ শিরে আনন্দে ধরিয়া॥
উপদেশ পঞ্চালিকা করিলু রচন।
সত্য-কলি-বিবাদ-সম্বাদ বিবরণ॥"

অতঃপর কবি গ্রন্থের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে কবিতায় যে সূচী লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :

প্রথম অধ্যায় :— সত্য ও সত্যবতী দুইজন সহ কলির সহিত দুঃশীলার (দোর্শিলা) কেলি বর্ণনা, সত্যের সহিত যুদ্ধ করিতে কলির আগমন, যুদ্ধ বন্ধ করিতে দূত মিত্র কণ্ঠোর গমন, পুরোহিতও আসিল, তবু সন্ধি হইল না, সমস্ত ব্যাপারের মূলে নারদের হাত থাকায় তুমুল যুদ্ধ বাধিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় :— সত্য কলির যুদ্ধ বর্ণনা, ছলে বলে কলির যুদ্ধ জয়, যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যের মূর্ছা ও তাহাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন।

তৃতীয় অধ্যায় :– সত্যের সংজ্ঞাহীন অবস্থা, সত্যবতী নারীর বিলাপ, সুবুদ্ধি কর্তৃক যোগী ধন্বন্তরীর আনয়ন, জ্ঞানবটিকা প্রয়োগে সত্যের চেতনা প্রাপ্তি, যোগ-সত্যবতী সংবাদ।

চতুর্থ অধ্যায় :– সত্যের জয় বর্ণনা, পাপাশয় কলির মূর্ছা, মৃতবৎ কলিকে লইয়া দুঃশীলার বিলাপ, যোগী ধন্বন্তরীর সাহায্যে কলির জ্ঞান লাভ, যোগী-দুঃশীলা সংবাদ।

পঞ্চম অধ্যায় :– যুদ্ধের পর বিবাদ-বিসংবাদের আরম্ভ ও ত্রেতাযুগ ধরিয়া তাহার প্রাবল্য এবং পরিশেষে–

"তৃতীয় দ্বাপরে যেন নিবারিল রণ,
লাজ পাই ঘরে গেল কলীন্দ্র দুর্জন॥"

এই গল্পের সূত্র পুঁথির গোড়ায় তৃতীয় পত্রে এইরূপ দেওয়া আছে :

নারদ ছিলেন কলীন্দ্র রাজার গুরু, তিনি ঘটকালি করিয়া কলীন্দ্র রাজের সহিত জাতিধর্ম রাজকন্যা দুঃশীলার (দাশিলা) বিবাহ করাইয়া দেন। রাজা কলীন্দ্র দুঃশীলার সহিত কেলিকলায় প্রমত্ত। তাহার পর হইতে উক্ত ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। কবি এই বলিয়া তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছেন :

"সংসারেত পণ্ডিতের রহুক বাখান।
সভাত বর্বর মূর্খ পাউক অপমান॥
শত বজ্র পাত হৌক নারদের শিরে।
মিত্রকণ্ঠ মিত্রতা বাড়ুক অনিবারে॥
সত্য জয় লভুক কলি পাউক নাশ।
যবে চন্দ্র সূর্য্য রহে এই উপদেশ॥
মোহাম্মদ খানে কহে প্রভু নিরঞ্জন।
অনাথের নাথ পাপ করহ মোচন॥"

মালিক মুহম্মদ জয়সীর হিন্দী 'পদুমাবত' এবং আলাওলের বাংলা অনুবাদ 'পদ্মাবতী' যেমন রূপক কাব্য, "সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ" কাব্যও তেমন একখানি রূপক কাব্য। "সত্যের জয় ও মিথ্যার বিলয়", এই কথাকে বুঝাইবার জন্য কাব্যখানি লিখিত হয়। রচনা কাঁচা হইলেও সমগ্র মধ্যযুগীয় মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে ইহাই একমাত্র মৌলিক রূপক কাব্য।

(খ) হানিফার লড়াই :– ইহাকে 'মকতুল হুসৈন' কাব্যের অংশ বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, ইহা একটি পৃথক কাব্য। ১১৩৪ ত্রিপুরাব্দের (১১৩৪ + ৫৯০ = ১৭২৪ খ্রী:) এক পাণ্ডুলিপিতে কাব্যটির গোড়ার দিককার অংশ সম্পূর্ণভাবে বর্তমান। ইহার গোড়ায় এই সুদীর্ঘ বন্দনাটি রহিয়াছে :

(মক্কা মদীনা বন্দনার পর কিতাব বন্দনা)

"প্রভুর দরবারে বন্দম কিতাব কোরাণ।
তার মধ্যে এই চারি কিতাব প্রধান॥
ইঞ্জিল নামিল ইছা পয়গাম্বর 'পরে।

তৌরিত যে পাইলেন মুছা পয়গাম্বরে॥
জব্বুর কিতাব (হৈল) দাউদ নবী 'পর।
ফোর্কান মোহাম্মদ মোস্তফা গোচর॥"

তারপর, ইয়াকুব, দাউদ, সুলেমান, মূসা, তূর পর্বত, আরশ, আসমান জমীন প্রভৃতির দীর্ঘ বন্দনা করিয়া–

"চাটিগ্রাম বন্দি কহিমু বদর আলাম।
তাহান চরণে মোর হাজার ছালাম॥"

অতঃপর শাহ আবদুল ওহাব, শাহ ভিখারী, চন্দ্র, সূর্য, তারা, পবন, ইসরাফীল, আজরাইল, চতুর্দিক, নব্বই হাজার পীর, হজরত আলী, মাতা, পিতা ও ওস্তাদ বন্দনা করিয়া কবি বলেন,–

"বন্দনা সমাপ্ত হৈল শুন কহি আর।
মোহাম্মদ খানে কহে পাইবে উদ্ধার॥"

ইহা পৃথক পুস্তক না হইলে এমন দীর্ঘ বন্দনার বহর গোড়ায় থাকিত না। অধিকন্তু, ইহার কোন অংশের সহিত 'মকতুল হুসৈন' গ্রন্থের বিশেষ কোন মিলও দেখা যায় না। এই পুস্তকে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে : এত মানুষ, দেশ ও বস্তুর বন্দনা থাকা সত্ত্বেও ইহাতে কবির নিজের পীরের বন্দনা নাই।

পুস্তকের বিষয়-বস্তুতে কিছুই নূতনত্ব নাই। বিষয়-বস্তুর দিক হইতে সাবিরিদ খানের "হানিফা ও কয়রা-পরী"-র প্রভাব ইহাতে দেখা যায়। চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে (এই অঞ্চলে আরাকানের নিকট "শাহাপরীর দ্বীপের" অবস্থানও চিন্তা করিবার বিষয়) মুহম্মদ হানিফা ও 'কয়রা পরী'র টঙ্গী আছে বলিয়া একটা জনশ্রুতি আছে। এই জনশ্রুতির প্রভাব এই পুঁথিতে দেখা যায়। হানিফা 'রোকান' (রক্ষইং>রকসইং বা রখইং> রোসাং বা রোকাম) শহরে গিয়া 'কয়রা পরী'কে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই কথা এই পুঁথিতে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :

"আমা ধনি সহিবা কি শুন পাপসর।
বাহুবলে জৈগুণ জিনিলুম সমর॥
সহর রোকামে মোরে দিবে ধরে সারা
সাহাপরী সুতা দেবী জিনেছি কয়েরা॥
একে একে দেবগণ জিনিলুম বিশেষ।
সহর রোকাম হন্তে আনি দিলু দেশ॥"

(গ) আসহাব নামা :– এই পুস্তকের কোন পাণ্ডুলিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কবি তাঁহার 'কিয়ামৎ-নামা'য় 'চারি আছহবার কথা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কোনো পৃথক পুস্তক নহে, 'মকতুল হুসৈন'-এর দ্বিতীয় পর্ব।

(ঘ) মকতুল হুসৈন :– ইহাই কবির 'ম্যাগনাম ওপাস্' বা শ্রেষ্ঠ কাব্য। বহুদিন পূর্বে কলিকাতার বটতলায় এই পুস্তক ছাপা হইয়াছিল। এখন এই মুদ্রিত পুঁথিটিও পাওয়া যায় না। ইহাতে কারবালার ঐতিহাসিক কাহিনীটিই বিবৃত হইয়াছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এমন দিনও গিয়াছে, এই 'মকতুল হুসৈন' মুহররমের সময় ঘরে ঘরে সুর

করিয়া দল বাঁধিয়া পড়া হইত। এখনও কোথাও কোথাও ইহা পঠিত হইয়া থাকে। বিষয়টি যতখানি ঐতিহাসিক, কাব্যে ততখানি ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই। বোধ হয়, তজ্জন্যই ইহাতে কাব্যরস বিশদরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যই কাব্যখানি করুণ রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

এই কাব্যখানি মোট একাদশ পর্বে সমাপ্ত। কাব্যের গোড়াতেই কবি পদবন্ধে পর্বগুলির সূচী দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে পর্বের যে নাম দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :

আদি পর্ব	নাম :—	ফতিমা পর্ব।
দ্বিতীয় পর্ব	"	আসহাব পর্ব।
তৃতীয় পর্ব	"	হাসন-পর্ব।
চতুর্থ পর্ব	"	মুসলিম পর্ব।
পঞ্চম পর্ব	"	যুদ্ধ পর্ব।
ষষ্ঠ পর্ব	"	হুসৈন পর্ব।
সপ্তম পর্ব	"	স্ত্রী পর্ব।
অষ্টম পর্ব	"	দূত পর্ব।
নবম পর্ব	"	অলীদ পর্ব।
দশম পর্ব	"	এজীদ পর্ব।
একাদশ পর্ব (পরে রচিত)	"	অন্ত পর্ব।

'মকতুল হুসৈন' কাব্য রচনার তারিখ আছে। এই তারিখ হিন্দুয়ানী (শকাব্দ) ও মুসলমানী (হিজরী), দুইভাবেই দেওয়া আছে। ইহা এইরূপ :

"মক্তুল হোসেন কথা অমৃতের ধার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥
মুছলমানী তারিখের দশ শত ভেল।
শতের অর্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল॥
হিন্দুয়ানী তারিখের শুন কহি কত।
বাণ বাহু শত অব্দ আর বাণ শত॥
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া দধি।
পঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি॥

তাহা হইলে হিজরী সন এইরূপ দাঁড়ায় :—

দশ শত	১০০০
শতের অর্ধেক	৫০
ঋতু	৬
মোট	১০৫৬

হিজরী—১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আর, শকাব্দ দাঁড়ায় এইরূপ :

বাণ বাহু শত	১০০০
বাণ শত	৫০০

বিংশ তিন পূর্ণ	৬০	২০ x ৩ = ৬০
দধি = উদধি	৭	
মোট	১৫৬৭ শকাব্দ = ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।	

ইহা হইতে দেখা যাইবে, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মকতুল হুসৈন' রচিত হয়।

এই কাব্যখানিকে কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারতের (রচনা ১৬৪৫ খ্রী:) প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কবি মুহম্মদ খান খাড়া করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার পরিকল্পনা একেবারেই মহাভারতের অনুরূপ। অবশ্য, 'মহাভারত' আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শৈল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রম বাস, মুষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ,—এই অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত।

আর 'মকতুল হুসৈন' ফাতিমা, আসহাব, হাসন, মুসলিম, যুদ্ধ, হুসৈন, স্ত্রীদূত, অলীদ, এজীদ, অন্ত এই একাদশ পর্বে বিভক্ত। আদি ও স্ত্রী পর্বে দুই কাব্যের মিল লক্ষণীয়। তথাপি ইহা আদ্যোপান্ত ইসলামী কাব্য। বাংলা-ভাষায় রচিত হিন্দুর সাহিত্য তখন বাঙালী মুসলমানেরা পড়িত। এই কথা কবি সয়্যিদ সুলতান তাঁহার 'শব-ই-মিরাজের' ভূমিকায় বলিয়াছেন :

"এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুয়ায়।
প্রকাশ্যে সকল কথা মনে নাহি ভায়॥
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি॥
হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসূলের কথা কেহ না সোঙরে॥***
আরবী ফারছি ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মূর্খ সুত॥
দুক্ষ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা যত কহিমু অধিক॥
কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উতপন।
ন বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন॥
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা।
পরস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা॥"

এই সমস্ত কথা তিনি তাঁহার শিষ্য মুহম্মদ খানকে বুঝাইয়া থাকিবেন। তিনি নিজে যেমন হিন্দু ধর্ম-কাহিনী ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইসলামী কাহিনী ও প্রস্তাব বাংলায় লিখিয়া প্রচার করিতেছিলেন, ঠিক তেমনই তাঁহার শিষ্য মুহম্মদ খানকেও তাঁহার আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করিতে বলিয়াছিলেন। এই দিক হইতে দেখিলে, মুহম্মদ খানের 'মকতুল হুসৈন' রচনার উদ্দেশ্যটুকুও তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক :

"হিন্দুস্থানে লোক সবে ন বুঝে কিতাব।
ন বুঝি ন শুনি নিত্যি করে মহাপাপ॥
তেকাজে সংক্ষেপ করি পঞ্চালী রচিলুং।
ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কিছু ন জানিলুং॥

পঞ্চালী পড়িতে সবে মনে ভয় পাই।
অবশ্য কিতাব কথা শুনিবেক যাই॥
কিভাবে আল্লার আজ্ঞা শুনিবেন্ত যবে।
দান ধর্ম পুণ্য কর্ম করিবেন্ত তবে॥
অবশ্য মোহোরে সবে দিবে আশীর্বাদ।
মহাজন আশীর্বাদ খণ্ডিব প্রমাদ॥
বিশেষ পীরের আজ্ঞা ন যায় লঙ্ঘন।
রচিলুং পঞ্চালিকা তাহার কারণ॥
—(মকতুল হুসৈন)

কবি মুহম্মদ খান ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মকতুল হুসৈন' রচনার পরে বেশী দিন বাঁচিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনার পর, তিনি বেশী দিন বাঁচিলে অন্য গ্রন্থ রচনা করিতেন। অদ্যাবধি ইহার পরবর্তী তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই বা কোথাও কোন পুস্তকের উল্লেখ দেখা যায় নাই বলিয়া আমরা এইরূপ মনে করি। তিনি ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স আনুমানিক ৭০ বৎসর বলিয়া ধরিলে তিনি ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সয়্যিদ মরতুজা

(আনুমানিক ১৫৯০–১৬৬২ খ্রী:)

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের মধ্যে নানা কারণে কবি সয়্যিদ মরতুজা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের 'এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে' এই কবির বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনালুপ্ত 'সুধা' পত্রিকার প্রথম বর্ষের মাঘ সংখ্যায় 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'-প্রণেতা নিখিলনাথ রায় মহাশয়ও এক প্রবন্ধে কবির জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার কথা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

তাঁহার পূর্ণ নাম সয়্যিদ মরতুজা আনন্দ। তাঁহার পিতার নাম সয়্যিদ হাসান। তাঁহার পিতা উত্তর-প্রদেশের বেরেলী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পীরের নাম সয়্যিদ শাহ্ আব্দুর রজ্জাক। তাঁহার পিতা হাসান বেরেলী হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই জেলার জংগীপুরের নিকটবর্তী 'বালিয়াঘাটা' নামক পল্লীতে সয়্যিদ মরতুজার জন্ম হয়।

সয়্যিদ মরতুজা একজন খ্যাতনামা দরবেশ ছিলেন। এখনও রজব মাসের ১১ই হইতে ১৩ই তারিখ পর্যন্ত ৩ তিন দিন ধরিয়া জঙ্গীপুর থানার 'সূতী' গ্রামে তাঁহার বার্ষিক 'উরস্' বা মৃত্যু-বার্ষিকী প্রতিপালিত হয়। এই 'সূতী' গ্রামেই তিনি সমাহিত আছেন। গৌড়ের ফীরূযপুরের শাহ্ নিয়মতুল্লাহ্ (মৃত্যু—১৬৬৪ খ্রী:) সয়্যিদ মরতুজার সমসাময়িক দরবেশ। সয়্যিদ মরতুজার সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। এই জন্যই এখনও 'সূতী'-তে যে-সমস্ত ফকীর প্রতি বৎসর মরতুজা আনন্দের 'উরস্'-এর সময় একত্র হয়, তাঁহারা 'উরস্' সমাপনান্তে ফীরূযপুরে শাহ্ নিয়ামতুল্লার দরগাহে 'জিয়ারতের' জন্য গমন করেন।

সয়্যিদ মরতুজা সংগীত ও আনন্দোল্লাসে বিভোর থাকিতেন। লাহোরের মুফতী ঘুলাম হুসৈন সরওয়ারের 'খজীনত্-ল আসফিয়া' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শাহ্ সয়্যিদ মরতুজা রাজমহলে বাস করিতেন, নানা 'কিরামৎ' বা অলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী ছিলেন এবং তৌহীদ-সম্বন্ধীয় গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার 'আনন্দ' উপাধিতেই আনন্দোল্লাসে বিভোর থাকার কথা প্রমাণিত হয়।

তিনি শাহ্ নিয়ামতুল্লার পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়া থাকিবেন। নতুবা তাঁহার দলভুক্ত ফকীরেরা আগে তাঁহার মৃত্যু-বার্ষিকী সমাধা করিয়া পরে নিয়ামতুল্লার দরগাহ 'জিয়ারৎ' করিবার প্রথা পালন করিতেন না। ইহা ফকীরদের মধ্যে একটি সাধারণ ভদ্রতা-সূচক প্রথা। তাহা হইলে, তাঁহার জীবনকাল ৭০ কি ৭২ বৎসর বলিয়া ধরিলেও, তাঁহার জন্মকাল দাঁড়ায় ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সময়ের সহিত অর্থাৎ ১৫৯০ হইতে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের সহিত তাঁহার জীবন-সংশ্লিষ্ট আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সময়েরও মোটামুটি মিল হয়। তাহা এই :

বালিয়া-ঘাটায় সয়্যিদ কাসিম শাহ্ নামক এক ব্যক্তি ১১৫৫ হিজরীতে অর্থাৎ ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সয়্যিদ কাসিম সয়্যিদ মরতুজার পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিন পুরুষে ৭৫ বৎসর ধরিয়া ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হিসাব করিলে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহা মসজিদ নির্মাণের কাছাকাছি সময়। সুতরাং, সয়্যিদ মরতুজার জীবনকাল সম্বন্ধে আর বিশেষ সন্দেহ থাকে না।

সয়্যিদ মরতুজা যে শুধু ভাংলা-ভাষার কবি ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ফারসী ভাষায়ও বহু 'গজল' রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার একটি এইরূপ :

(অনুবাদ)

লাভে নির্লিপ্ত ও ক্ষতিতে উদাসীন (বলিয়া)
অর্ধ-যব-শস্যে আমি ইহকাল-পরকাল কিনি না॥
আমি ঐহিক—মায়াজাল সম্বন্ধে (বিশেষ) অবগত,
কেননা, তুমি যেন বলিতে না পার আমি অসতর্ক ব্যক্তি॥
বনমধ্যস্থ সিংহের ন্যায় আমি পরিতৃপ্ত,—

শব-সন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবমান-কুকুরের মত নহি॥
দাড়িম্ব দীপ্তি-পদ্মরাগ মণির মত লাল মুখ আমার,—
(অতএব) আমার দৃষ্টিতে স্বর্ণ শুধু হরিদ্রাভ॥
হে মর্তুজা! এই জগৎ দ্রুত অপসৃয়মান,—
(সুতরাং) আমার পক্ষে দ্রুততর অপসৃত হওয়া শ্রেয়॥

এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সৈয়িদ মরতুজার নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি পাওয়া গিয়াছে :
(ক) যোগ-কালন্দর। (খ) পদাবলী।

'যোগ কালন্দর' বাংলার সূফী-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই পুস্তকটি মৎকর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশের অপেক্ষায় রাজশাহীর 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে। ইহা 'মজ্‌মাউ-ল্-বাহরৈন্' জাতীয় পুস্তক। ইহার একটি মাত্র পুঁথিতে কেবল একটি ভণিতা পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ :

"বাপে দিল জন্মখানি মায়ে দিল খীর।
সৈয়দ মর্তুজা কহে জন্মের ফিকির॥"

পুস্তকটিতে 'মারফতী-আমল' প্রভৃতির সহিত হিন্দুর যোগ-শাস্ত্রের 'প্রক্রিয়াদি' মিশিয়া বাংলার হিন্দু-মুসলিম তত্ত্ব-কথার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। দারা শিকোহ্-এর 'মজমাউ-ল্-বাহরৈন' যেমন উত্তর-ভারতে মুঘল-আমলের হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের একটা বড় দিক উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, ঠিক তেমনই সয়্যিদ মরতুজার 'যোগ-কালন্দর'ও বঙ্গে মুঘল-আমলের হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের একটা প্রধান দিক খুলিয়া দেয়। এই দিক হিন্দুর 'যোগ-সাধন' ও মুসলমানের 'মারফতী-আমলের' দিক।

'যোগ-কালন্দর' দেশে অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। ইহার বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। মৎসম্পাদিত 'যোগ-কালন্দরে' আমি নয়খানি (তাহার দুইখানি আরবী হরফে লিখা) পাণ্ডুলিপি হইতে পাঠ মিলাইয়া একটি 'যৌগিক পাঠ' (Composite tex:) তৈয়ার করিয়াছিলাম। পুস্তকটি খুব বড় নহে,—মুদ্রিত হইলে ২০-৩০ পৃষ্ঠা দাঁড়াইতে পারে। ইহার প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির তারিখ ১১১৫ মঘী বা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। সয়্যিদ মরতুজা ব্যতীত আরও অনেকে 'যোগ-কালন্দর' লিখিয়াছেন কিন্তু তাহার সমস্তই সয়্যিদ মরতুজার নকল বলিয়া মনে হয়। মরতুজার 'যোগ-কালন্দরের' আরম্ভ এইরূপ :

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
তার পাছে প্রণামিয়ে নবীর চরণ॥
করিম রহিম আল্লা পরোয়ারদিগার।
আঠার হাজার আলম সৃজন যাহার॥"

এই পুস্তকের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। নমুনা স্বরূপ 'নাসূৎ-মকাম'-এর বিবরণ হইতে মাত্র চারি চরণ উদ্ধৃত করিতেছি :

"নাছুত মোকাম জান এ তিন টিহরী।
আজ্রাইল ফিরিস্তা আছে তথায় প্রহরী॥
সে সব ঘটাল জান আনলের স্থান।
সদায় আনল জ্বলে নাহিক নির্বাণ॥

বাংলায় 'পদাবলী' রচনা সয়্যিদ মরতুজার অপর প্রধান কীর্তি। এ-যাবৎ তাঁহার ২৬টি পদ নানা পত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু' নামক পদসংগ্রহে তাঁহার একটি পদ সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই পদগুলি হিন্দু-পদকর্তাদের পদ হইতে নিকৃষ্ট নহে।

শেখ মুত্তলিব
(আনুমানিক ১৫৯৫–১৬৬০)

শেখ পরানের পুত্র শেখ মুত্তলিবও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা কবি। তিনি দেশে অত্যধিক সমাদর লাভ করিয়াছিলেন,—ইসলাম শাস্ত্রীয় গ্রন্থকার বলিয়াই তাঁহার সমাদর এত বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে। তাঁহার 'কিফায়িতু-ল্-মুসল্লীন' নামক ইসলাম-ধর্মীয় গ্রন্থ-খানি দেশে এতই সমাদৃত হইয়াছিল যে, বাংলা ও আরবী উভয় হরফে তাঁহার গ্রন্থটির বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। বাংলা হরফের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির তারিখ ১১৩৪ মঘী অর্থাৎ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ এবং আরবী হরফের প্রাচীনতম দুইটি পাণ্ডুলিপির তারিখ ১১৮০ মঘী অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ইহা একখানি বিরাট গ্রন্থ, ১৯১ পত্রে সমাপ্ত। ইহার দুই পাণ্ডুলিপিতে পুস্তক সমাপ্তির দুইটি সাঙ্কেতিক তারিখ পাওয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, দুইটি তারিখই হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। তারিখ দুইটি এইরূপ :

(১) 'সর্বলোকে বঙ্গভাষে কহিছে বিচার।
কেহ না কহিছে তারে ভাঙ্গিয়া যে সার॥
ইসলাম এবাদত নমাজ সমাপ্ত।
সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত॥
সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম।
যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম।

(২) পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম।
কিফায়েতুল মুসল্লিন রাখিলাম নাম॥

আমরা আগে শেখ পরানের সময় নির্ণয়-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, 'এবাদত', 'নাম' এবং 'তামাম' শব্দেই সঙ্কেতিক তারিখটি বর্তমান, আর তাহার সংখ্যা ১০৪৯ হিজরী অর্থাৎ ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। এইবার দ্বিতীয় তারিখটি কিরূপ দাঁড়ায় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। ইহার 'দীন', 'ইসলাম', 'কিফায়িতু-ল-মুসল্লিন' এবং 'নাম'—এই কয়টি শব্দে সাঙ্কেতিক তারিখটি বলা হইয়াছে। এই কয়টি শব্দের অক্ষরের সংখ্যা এইরূপ :

দীন	= ৬৪
ইসলাম	= ১৩২
কিফায়িৎ	= ৫১০
আল মুসল্লীন	= ২৫১
(এখানে 'নাম' দুইটি) নাম	= ৯১
মোট	= ১০৪৮ হিজরী = ১৬৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।

দুই তারিখই যখন ১৬৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পুস্তক সমাপ্তির তারিখে আর কোন সন্দেহ নাই।

কবি শেখ মুত্তলিব অল্প বয়সে (আনুমানিক ১২-১৩ বৎসর বয়সে) পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তখন তিনি মৌলবী রহমতুল্লাহ্ নামক জনৈক পরম ধার্মিক আলিম কর্তৃক প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হন। তাঁহার সাহচর্যে কবি মানুষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশেই 'কিফায়িতু-ল্-মুসল্লীন' কাব্য রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন :

"মৌলবী রহমতুল্লা আলিম অনুপাম।
দানে দাতা ভয়ে ত্রাতা সর্বগুণধাম॥****
অন্ন বস্ত্র দিয়া বহু করিয়া যতন।
অনুক্ষণ প্রীতিভাবে করন্ত পালন॥
তাহান নিকটে মোরে সদাই বসাই।
কিতাবের রওয়ায়েত কহন্ত বুঝাই॥
তাহান আদেশ মুঞি শিরেত ধরিয়া।
করযুগে তান দুই চরণ বন্দিয়া॥
ওস্তাদ সকল পদে করম আরতি।
কেফায়েতুল মোছল্লিন পুণ্যের ভারতী॥
সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরান সুজন।
তাহান নন্দন হীন মোতালিব ভাণ॥"

ইহা হইতে দেখা যাইবে, কবি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যে একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। মৌলবী রহমতুল্লাহ্ তাঁহার শিক্ষাগুরু হইলেও, তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন অন্য ব্যক্তি। কবি বলেন :

"পীর পদে প্রণামিয়ে ছৈয়দ হাছন॥
মীর মোহাম্মদ শফি তাহান নন্দন॥"

এই গ্রন্থ কবির অল্প বয়সের রচনা নহে। কেননা অল্প বয়সে এমন গ্রন্থ রচনা করা যায় না। ইহার রচনা কালে (১৬৩৮ খ্রী:) কবির বয়স ৪২-৪৩ বৎসর হইলেও, কবি ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল ৫৫ বৎসর ধরিলেও, তিনি ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন।

এই 'কিফায়িতু-ল্-মুসল্লীন' ইসলামের 'ফিক্‌হ্‌' নামক শাস্ত্রের কথায় পরিপূর্ণ। সমস্ত বিষয়ই মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। রোজা, নমাজ, অজু, ইবাদৎ প্রভৃতি অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় লইয়া পুস্তকখানি মুসলমানদের নিত্যকর্ম নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এমন পুস্তক বাংলা-ভাষায় লিখিয়া বিব্রত বোধ করায় কবিকে দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। এই কৈফিয়ৎটি এইরূপ :

"আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ॥
মুছলমানী শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করিলু।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু॥
কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়ে মনান্তরে।

বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে॥
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক॥
এ সব জানিয়া যদি করয়ে রক্ষণ।
তবে সে মোহোরে পাপ হইবে মোচন॥

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, ইসলাম ধর্মের কথা বাংলা ভাষায় (দেশী ভাষায়) রচনা করিলে 'বহু পাপ' বা মহাপাপ হইয়া যায় এমন ধারণা শেখ মুত্তলিবের সময়েও ছিল। কিন্তু কবি, মনে মনে (মনান্তরে) আশা পোষণ করিতেছিলেন যে, যদি ইহাতে সত্যসত্যই পাপ হইয়া থাকে, সে পাপ আল্লাহ্ মার্জনা করিবেন, কারণ ইহাতে আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলমানেরা উপকৃত হইবেন এবং কবিকে দোয়া করিবেন।

'কিফায়িতু-ল্-মুসল্লীন' গ্রন্থের বহু প্রতিলিপির মধ্যে একটি প্রতিলিপিতে একটা অভিনব খবর আছে। কথিত আছে, পাঁচ ওক্ত নমাজ পাঁচজন খ্যাতনামা নবীর দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ফজরের নমাজ প্রবর্তন করেন হজরত আদম (আ:); জোহরের নমাজ হজরত ইবরাহীম (আ:); আসরের নমাজ হজরত ইউনুস (আ:); মগরিবের নমাজ হরজত মুসা (আ:) এবং ইশা ও তারাবির নমাজ হজরত মুহম্মদ (দ:)! পরে সমস্তগুলিই হজরত মুহম্মদ (দ:) চালু করিয়াছিলেন।

কবি মুত্তলিব আরও একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ইহার নাম 'কায়দানী কিতাব'। পুস্তকটি কবির অল্প বয়সেই লিখিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার শিক্ষাগুরু ফাজিল মুহম্মদ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের কাছ হইতে শুনিয়া লিখিত। ইহাও একখানি ধর্মীয় গ্রন্থ। ভণিতায় দেখা যায়,—

"হীন মোত্তালিব কহে আল্লাকে ভাবিয়া।
কহিমু কায়দানী কিতাব বাংলা রচিয়া॥"

মীর মুহম্মদ শফী

(আনুমানিক ১৫৫৯–১৬৩০ খ্রী:)

মীর মুহম্মদ শফী কবি হাজী মুহম্মদের (১৫৫০–১৬২০) শিষ্য ছিলেন। তাঁহার তিনখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যথা— (ক) নূরনামা, (খ) নূর কন্দীল ও (গ) সায়াৎনামা।

তন্মধ্যে 'নূরনামা' ও 'নূর-কন্দীল' প্রকৃতপক্ষে একই গ্রন্থ। পুস্তক দুইটি বিভিন্ন নামে পরিচিত হওয়ায়, পৃথক পুস্তক রূপে দাঁড়াইয়া গিয়া থাকিবে। উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়বস্তু এক, কেবল নকলকারদের দোষে স্থানে স্থানে উভয় পুস্তকের ভাষায় যৎসামান্য পার্থক্য ঘটিয়াছে। নীচে তুলনামূলক আলোচনার জন্য পুঁথি দুইটির আরম্ভ হইতে চারি চরণ পাশাপাশি উদ্ধৃত করিলাম :

নূরনামা'র পাঠ

"বলি পীর কহি দেঅ আদ্য সমাচার।
কিরূপে হইল নূর আল্লার দিদার॥
কোন মতে হৈল স্বর্গ খিতি উৎপন।
কিমতে হইল বল জীবের সৃজন॥

'নূর-কন্দীলে'র পাঠ

"প্রভু বলি কহি দেঅ আদ্য সমাচার।
কিরূপে হইল নুর আল্লার দিদার॥
কিরূপে হইল সর্গ খীতি উতপন।
কেমতে হইল সব জীবের জীবন॥"

সমগ্র পুঁথিতেই ভাষায় ও বিষয়-বস্তুতে গরমিলের চেয়ে মিলই বেশী। সুতরাং পুস্তক দুইটি যে এক, সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। তবে নাম দুইটির কোনটি গ্রহণীয় তাহাই ভাবিবার বিষয়। অধিকাংশ পুঁথিতে 'নূরনামা' দেখা যায়। তবে অন্যান্য 'নূরনামা' হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার পক্ষে 'নূর-কন্দীল' নামই বেশী উপযুক্ত।

কবির পিতার নাম শাহ্‌জাহান, তিনি একজন দরবেশ ছিলেন এবং 'শহীদ' হইয়াছিলেন। তিনি কবিকে মারফতের 'পন্থের' কিঞ্চিৎ উদ্দেশ দান করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই কবি বলিয়াছেন :

"কহে মোহাম্মদ শফী আমি বড় দুখী।
ইহলোক পরলোক পরের পীরিতি॥
পিতা মোর সাজাহান সহিদ দরবেশ।
কিঞ্চিৎ জানাইলা মোরে পন্থের উদ্দেশ॥"

এ-যাবৎ কবির কোন পুঁথিতে সন-তারিখ পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি যে কবি হাজী মুহম্মদের (১৫৫০–১৬২০) শিষ্য ছিলেন, তাহা জানা গিয়াছে শিষ্য গুরুর বয়োজ্যেষ্ঠ, সমবয়স্ক অথবা বয়ঃকনিষ্ঠ হইতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে শিষ্যকে গুরুর বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াই কবির জীবন-কাল ১৫৫৯ হইতে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

পুস্তকটির বিষয়-বস্তু কি, উপরে উদ্ধৃত চারি চরণ হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কিভাবে'নূর-মুহম্মদী'র সৃষ্টি হইল এবং এই 'নূর-মুহম্মদী' হইতে কিভাবে বিহিশত, দোজখ, পৃথিবী আদির সৃষ্টি হইল, তাহার বর্ণনা লইয়া পুস্তকটির আরম্ভ এবং তৎপ্রসঙ্গে নানাভাবে নানা উপদেশ ছড়ানো। এই প্রাসঙ্গিক উপদেশের একটি এইরূপ :

"নাসিকাত চন্দ্র সূর্য্য জনক জননী।
দুই স্বরে দুই বসে লও তারে মানি॥
দক্ষিণে সুরুজ বসে বামে বসে শশী।
অনুদিন বুঝ তারে গহনেত বসি॥
সূর্যের ঘরেত গেলে চন্দ্র ঘরে নিবা।
অনুক্ষণ পিতা মাতা কর্মেত রহিবা॥
জনক ডাহিনে বসে বামেত জননী।
অনুদিন তারে চিনি লও পরিমাণি॥"

বলা বাহুল্য, পিতামাতাকে ভক্তি করার উপদেশটি যৌগিক তত্ত্বের মধ্য দিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে। পুস্তকটিতে মারফতী তত্ত্বের সহিত এমন যৌগিক তত্ত্বেরও অভাব নাই।

কবির দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'সায়াৎ নামা'। নামেই পুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতেছে। কোন শুভ বা অশুভক্ষণে কি করিলে কি ফল হয়, তাহার কথাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের বিষয়-বস্তু।

আবদুল হাকীম

(আনুমানিক ১৬২০–১৬৯০)

কবি আবদুল হাকীম বহু গ্রন্থ প্রণেতা। বিভাগ-পূর্ব নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপের সুধারামে কবির জন্ম হয়। সন্দ্বীপ বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত। কবির পিতার নাম শাহ্ আবদুর রজ্জাক এবং পীরের নাম শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ। ত্রিপুরা হইতে আরম্ভ করিয়া বাখরগঞ্জ অবধি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তাঁহার নানা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে কবির লোকপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার 'লালমতী-সয়ফুলমূলক', নামক কাব্যখানি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বটতলার কল্যাণে মুদ্রিত হইয়া সমগ্র বাংলায় ছড়াইয়া পড়ে।

তাঁহার কোন পুস্তকেই রচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। এতৎসত্ত্বেও আমরা তাঁহার আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিতরূপেই জানিতে পারি। কিভাবে তাহা সম্ভবপর হইল নীচে দেখাইয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ বাখরগঞ্জ হইতে তাঁহার "শিহাবুদ্দীন নামা"র যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, ইহার এক কোণে ১১৪২ সনে ইহা অনুলিখিত বলিয়া লেখা আছে। এই ১১৪২ বাংলা সন। কারণ, বাখরগঞ্জে বাংলা ব্যতীত অন্য কোন সনের প্রচলন নাই। এই বাংলা সন ইংরেজী ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়, অন্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদের পূর্বে কবি জীবিত ছিলেন। কবির জীবদ্দশায়ও কাব্যখানির প্রতিলিপি হইতে পারে। কিন্তু, তাহা যে হয় নাই, তাহার অন্য প্রমাণ আছে।

দ্বিতীয়তঃ, কবির 'লালমতী-সয়ফুলমূলক' নামক কাব্যখানির একখানি পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দে (অর্থাৎ ১২৬৭ + ৫৯০ = ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) অনুলিখিত হইয়াছিল। এই কাব্যের বহু পাণ্ডুলিপির কোন কোনটিতে কবি আবদুল হাকীমের ভণিতার সহিত দুই এক স্থলে 'শরীফ' নামক এক ব্যক্তির ভণিতাও দেখা যায় এই 'শরীফ' যে কোন কোন পাণ্ডুলিপির অনুলেখক, তাহা সুস্পষ্ট। এক স্থলে অনুলেখক শরীফ তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়াছেন এইভাবে—

"সাহ ছুলতান সুত, সর্বগুণ অলঙ্কৃত,
তান পদে করিয়া ভকতি
কাজী মনছুর মানি, তাহান তনয় জানি
শরিপ শাহার ভারতি॥"

ইহা হইতে দেখা যায় যে, শাহ্ সুলতানের পুত্র কাজী মনসুর এবং তৎপুত্র শরীফ শাহ্। এই শরীফ শাহ্ বা শাহ্ শরীফ আমাদের পূর্বোক্ত কবি সয়্যিদ সুলতানের পৌত্র বা পোতা। কবি সয়্যিদ সুলতান দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি যে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ কবি মুহম্মদ খান। তাঁহার পৌত্র শরীফ শাহের সময় পিতামহ সয়্যিদ সুলতান হইতে ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক ব্যবধানও হইতে পারে না (কারণ, শরীফ দ্বিতীয় পুরুষ)। তাহা হইলে ১৬৪৬+৫০=১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শরীফ

জীবিত ছিলেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে, শরীফ কাব্যখানি নকল করিয়াছিলেন। সুতরাং, কবি আবদুল হাকীম কিছুতেই সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী লোক হইতে পারেন না।

তৃতীয়তঃ কবি যে সপ্তদশ শতাব্দীর লোকও নহেন, তাঁহার কাব্যগুলির আভ্যন্তরীণ প্রমাণই প্রধান যুক্তি। কবি সন্দ্বীপের লোক। তিনি যদি সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার অর্থাৎ প্রথম দুই দশকের লোক হইতেন, তবে সপ্তদশ শতাব্দীর হার্মাদ আড্ডা হিসাবে সন্দ্বীপ কুখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার কাব্যে একটি বারও হার্মাদদের উল্লেখ না থাকা অস্বাভাবিক ব্যাপার বটে। পর্তুগীজ সর্দার গঞ্জালিস ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে সন্দ্বীপ দখল করে এবং ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ সন্দ্বীপ দখল করিয়া গঞ্জালিসকে বাংলা হইতে বিতাড়িত করেন। ইতঃপূর্বে ১৬০৪ হইতে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফতে খান সন্দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাজত্ব করেন। অন্য এক কবি (নসরুল্লাহ্ খান ১৫৬০–১৬২৫) এই ফতে খানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কবি আবুদল হাকীম হার্মাদদের কথা যেমন উল্লেখ করেন নাই; আরাকানীদের বা রোসাঙ্গের কথাও উল্লেখ করেন নাই; এমন কি ফতে খানের উল্লেখও তাঁহার কাব্যের কোথাও নাই। সন্দ্বীপে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এতগুলি ঘটনা ঘটিয়া গেল, অথচ কবি তাহার কোন প্রভাবই অনুভব করিলেন না, তাহার কারণ বুঝা যায় না। ইহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, কবি হয় ১৬০০ হইতে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ-মধ্যবর্তী সময়ের পূর্ববর্তী, না হয় পরবর্তী। অন্য প্রমাণের অভাবে আমরা তাঁহার আবির্ভাব কালকে ১৬২০ হইতে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। অর্থাৎ ঐ সময়ের পরবর্তী বলিয়া আপাততঃ স্বীকার করিলাম।

চতুর্থতঃ, তাঁহাকে এই সময়ের লোক বলিয়া মনে করিবার আর একটি কারণ এই, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বাংলার মুসলমানেরা যতগুলি কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিতে বাংলা ভাষায় ধর্মকথা প্রচার করার জন্য একটা না একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। সয়্যিদ সুলতান বলুন, নসরুল্লাহ্ খান বলুন, মুহম্মদ খান বলুন, হাজী মুহম্মদ বলুন, শেখ মুত্তলিব বলুন, প্রত্যেকেই বাংলা-ভাষা ও অক্ষরে ধর্মকথা প্রচার করিতে গিয়া বাধা পাইয়াছিলেন। সয়্যিদ সুলতান তো এই কারণে 'মুনাফিক' বলিয়া ফতোয়ার দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিলেন। মনে হয়, এই সময়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে (রক্ষণশীলদের) নেতৃত্বে একটি আন্দোলন বাংলা-ভাষায় (গোঁড়া সম্প্রদায়ের মতে, 'হিন্দুয়ানী' ভাষায়) ধর্মকথা প্রচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছিল। কবি আব্দুল হাকীমের সময়ে এই আন্দোলন চরমে উঠিয়া থাকিবে। নতুবা কবি তাঁহার 'নুরনামা'য় এত ঝাঁঝালো কথায় বাংলা-ভাষায় ধর্মকথা প্রচারের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি বিষোদ্‌গার করিতেন না। ইহা খুব দীর্ঘ বলিয়া শুধু অত্যাবশ্যক অংশটুকুই উদ্ধৃত করিতেছি :

"কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ॥****
তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন॥
আরবি ফারছি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।

দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ॥
আরবী ফারছি হিন্দে নাই দুইমত।
যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত॥****
যেই দেশে যেই বাক্যে কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন॥
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী॥****
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ॥
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥"
—(নূরনামা)

ইহা হইতে মনে হয়, এই আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছে। বাংলাভাষায় ধর্মকথা প্রচারের পক্ষপাতীদের জয় হউক বা না হউক, অন্ততঃ তাহাদের দল বেশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নতুবা বিরুদ্ধবাদীদিগকে 'জারজ' বলিয়া গালি দিয়া তিনি জীবিত থাকিতে পারিতেন না। তাই আমরা মনে করি, কবির এই কাব্য রচনা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই হইয়াছিল।

কবি আব্দুল হাকীম বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এ-যাবৎ তাহার এই আটটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :– (১) ইউসুফ জলিখা; (২) লালমতী-সয়ফুলমুলুক; (৩) শিহাবুদ্দীন-নামা; (৪) নূর-নামা; (৫) নসীহৎ-নামা; (৬) চারি মকাম ভেদ; (৭) কারবালা ও (৮) শহর-নামা।

[শেষোক্ত দুইখানি পুঁথির সন্ধান অধ্যাপক আলী আহমদ সাহেব তাঁহার 'বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণে' দিয়াছেন। পুঁথিগুলি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।]

নিম্নে পুঁথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

(ক) **ইউসুফ জলিখা** :– ইহা একখানি বিশাল কাহিনী-কাব্য। ইউসুফ-জলিখার কাহিনী অতি প্রাচীন এবং বাইবেল, কুরআন শরীফ ও ফিরদৌসী-জামীর ফারসী কাব্যের মধ্যস্থতায় কাহিনীটি বিশ্ববিশ্রুত। হযরত ইউসুফ (আ:) বাইবেলের (Joseff, Son of Jacob) ও জলিখার (বাইবেলের Potiphar's wife) অপূর্ব প্রেম-কাহিনীই এই কাব্যে বর্ণিত আছে। কাব্যখানি শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ নামক কোন পীরের চরণ ধ্যান করিয়া রচিত :

"সাহাবদ্দি মোহাম্মদ পীর গুণবান।
সে পদ পাদুকা তান জপি পরিত্রাণ॥
আবদুল হাকিম সাহা রজ্জাক নন্দন।
কহন্ত জলেখা তোমা বিবাহ কথন॥"

কাব্যখানিতে কবি স্থানে স্থানে নায়ক-নায়িকার চমৎকার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে ফারসী-সাহিত্যের প্রভাব অলক্ষ্যে ক্রিয়া না করিলে এমনটি হইত বলিয়া মনে হয় না। এমন একটি স্থল এইরূপ :

"জলিখা নয়ানে রক্ত বহে অনিবার।
রক্তবর্ণ হইলেক বয়ান তাহার॥
নয়ানের জলে নিত্য করাঞ্জলি পুরি।
মুখেতে মাখয়ে যেন কুঙ্কুম কস্তুরী॥"

(খ) **লালমতী-সয়ফুলমুলক** :— ইহাও একখানি কাহিনী-কাব্য। সিকন্দর বাদশাহের পুত্র সয়ফুলমুলকের সহিত লালমতী নামক কোন এই দেশীয় রাজকুমারীর প্রণয় ও পরিণয়-ঘটিত ব্যাপার লইয়াই কাব্যটি রচিত হইয়াছে। ইহা বটতলায় বহুদিন পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। ফলে এই কাহিনীর সহিত অনেকেই পরিচিত। ইহার রচনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন :

"সাহাবদ্দি মোহাম্মদ চরণ বন্দিয়া।
সাহা রজ্জাকের পদ শিরেতে ধরিয়া॥
আবদুল হাকিম কহে পঞ্চালি পয়ার।
লালমতী বিবরণ অমৃতের ধার॥"

এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শাহ শরীফের একখানি 'লালমতি-সয়ফুলমুলক' পাওয়া গিয়াছে। ইনি কি আবদুল হাকীমের পুস্তকের অনুলেখক? এমনও হইতে পারে যে, কবি আবদুল হাকিমের পুঁথির অনুলেখক স্বীয় পুস্তকের অসারতার কথা ভাবিয়া পুঁথি নকলের সময় নিজের ভণিতা জুড়িয়া দিয়া কবি আব্দুল হাকীমের পুঁথিখানিকে নিজের নামে চালাইবার ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন।

(গ) **শিহাবুদ্দীন-নামা** :— ইহা ধর্মীয় উপদেশপূর্ণ একটি বিরাট গ্রন্থ। ইহার শেষ পত্র সংখ্যা ১৪৫। পুঁথিখানি ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১১৪২ সনে) বাখরগঞ্জে অনুলিখিত ও রক্ষিত হইয়াছিল। ধর্মীয় উপদেশপূর্ণ এমন সুন্দর গ্রন্থ বাংলায় বিরল। মানুষকে পাপ হইতে দূরে রাখিতে এবং পুণ্য-পথে পরিচালিত করিতে যত রকমের উপদেশ হইতে পারে এই পুস্তকে তাহা অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। পুস্তকটি কবির পীর শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ সাহেবের উপদেশাবলী বা জীবনী নহে; ইহা ফারসী ধর্মীয় পুস্তকের সারসংগ্রহ। পীরের নামে পুস্তকটি উৎসর্গিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম এইরূপ হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন :

"সাহাবদ্দি মোহাম্মদ পীর গুণবান।
প্রচণ্ড সিদ্ধান্ত সাহা জগতে বাখান॥***
আব্দুল হাকিম সাহা রজ্জাক নন্দন।
রচিল কিতাবে যেবা ছিল বিবরণ॥
রাখিলাম সাহার নামে পুস্তকের নাম।
শুনিতে বাড়য়ে পুণ্য বাক্য অনুপাম॥"

এই পুস্তকে কবি আবদুল হাকীম আরবী, ফারসী ও বাংলা সম্বন্ধে একটি উপভোগ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা এই :

"আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান।
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান॥
আরবী পড়িতে যদি ন পার কদাচিত।
ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত॥
ফারছি পড়িতে যদি ন পার কিঞ্চিত।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥
আরবী এলেম জান শাস্ত্র মুছলমানী।
যথেক এলেম মধ্যে আরবী বাখানি॥
ফারছি এলেম হয় আরবী তনয়।
আরবীর অনুরূপ ফারছি লিখয়॥
হিন্দু শাস্ত্র পুস্তক যে ফারছি নন্দন।
পুস্তকে লিখিয়ে (আমি) ফারছি কথন॥
এ তিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার।
নিশ্চয় তাহার 'দীন' ঘোর অন্ধকার॥
বনী আদমের যুক্ত এলেম পড়িতে।
বিনা এলেমেত নারে প্রভুক চিনিতে॥"

এখানে কবির আসল কথা এই যে, যে কোন প্রকারেই হউক, মানুষকে বিদ্যার্জন করিতে হইবে, নতুবা মূর্খতা লইয়া 'প্রভু'কে বা 'রব'কে চিনিতে পারা যায় না।

(ঘ) **নূর-নামা** :— ইহার বিষয়-বস্তু পূর্ব-বর্ণিত পুস্তকের প্রায় অনুরূপ। কবির শেষ প্রার্থনাটি উল্লেখযোগ্য :

"আবদুল হাকিম সাহা রজ্জাক-তনয়।
প্রভু আগে মাগে করি সহস্র বিনয়॥
আয় প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিদান।
মোহাম্মদ রছুলের প্রভাব কারণ॥
প্রলয়ের কালে রোজ হিসাব সময়।
লজ্জিত ন কর মোরে প্রভু দয়াময়॥
মুঞি হীন কিবা যত নবীর উম্মত।
তোহ্মা নিজ কৃপায় পুরাও মনোরথ॥"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, রোজ কিয়ামতে যাহাতে হজরত মুহম্মদ (দ:)-এর 'শফায়ৎ' লাভ করিয়া মুক্তি পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই পুস্তকটি রচিত হইয়াছিল।

নসীহৎ-নামা :— পুস্তকখানি এ-পর্যন্ত দেখি নাই। নাম দেখিয়া মনে হইতেছে, 'শিহাবুদ্দীন-নামা' এবং 'নসীহৎ-নামা' উভয় পুস্তকের বিষয়-বস্তু হয়ত এক।

মুঘল-আমলের আরও কতিপয় কবি ও তাঁহাদের কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(সময় : ১৬০০—১৭৫৭)

মুঘল-আমলের কবি ও তাঁহাদের কাব্যের সংখ্যা এত অধিক যে, আমরা নিম্নে এই যুগের আরও কতিপয় কবি ও কাব্যগুলির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম।

এই যুগে অনেক মুসলমান কবি স্বাধীন আরাকান ও ত্রিপুরা রাজ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইল। 'আরাকান রাজ-সভায় বাংলা-সাহিত্য' নামক গ্রন্থে আমরা ইঁহাদের এক দল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

১। **নওয়াজিশ খাঁ** :– কবি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত সুখছড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার এক অধস্তন বংশধর আতাউল্লা খাঁ পণ্ডিত তাঁহাদের বংশ-পরম্পরায় রক্ষিত বিবরণ হইতে জানাইয়াছেন যে, কবি নওয়াজিশ খাঁ হাজার মঘী সনে (১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। তখন কবি যুবক।

(ক) **পাঠান প্রশংসা** :– তাঁহার 'পাঠান-প্রশংসা' চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের (সাতকানিয়ার) পাঠান বংশের প্রতিষ্ঠার কীর্তি অবলম্বনে লিখিত। এই বংশ এখনও 'আধু-খাঁ'-এর বংশ নামে পরিচিত।

(খ) **গুল-ই-বকাওলী** :– পুঁথিখানি চট্টগ্রামের বাণীগ্রামের জমিদার বংশের আদি পুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে রচিত। এই পুস্তকে কবির আত্মবিবরণীতে তাঁহার এইরূপ বংশ-লতিকা পাওয়া যায় :

সলীম খাঁ (ইনি চট্টগ্রামের 'ছিলিমপুর' পরগণার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।)
|
শরীফ খাঁ
|
ইবরাহীম খাঁ
|
মুহম্মদ ইয়ার খাঁ (খোন্দকার)
|
মুহম্মদ নওয়াজিশ খাঁ (কবি)

ইহা নিছক কাহিনী-কাব্য। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :

তাজু-ল্-মুলুক্ ছিলেন শর্কীস্তানের রাজপুত্র। পুত্রকে দেখিয়া রাজা অন্ধ হন। জানিতে পারা যায়, পরী-রাজকন্যা বকাওলীর উদ্যানস্থিত পুষ্প আহরণ করিয়া তাহা প্রয়োগ করিলে পিতার চক্ষু আরোগ্য হইবে। তৎপর তাজু-ল্-মুলুক্ পরী-রাজ্যে গমন করিয়া পুষ্প আহরণ ও বকাওলীর নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সহিত স্বীয় হার ও অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। বকাওলী বহু অনুসন্ধানের পর তাজু-ল্-মুলুক্-কে আবিষ্কার করেন ও তাঁহাকে বিবাহ করেন।

ইনি একজন শক্তিশালী কবি। এই কাব্যের একটি ভণিতা এই-রূপ :

"না রহে ভাণ্ডার-ধন-রত্ন লক্ষাবধি।
কবির কবিত্ব রহে প্রলয় অবধি॥
ধার্ম্মিকের ধর্ম্মিতা বাড়য়ে দিনে দিনে।
হামিদ প্রশংসা কহে নওয়াজিশ হীনে॥"

(গ) **জোরওয়ার সিংহ-কীর্তি** :– চট্টগ্রামের মীরের সরাই থানার জোরওয়ারগঞ্জ প্রসিদ্ধ স্থান। এই জেলার দোহাজারীর হাজারী-বংশও জোরওয়ার সিংহের বংশ। তাঁহারই কীর্তি-কলাপ এই পুস্তকে বর্ণিত আছে।

(ঘ) **বয়ানাত** :– এই পুস্তকের নাম পাওয়া যায় নাই। ইহা কতকগুলি ধর্মীয়-বিষয়ের 'বয়ান' সমন্বিত গ্রন্থ। ইহার প্রথম বয়ানে 'তন' বা ইন্দ্রিয়ের সহিত জেহাদের বিবরণ এবং দ্বিতীয় বয়ানে 'মুনাফিকের' বিবরণ দেওয়া আছে।

(ঙ) **গীতাবলী** :– কবি নওয়াজিশ খাঁ অসংখ্য গীত বা গান রচনা করিয়াছিলেন। এই গীত-সংগ্রহের তিনখানা পুঁথি (অবশ্য ক্ষুদ্র) পাওয়া গিয়াছে।

২। **কমর আলী** :– ইনি চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান পটিয়া থানার অন্তর্গত করলডেঙ্গা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফারসী ভাষায়ও তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি একজন গানের 'ওস্তাদ' ছিলেন এবং 'হাড়ি' নামক নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহার নিকট হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করিত। এ-পর্যন্ত তাঁহার এই কয়খানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :

(ক) সরসালের নীতি : (ছয়-রিসালার নীতি ?)।
(খ) ঋতুর বারমাস।
(গ) পদাবলী।

মুনাইম মুনশী নামে কোন পণ্ডিত ব্যক্তির আদেশে তিনি 'সরসালের নীতি' রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ফারসী হইতে অনূদিত :

"এই যে নোচকা জান ফারছি আছিল।
সবে বুঝিবারে হীনে পঞ্চালী রচিল॥
নোচকা বলয়ে যারে ফারছি ভাষায়।
তর্জিব কিতাব বলি বঙ্গ ভাষে কহে॥"

ইহা দৈনন্দিন মুসলিম জীবনের আবশ্যকীয় উপদেশাত্মক পুস্তক। কবি তাঁহার এই গ্রন্থ রচনার তারিখ এইভাবে দিয়াছেন,–

চন্দ্র শত বসু ঋতু সন যদি হৈল।
ছরছালের নীতি হীনে পঞ্চালী রচিল॥
নবী করিয়াছে এই হিজরীর সন।
বৈশাখেতে মঘী সন চৈত্রেতে পূরণ॥

ইহা হইতে এই তারিখ পাওয়া যায় :

চন্দ্র শত	=	১০০
বসু	=	৮
ঋতু	=	৬
মোট =		১০৮৬ হিজরী = ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

'ঋতুর বারমাস' একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া যে কোন বিরহিণীর চিরন্তন বিরহ-বেদনার প্রকাশ প্রমূর্ত হইয়াছে।

'পদাবলী' রচনায়ও কবির বেশ শক্তি ছিল। এই পর্যন্ত ইঁহার রচিত ১৫টি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল দ্বারা সম্পাদিত "মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়।

৩। **মঙ্গল (চাঁদ)** :— তাঁহার কাব্যের নাম 'শাহ্‌জলাল-মধুমালা'। কাব্যে কবির সামান্য পরিচয় আছে। কবি মুসলমান। কাব্যটির রচনার তারিখ এইরূপ :

"এসব বৃত্তান্ত কথা অনেক আছিল।
পুস্তক বিশাল বলি তাহা না লেখিল॥
আছিল এ সব কথা আদ্যের বিচার।
হাজার বাহাত্তর সনে হৈল প্রচার॥
ছৈয়দ ছোলতান আর মোহাম্মদ খানে।
এ সবে করিয়া জ্ঞান মহামান্য জান॥

সয়্যিদ সুলতান ও মুহম্মদ খানকে অনুসরণ করিয়া কাব্যখানি লিখিত। রচনার তারিখ ১০৭২ সন অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যটিতে একটি উপাখ্যানের মধ্য দিয়া নানা ইসলামী তত্ত্বকথা প্রচার করা হইয়াছে। কবিকে ত্রিপুরা অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে হয়।

৪। **আবদুল নবী** :— ইনি চট্টগ্রাম জেলার 'ছিলপুর' (ছিলিমপুর?) নামক স্থানে সিদ্দীক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কবি মুকীম তাঁহার আত্মবিবরণীতে চট্টগ্রামের পূববর্তী কবিদের সহিত আবদুল নবীর নামও উল্লেখ করিয়াছেন। একমাত্র 'আমীর হামজা' ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন পুস্তক আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা মোট আশী পর্বে বিভক্ত এক বিরাট কাব্য। এত বৃহৎ কাব্য আর কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। কবির ভাষায় বলিতে গেলে, "থাকুক লেখিব কেহ পড়িতে লাগে ডর"। ইহার রচনার যে তারিখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এইরূপ :

"ঋতু নিধি অভ্র আদি হিজরী বহিল।
আমীর হামজার পুথি সাঙ্গ যে হইল॥"

ইহা হইতে ১০৯৬ হিজরী বা ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ফারসী 'দাস্‌তান-ই-আমীর হাম্‌জা' অবলম্বন করিয়া এই বৃহৎ পুস্তকটি রচিত। এই সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ :

"আমীর হামজার কিচ্ছা ফারছি কিতাব।
ন বুঝিয়া লোকের মনেত পায় তাব॥
বঙ্গেত ফারছি ন জানয়ে লোক সবে।
কেহ কেহ বুঝি কেহ ভাবে জেনা সোঁকে॥
এহি হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার।
নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অঙ্গীকার॥
মুছলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই।
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই॥
লোক উপকার হেতু ত্যজি সেই ভয়।
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদয়॥"

৫। **মুহম্মদ ফসীহ** :— কেবলমাত্র এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা ব্যতীত তাঁহার আর কোন রচনাও আমাদের হস্তগত হয় নাই, ইহার নাম 'মুনাজাৎ'। পুস্তিকাটিতে মোট ১৩টি পত্র ও ২৬টি পৃষ্ঠা আছে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ১১টি করিয়া পঙ্‌ক্তি রহিয়াছে। ইহা ১২২২ বাংলা সনের ২৬শে আষাঢ় অনুলিখিত হয়।

নানা কারণে পুস্তিকাটি বিশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, কোন প্রকারের ভণিতা না করিয়াই বক্তব্য বিষয়ের আরম্ভ :

"আল্লাহ্ গণি মোহাম্মদ নবী"
"আর এক কথা কহি শুন গুণিগণ।
চিত্ত দিয়া শুন কহি মোর নিবেদন॥
আরবির এ তিশ অক্ষরে করি ভার।
মুনাজাত করিবার গোচরে আল্লার॥
একেক অক্ষর প্রতি চতুষ্পদ বন্ধে।
মোহাম্মদ ফছিএ কহে পয়ারের ছন্দে॥"

অতঃপর চারি চরণের শব্দাদ্যে প্রতি আরবী অক্ষরের বাংলা প্রত্যক্ষর দিয়া দুইটি করিয়া শ্লোক বাঁধা হইয়াছে। এইভাবে আরবীর ত্রিশটি হরফের বাংলা প্রত্যক্ষর-ব্যবহৃত 'মুনাজাৎ' বা প্রার্থনা সমাপ্ত হইয়াছে। সমাপ্তির পর কবির কৈফিয়ৎ এইরূপ :

"মোহাম্মদ ফছিএ কহে শুন গুণিগণ।
মুনাজাত করিলাম প্রভুর চরণ॥
কোরানের মধ্যে আছে এ তিশ হরফ।
দেশী ভাষে কহিলুং পঞ্চালি স্বরূপ॥
এসব অক্ষর দেখি কোরান মাঝার।
মোল্লা সবে করিলেক কিতাব সঞ্চার॥
ফারছির মধ্যে দেখি পণ্ডিতের গণ।
বাঙ্গলার ভাষে তবে করিল রচন॥
যার যেবা ইচ্ছা মতে নানান প্রকারে।
হিত বাক্যে বুঝিবারে কহিছি পয়ারে॥"

ইহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল, পুস্তিকার শেষে 'মুনাজাৎ' সমাপ্তির পরে অতি সংক্ষেপে কবির 'হাম্‌দ্' ও 'নাৎ' দেওয়া হইয়াছে। মধ্যযুগীয় হিন্দু-মুসলমান কোন কবির কোন কাব্যে স্তব-স্তুতি বা হাম্‌দ্-নাৎ পুঁথির মূল বিষয়-বস্তুর পরে বিবৃত হয় নাই। এই দিক হইতে বিচার করিলে পুস্তিকাটিকে একক বলিতে হইবে।

ইহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে ভাষাতত্ত্বও একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় বলিয়া স্বীকৃত। বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সেদিনকার ব্যাপার হইলেও ইহা এখন সর্ব-স্বীকৃত বিজ্ঞান। প্রত্যক্ষরীকরণ (Transliteration) এই বিজ্ঞানেরই একটি বিষয়। আরবী হইতে বাংলা প্রত্যক্ষরীকরণও একটি আবশ্যক কাজ। এতদিন আমাদের ধারণা ছিল, ইহার কোন ইতিহাস নাই। মুহম্মদ ফসীহ-এর 'মুনাজাৎ' আমাদের সে-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। বোধ হইতেছে, তিনিই সজ্ঞানে সর্বপ্রথম আরবী হরফের বাংলা প্রত্যক্ষরীকরণের রীতি অবলম্বন করেন। সংক্ষেপে তাঁহার প্রত্যক্ষরীকরণ-রীতি দেওয়া গেল :

আরবী অক্ষর কবি প্রদত্ত বাংলা নাম	কবি প্রদত্ত বাংলা প্রত্যক্ষর
—আলিপ	—আ, য় (শব্দাদ্যে)
—বেএ	—ব
—তেএ	—ত
—ছেএ	—ছ
—যীম	—য, জ
—হেএ	—হ
—খেএ	—খ, ক্ষ (শব্দাদ্যে)
—দাল	—দ
—জাল	—জ, য (শব্দাদ্যে)
—রেএ	—র
—যেএ	—য
—ছিন	—ছ, চ, স (র-ফলা সহ)
—সিন	—স, শ (এককভাবে শব্দাদ্যে)
—ছোয়াদ	—ছ
—জোয়াদ	—জ, য (শব্দাদ্যে)
—তোয়া	—ত
—জোয়া	—জ, য (শব্দাদ্যে)
—আইন	—আ
—গাইন	—গ
—পেএ, ফে	—ফ
—কাপ	—ক
—কাপ	—ক
—লাম	—ল
—মীম	—ম
—নুও	—ন
—ওয়াও	—ও
—হেএ	—হ
—লাম-আলিপ	—লা
—হামজা	—হ
—ইএ	—ই

কবি মুহম্মদ ফসীহ্ তাঁহার 'মুনাজাৎ নামক পুস্তিকা কখন রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া মরহুম আব্দুল করীম সাহিত্য-বিশারদ সাহেব তাঁহার 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণী'র পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন যে, কবি ১০৫৭ মঘী অর্থাৎ ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মুনাজাৎ'-টি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি পুঁথির পাণ্ডুলিপি হইতে কোন উদ্ধৃতি দেন নাই। আমরা যে পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া ইহা লিখিতেছি তাহাতে রচনার কোন তারিখ নাই। আমাদের মনে হইতেছে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ এই পুস্তিকাটির রচনার তারিখ নহে, ইহা পাণ্ডুলিপির তারিখ।

মুহম্মদ ফসীহ যে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী লোক, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। তিনি কাব্যে তাঁহার গুরুর নাম উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"হজরত মিরের পদ কবি সিরতান (সুলতান)
যথেক সাধক মধ্যে সেই সে প্রধান
আওলিয়া আম্বিয়া যথ পির যে ফকির।
প্রণামি সে সব পদ রাখি মোর সির॥***
মোহাম্মদ ফছিয়ে কহে শুন বন্ধুগণ।
ঘরের প্রদীপ সম সেই মহাজন॥"

কবি মুহম্মদ ফসীহ্ কবি বর সয়্যিদ সুলতানের শিষ্য ও কবি মুহম্মদ খানের সমসাময়িক ছিলেন। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে মুহম্মদ ফসীহ্-এর জীবন-কাল ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুমান করা চলে।

কবি মুহম্মদ ফসীহ্-এর 'মুনাজাৎ'-টি চমৎকার। ইহাতে ভক্তের আত্মনিবেদন নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ সলিল-প্রবাহের মত বেগবান হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই আত্মনিবেদনের প্রতিটি চরণে জ্যোতিষ্মান হীরক খণ্ডের মত 'ইমানদারী' ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

আলিফ

আলিফে আল্লার নাম মনে করি সার।
আওয়ালে আখেরে প্রভু তুমি সে নিস্তার॥
অনাদি-নিদান প্রভু নির্বলীর বল।
অনাথের নাথ তুমি এ মহি-মণ্ডল॥

বেএ

বারিতালা নাম ধর রহ নিরাকার।
বিনি (বাবি) লক্ষ্যে রাখিয়াছ সয়াল সংসার॥
বুদ্ধি করি চাহিলাম গহীন কাননে।
বিনি প্রভু আর কেহ নাহি সেই স্থানে॥

তেএ

তৈয়ব শরীর প্রভু তুমি বিনা নাই।
তরাইবা ভয় হন্তে তুমি সেই ঠাঁই॥
তওবা তওবা মুঞি করি বারে বারে।
ত্যাজিলাম পাপ কর্ম খেমহ আমার॥***

হেএ

হা হা প্রভু নিরঞ্জন অনাদি-নিদান।
হারাইলে তোমা নাম করাইবা স্মরণ॥
হিন হই না রহিমু যেন পদতল।
হইয়া মাবন-কুলে জনম বিফল॥

ইএ
ইব্লিছ বসাই ফাঁদ রহে রাত্রি দিবা।
ইহার সঙ্কট হন্তে প্রভু উদ্ধারিবা॥
ইয়াদ হামিষা করি কহিতে সাক্ষাৎ
ইতি সমাপ্ত এবে মোর মুনাজাত॥

৬। **মুহম্মদ জান** :— মুহম্মদ জান অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার 'নমাজ-নামা' বা 'নমাজ-মাহাত্ম্য' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পাণ্ডুলিপির তারিখ ১২১৪ মঘী বা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার একশত বৎসর পূর্বে কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করিলেও ক্ষতি নাই। তাঁহার কাব্যের পাণ্ডুলিপিটি 'আরবী হরফে' লিখিত। কবিও ইহা 'আরবী হরফে'ই লিখিয়াছিলেন। তিনি পুঁথিটির উপসংহারে লিখিয়াছেন :

"আর এক কথা কহি শুন বন্ধু জন।
আরবী অক্ষুলে যদি বাংলা লিখন॥
বুঝি সুজি কার্য্য কৈলে পাপ ঘোরতর
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর॥"

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ধর্ম-কথা বাংলা-ভাষায় বলা যায়, এই মত গৃহীত হইয়াছে, অথচ ধর্ম-কথা বাংলা হরফে লেখা যায়, এই কথাটি তখনও গৃহীত হয় নাই। তবে তাহা যে গৃহীত হইতে চলিয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে।

৭। **ফকীর গরীবুল্লাহ** :— ইনি পশ্চিম বঙ্গের কবি এবং হুগলী জেলার বালিয়া পরগনার লোক। তিনি এই কয়খানি কাব্য লিখেন :— (ক) ইউসুফ-জলিখা : (খ) সত্যপীর এবং (গ) মক্তুল হোসেন বা জঙ্গনামা (অসম্পূর্ণ)।

ইহার কোন কাব্যে সন তারিখ পাওয়া যায় নাই। তবে, মুহম্মদ ইয়াকুব নামক আর এক কবি গরীবুল্লার 'জঙ্গনামা' সম্পূর্ণ করেন। ইহাতে তারিখ আছে (পরে দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গরীবুল্লাহ্ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম 'শাহ দুন্দী'।

৮। **মুহম্মদ ইয়াকুব** :— ইনি চব্বিশ পরগনা জেলার বশীরহাট মহকুমার অন্তর্গত জিরিকপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তবে, অজ্ঞাত কারণে হুগলীর বালিয়া পরগনায় তিনি প্রবাসি জীবন যাপন করেন। এইখানেই তাঁহার সহিত ফকীর গরীবুল্লার পরিচয় হইয়া থাকিবে। 'জঙ্গনামা'র প্রথম অংশ গরীবুল্লার রচনা এবং শেষাংশ মুহম্মদ ইয়াকুবের রচনা। তবে, ইয়াকুবের রচনাই বেশী। এই পুস্তক রচনার শেষাংশে ইয়াকুব এই তারিখ দিয়াছেন :

"বাংলা এগার শত এক সাল আর।
মাঘ মাসের জুমাবার সময় ফজর॥
আল্লার মেহেরে আর নবীজীর তোফেলে।
জঙ্গনামা সায় হৈল এয়াকুবেতে বলে॥"

বাংলা 'এগার শত এক সাল' অর্থাৎ ১১০১+৫৯৩ = ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই 'জঙ্গনামা' একটি বিরাট পুস্তক। কবি লিখিয়াছেন :

"ফারসী কিতাব ছিল মক্তুল হোসন।
তাহা দেখি করি আমি বাংলা রচন॥"

৯। **শেখ মনসুর** :— ইনি চট্টগ্রামের কবি। ইঁহার রচিত পুস্তকের নাম 'সির নামা'। ইহা 'আসরারু-ল্-মসা' বা 'বীর্য-রহস্য' নামক কোন ফারসী পুস্তকের সার সংকলন। কবি বলিয়াছেন :

"আছারল মসা এক কিতাব উপাম।
ছির-নামা রাখিলাম পুস্তকের নাম॥"

কবি পুস্তক রচনার তারিখ দিয়াছেন এভাবে—

"যত হৈল মঘী সন লও পরিমাণি।
এক পরে শূন্য ছয় পাঁচ দিয়া গণি॥"

ইহা ১০৬৫ মঘী যোগ ৬৩৮—১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি 'শেখ' বংশীয় ছিলেন এবং কাজীগিরি তাঁহার পিতার পেশা ছিল। তাঁহার পিতার নাম কাজী ঈসা।

(১) কহয় মনছুর কাজী ইছার তনয়।
ভোরমতি হৈয়া জীবন কৈলু খয়॥

(২) গুণিগণ পায়ে কহে শেখ মনছুরে।
অশুদ্ধ পাইলে শুদ্ধ করিবা চতুরে॥

কাব্যটিতে শুধু 'বীর্য-রহস্য' নহে, আরও বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। মারফতী তত্ত্ব-কথাও কম নাই। ইহা নয়টি 'ফসল' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলিতে কি কি বিষয় সন্নিবিষ্ট, তাহা কবি পুস্তকের গোড়ায় বলিয়াছেন।

"প্রথম ফছলে কহি দর্বেশী কথন।
যেমন কিতাবে আছে শুন দিয়া মন॥
দ্বিতীয়ে কহিয়া দিমু যত এবাদত।
একে একে দিমু যত শাস্ত্র মত॥
তৃতীয়ে কহিয়া দিমু তনের বিচার।
কিতাবেতে কহিয়াছে যেমত প্রকার॥
চতুর্থেতে কথা যত রাবির বয়ান।
একে একে কহি দিমু তার পরিমাণ॥
পঞ্চম ফছলে যত দিলের বিচার।
যেমতে যাহার দিল কহি দিব সার॥
ষষ্ঠমে কহিব শুন রাবির কথন।
বিচার করিয়া দিব তার বিবরণ॥
সপ্তম ফছলে শুন মনির কথন।
চন্দ্ররে বলয়ে 'মনি' আরবী বচন॥
চন্দ্র, রিতু, মনি, নোৎফা, শুক্র, বীর্য্য, পানি।
একই রিতুরে কহে এত ভাষখানি॥
অষ্টমে কহিব যত আরোয়ার বাণী।
আরোয়ার যত গুণ কহি দিব শুনি॥

নবম ফছলে আছে ছির্রে নিরঞ্জন।
প্রচারিতে আজ্ঞা নাই গোপত বচন॥"

ইহা হইতে শুধু পুস্তকটির বিষয়-বৈচিত্র্য নয়, ইহার আকার সম্বন্ধেও ধারণা জন্মিবে। প্রকৃতপক্ষে, ইহা একটি 'দর্বেশী' গ্রন্থের মহাকোষ।

১০। **মুহম্মদ উজীর আলী** :– চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত 'চারিয়া' (চট্টগ্রামী উচ্চারণে 'চাইর্গ্যা' বা 'চাইজ্জ্যা') গ্রামে (কবির কথায় 'চারিয়া নগরে') কবির জন্ম হয়। ইঁহার 'শাহনামা' বা 'নসল-ই-উস্মান-ইসলামাবাদ' গ্রন্থখানি কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা নাজির আলীর আদেশক্রমে রচিত হয়। এই নাজির আলী সাহেবই ফটিকছড়ি থানার শেষ-দক্ষিণ ও হাটহাজারী থানার শেষ-উত্তর সীমায় অবস্থিত বিখ্যাত বাজার 'নাজিরহাট' স্থাপন করেন। পুস্তকটির আরম্ভ ও শেষ তারিখ কবি এইরূপ লিখিয়াছেন :

লেখি শুন গুণিগণ, চলিত হিজরী সন,
যেই দিন শুরু কবিতার॥
রাম, চন্দ্র, যুগ, বাণ, হিজরীর পরিমাণ,
মাহিনা কুমারী পঞ্চদশ।
স্মরণ করিয়া গুরু পুস্তক হইল শুরু
গাহে কবি পয়ার সুরস॥

ইহা হইতে ১১৪৫ হিজরী অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দেই পুস্তক রচনা আরম্ভ হয়। ইহার রচনা শেষ করিতে কবির আরও সাত বৎসর আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি বলেন–

"সহস্রেক শত রাম চন্দ্র হিজরীতে।
গ্রন্থ হইল শেষ মকর দধিতে॥"

ইহা হইতে ১১৩১ হিজরী অর্থাৎ ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, 'রাম' 'তিন' ও 'এক' উভয় সংখ্যাই বুঝায়। কবি এই উভয় অর্থেই 'রাম' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অধিকন্তু 'কুমারী মাস' কার্তিক মাস বুঝায়, সুতরাং রচনা আরম্ভ হইয়াছিল ১৫ই কার্তিক আর শেষ হইয়াছিল মকররাশির পঞ্চমী তিথিতে, কেননা 'দধি' সপ্ত সমুদ্রের অন্তর্গত পঞ্চম সমুদ্র।

ইহা সুদীর্ঘ কাগজে লেখা আছে, তাহা পাঠ ও বিশ্লেষণ করিবার শক্তি ও সময় আমাদের নাই। কতগুলি কাহিনী এইরূপ :

ইসলামাবাদের বয়ান, শাহজাদা নাজির আলীর সুকৃতির বয়ান, তওয়ারিখ কিতাবের খোলসা বিবরণ, তওয়ারিখ উসমানী নসলের নাম প্রকাশ, মুহম্মদী খিলাফৎনামা কিতাবের বিবরণ, কদাদ শহরের তারিফ, এক বাঁদীর নসীহতে শাহ্ বদরুদ্দীনের তপারম্ভ, বদর ঔলিয়ার তপসাধনের কথা, ইসলাম খাঁর পরীস্তান আবাদ, হাসন বসরীর শাহ্ হইবার বয়ান, হজরত আলীর বাদশাহ্ হইয়া ইসলামাবাদে ভ্রমণ করিবার বয়ান, গোপীচন্দ্রের রায়বার আসিয়া শাহার নিকট কর চাহিবার বয়ান, ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে গোপীচন্দ্রের যুদ্ধে সাজিয়া আসিবার বয়ান, দুই নৃপতির যুদ্ধ বর্ণনা, শাহার যুদ্ধ জয় করিবার বয়ান, গোপীচন্দ্র যুদ্ধ ফতে করিয়া এক পুত্রকে

ইসলামাবাদের পাটে বসাইবার বয়ান, সুলতান আসকারী ইসলামাবাদে রায়বার পাঠাইবার বয়ান, শাহা পুত্রকে রাজ্য দিয়া ইসলামাবাদ হইতে ঢাকায় পৌছিবার বয়ান, হরিশ্চন্দ্রের নিকট সম্রাটের পত্র লিখিবার বয়ান, দুই নৃপের যুদ্ধ বর্ণনা, ইসলামাবাদে নসরত জঙ্গের নায়েবী করিবার বয়ান, শত্রু-বাক্যে দিল্লীশ্বর নবাব নসরত জঙ্গকে বধ করিবার বয়ান, ফিরিঙ্গীরা ছলনা করিয়া শাহা হইতে ইসলামাবাদ মাগিয়া লইবার বয়ান, ফিরিঙ্গীরা ফেরেব করিয়া দিল্লীশ্বরকে কয়েদ করিবার বয়ান, মান রাজার সহিত যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবি উজীর আলীর আরও একখানা কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম 'সায়াৎকুমার'। ইহা কাহিনী-কাব্য।

১১। **শেখ সাদী** :– ইঁহাকে ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। ইঁহার পুঁথির পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরা জেলা হইতেই সংগৃহীত। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'গদা-মল্লিকা'। ইহা উপাখ্যান-গ্রন্থ হইলেও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে নানা তত্ত্ব প্রকাশ করাই গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য। একখানি পুঁথিতে এইভাবে রচনার তারিখ দেওয়া আছে :

"পড়িয়া বুঝিবা সব শাস্ত্রের উদ্দেশ।
একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ॥
এহি পুস্তক সমাপ্ত হইল॥"

তাহা হইলে পুস্তকটি ১১২২ বাংলা সনে অর্থাৎ ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। গল্পটি এইরূপ :

রুম-রাজকুমারী মল্লিকা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক সহস্র প্রশ্নের যিনি উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। অতঃপর, মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় চতুর্দিক হইতে কত রাজকুমার মল্লিকার পাণিপীড়ন করিতে আসিতে লাগিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কেহই তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারিলেন না বলিয়া–

"মল্লিকায় সে সবেরে বন্দিতে রাখিল।
লজ্জা দিয়া কত জনে মারি খেদাইল॥"

পরিশেষে তুরস্ক হইতে আবদুল হালীম নামক এক 'গদা' অর্থাৎ দরবেশ আসিয়া সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন ও রাজকন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করিয়া বহুদিন রুম-রাজ সিংহাসনে বসিয়া সুখে রাজ্য শাসন করিলেন।

১২। **হায়াত মাহমুদ** :– ইনি মুঘল আমলের শেষ এবং শক্তিশালী কবি। রংপুর জেলার 'ঘোড়াঘাট' সরকারের 'সুলুঙগার-বাগ্দান' পরগনার 'ঝাড়-বিশিলা' গ্রামে কবির জন্ম হয়। এই 'ঝাড়-বিশিলা' গ্রাম রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত। তাঁহার পিতার নাম শাহ্ কবীর; তিনিও একজন কবি এবং ঘোড়াঘাট সরকারের দেওয়ান ছিলেন। এ-পর্যন্ত তাঁহার চারিখানা পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটিতেই রচনার তারিখ পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলির নাম ও তারিখ এইরূপ :

(ক) জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব	১১৩০ বাংলা	১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ
(খ) চিত্ত উত্থান বা সর্বভেদ	১১৩৯ বাংলা	১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ
(গ) হিতজ্ঞান-বাণী	১১৬০ বাংলা	১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ

(ঘ) আম্বিয়া-বাণী ১১৬৫ বাংলা ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ

কবির 'জঙ্গনামা' বা 'মহরম-পর্ব' কারবালার বিষাদময় কাহিনী লইয়া রচিত। মুসলমানদের নিকট সমগ্র কাহিনীটিই করুণ। এই করুণ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কবি জিবরাঈল ফিরিশতার জবানীতে হজরত মুহম্মদ মুস্তফার (দ:)-সম্মুখে তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র হাসন হুসৈন (রা:)-এর ভাবী শোচনীয় পরিণাম, বিষ-পেয়ালা পানে হাসনের মর্ম-বিদারী কাতরধ্বনি ও মৃত্যু, কাসিমের নব-বধূ সকীনার অকাল-বৈধব্যে বিলাপ, কারবালা প্রান্তরে কাফিরের তরবারী তলে তৃষ্ণাকাতর ইমাম হুসেনের নির্মম শিরচ্ছেদ প্রভৃতি যে-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মূল করুণ কাহিনীটিকে আরও করুণ আরও হৃদয়স্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে।

কবির 'চিত্ত-উত্থান বা সর্বভেদ' সংস্কৃত 'হিতোপদেশের' ফারসী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত কাব্য। ইহাতে 'হিতোপদেশ' পুস্তকের গল্প বর্ণিত। কবি বলিতেছেন :

"সর্বভেদ নামে পুঁথি, শ্রম করি দিবারাতি,
বিরচিনু ছাড়িয়া আলিস।
কহি সে সালের কথা, যাতে বিরচিনু পোথা,
সান এগার শও উনচল্লিশ॥"

কবির 'হিতজ্ঞান-বাণী' নানা মুসলিম তত্ত্ব-কথার এক চমৎকার ভাণ্ডার। কবির মতে, ইহাতে 'দীনের কাহিনী' বিবৃত হইয়াছে। তিনি তখন বৃদ্ধ। তাই তিনি বলেন,—

"বৃদ্ধ যোগে ভাবি অতি, বিরচিনু এই পুঁথি,
সন এগার শও ষাট সালে।
পড়িয়া শুনিয়া সবে, আশীর্বাদ করে যবে
মোর গতি হয় অন্তকালে॥"

কবি এই কাব্য-বন্দনার পর ওয়াজের বয়ান, এক শত ত্রিশ মসলার বয়ান, ফরজ নমাজের বয়ান, কেয়ামতের বয়ান প্রভৃতি ধর্মীয় নানা কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হজরত মুহম্মদের (দ:) জন্মের কথা বলিতে গিয়া কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় সুফীদেরই মত, ইসলামের শাস্ত্রীয় মত নহে। তাঁহার উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

"আহাদ হইতে আল্লা কৈল আহমদ।
মিমাধিক্যে পূর্ণ সেই কৈল মহম্মদ॥
আহাদ আহমদ দুই এক করি জান।
মিমে মহম্মদ শেষে কৈল উৎপাদন॥***
এইত মিমের মর্ম কহিব আর।
বুঝিয়া লইবা গুরু-জ্ঞান থাকে যার॥
সকলের পায়ে করি মিনতি বিনয়।
হায়াত মামুদে কহে কবির তনয়॥"

'আম্বিয়া-বাণী' কবির শেষ কাব্য। ইহার পরে তিনি আর কোন কাব্য লিখিতে পারেন নাই। কারণ, তখন তিনি একেবারেই বৃদ্ধ। তিনি বলেন,—

"সন এগার শও পঁয়ষট্টি বৎসরে।
রচিনু আম্বিয়া বাণী এত সনান্তরে॥
কেহ কেহ কহে মোরে এসব রচিতে।
শেষকালে এত শ্রম করিনু সে মতে॥
একে শেষ কাল আর বিষম জঞ্জাল।
তথাপি রচিনু যদি কেহ বোলে ভাল॥"

ইহাতে হজরত আদম, শীশ, নূহ, ইবরাহীম খলীল, ইদরীস, সালিহ, ইসমাইল, ইসহাক ও হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (দ:)-এর কথা বর্ণিত আছে। আবু জিহল্-এর জঙ্গ পর্যন্ত আসিয়া কাব্য শেষ হইয়াছে। এই কাব্য বর্ণনার রীতি শুরু হইয়াছে নূর-ই-মুহম্মদীর সৃষ্টি হইতে। এই 'নূর-ই-মুহম্মদী' একের পর এক করিয়া নবী পরম্পরায় আসিয়া বীবী আমিনাকে আশ্রয় করে। তৎপর হজরত মুহম্মদের (দ:) জন্ম হয়। কিভাবে ইহা ধারাবাহিকভাবে চলিয়াছিল, তাহা হজরত ইসমাইলের (আ:) জন্ম বর্ণনা হইতে বিশদভাবে বুঝা যাইবে। ইহা এইরূপ :—

"ছারা যদি হাজিরাকে দিল সেই রাতি।
খলীল তাহার সঙ্গে ভুঞ্জিল সুরতি॥
মহাম্মদী নূর গেল তাহার উদরে।
খলীল শ্রীহীন হৈল নিজ কলেবরে॥
হাজিরার রঙ্গ রূপ জ্বলিতে লাগিল।
বিহানে দেখিয়া ছারা স্বামীকে পুছিল॥"

এইখানেই আমাদের বর্তমান আলোচনা শেষ করা যাক। মুঘল আমলে মুসলমান কবি ও কাব্যের সংখ্যা এত বেশী যে, তাহার সম্যক পরিচয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু এ-বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন সত্যকার গবেষণাও হয় নাই। তথাপি, এখানে যে-সমস্ত কবির কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, তাহা হইতেই মুঘল-আমলের মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিবে। যেই সাংস্কৃতিক পটভূমিতে এই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই যুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রভাব সুস্পষ্ট।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুঘল-আমলে প্রত্যন্ত-প্রাদেশিক বাংলা-সাহিত্য

মুঘল-আমলে মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। এই সময়ে মুঘল-সাম্রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত দুইটি স্বাধীন প্রত্যন্ত-প্রাদেশিক রাজ্যেও মুসলিম বাংলা সাহিত্যের বিশেষ চর্চা হয়। এই দুইটি রাজ্যের নাম 'রোসাঙ্গ' ও 'ত্রিপুরা'। রাজ্য দুইটি মুঘল-আমলের শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখিলেও, মুঘলযুগের সাংস্কৃতিক প্রভাবে ভরপুর ছিল। এই দুই রাজ্যে এখনকার মতো তখনও বাংলাভাষী মুসলমানের সংখ্যা ছিল অনেক। কতকটা যুগধর্মের প্রভাবে এবং কতকটা বাংলাভাষী মুসলমানের সংখ্যাধিক্যে রাজ্য দুইটিতে ফারসী ও বাংলা-ভাষার প্রভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়।

বলিতে কি, এই দুই রাজ্যের মুসলিম বাংলা-সাহিত্য-চর্চা এতই ব্যাপক ও মূল্যবান যে, মুঘল-আমলের মুসলিম বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই রোসাঙ্গ ও ত্রিপুরার বাংলা-সাহিত্য-চর্চার কথা কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। মুঘলেরা বাংলাদেশে বাংলা-সাহিত্য-চর্চার জন্য সাক্ষাৎভাবে যাহা করেন নাই, রোসাঙ্গ ও ত্রিপুর-রাজগণ তাহা করিয়াছিলেন। আমরা রোসাঙ্গ ও ত্রিপুরার বাংলা-সাহিত্যের কথা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(ক) রোসাঙ্গ-রাজসভায় বাংলা-সাহিত্য

আধুনিক 'আরাকানের' প্রাচীন নাম 'রোসাং' বা 'রোসাঙ্গ'। আরাকানীরা ইহাকে'রখইং তংগী' বা 'রাক্ষস-ভূমি' নামে অভিহিত করে। ইহা সংস্কৃত 'রক্ষ-তুঙ্গ' বা 'রাক্ষসদের উচ্চ-মঞ্চ' কথার অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। 'রক্ষ' শব্দ বাংলায় 'রকখ' রূপে উচ্চারিত হয়। বাংলা-উচ্চারণে এই ভঙ্গী প্রাকৃত-ভাবাপন্ন। বাংলা 'টং' বা 'টঙ্গী' সংস্কৃত 'তুঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। 'টং' শব্দ অনার্য হওয়াও বিচিত্র নহে। আরাকানী 'ইং' বা 'ঈ' প্রত্যয় যোগ 'রখইং তইংগী' সংস্কৃত 'রক্ষতুঙ্গ' হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করার পক্ষে ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি আছে। এই 'রখইং' শব্দের ইংরেজী অপভ্রংশ 'আরাকান'।

মুঘল-আমলে আরাকান-রাজ্যের সীমা নির্ণয় কঠিন। সময়ে সময়ে হাত বদলাইলেও, সমগ্র চট্টগ্রামের অধিকাংশ স্থান, বিশেষ করিয়া কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ-তীরবর্তী ভূ-ভাগ, মুঘলযুগের শেষ দিক পর্যন্ত রোসাঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র চট্টগ্রামে এখনও যে 'মঘী সন' প্রচলিত তহিাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, চট্টগ্রামে আরাকানী প্রভাব কত গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। এই চট্টগ্রাম হইতেই আরাকানে বাংলা-ভাষার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। এখনও আরাকানী মুসলমানেরা বাংলা ও বর্মী এই দুই ভাষায় সমান পারদর্শী।

আমরা 'আরাকান রাজ-সভায় বাংলা-সাহিত্য' নামক পুস্তকে দেখাইয়াছি যে, রোসাঙ্গ-রাজ মহতৈং চন্দয় (Mahatoing Tsandaya) (৭৮৮–৮১০ খ্রী:) বা মহৎ-চন্দ্র যখন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন হইতে রোসাঙ্গে আরবী বণিক সম্প্রদায় স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহাদের দ্বারাও রোসাঙ্গে খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতে ইসলাম প্রচারিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই ভাগ্যচক্রে রোসাঙ্গ-রাজগণ মুসলিম-প্রভাবকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হন। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোসাঙ্গ-দেশ গৌড়ের করদ রাজ্যরূপেও আপন অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই সময়ে গৌড়ের মুসলমানগণ 'ম্রোহৌং' (Mrohaung) বা বর্তমান 'মুরং' শহরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারা যে বাংলা ভাষাভাষী ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আরও দেখা যায়, ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর যাবৎ স্বাধীন রোসাঙ্গ-রাজগণ তাঁহাদের মুদ্রায় 'কলিমা শাহ', 'সিকান্দর শাহ', 'সলীম শাহ', 'হুসৈন শাহ' প্রভৃতি মুসলিম উপাধি স্বীয় আরাকানী নামের সহিত ব্যবহার করিতেছেন। এই দুইশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের (মুঘল-পাঠান) মুসলিম রাজশক্তির সহিত স্বাধীন আরাকান রাজগণের মোটেই সদ্ভাব ছিল না, অথচ তাঁহারা দেশে মুসলিম-রীতি ও আচার মানিয়া আসিতেছিলেন।

ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে মনে হয়, আরাকানী মঘ-সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার-ব্যবহার হইতে বঙ্গের মুসলিম-সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার-ব্যবহার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ছিল বলিয়া আরাকানী-রাজগণ বঙ্গের মুসলিম প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রধানমন্ত্রী (মহাপাত্র, মুখ্যপাত্র বা মহামাত্য), অমাত্য (পাত্র), সমর-সচিব (লস্কর-উজীর), কাজী বা দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারক, প্রভৃতি সমস্ত উচ্চপদে মুসলমান অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না। বোধ হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাপার বলিয়াই, তাঁহাদের অভিষেক ক্রিয়া মুসলিম প্রধানমন্ত্রীর দ্বারাই সুসম্পন্ন হইত। আরাকান-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার (১৬৫২–১৬৮৪) অভিষেক 'নবরাজ' উপাধিক প্রধানমন্ত্রী মজলিস কর্তৃক কিভাবে সম্পন্ন হয়, তাহার বিবরণ কবি আলাওলের ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সুচারু রোসাঙ্গ স্থান, নানাজাতি শোভমান,
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম নরপতি।
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত, ব্রতকর্মে সুরচিত,
খলনাশ দুঃখিতের গতি॥***
হেন ধর্মশীল রাজা অতুল মহত্ত্ব।
মজলিস নবরাজ তান মহামাত্য॥
রোসাঙ্গ দেশেতে আছে যত মুসলমান।
মহাপাত্র মজলিস সবার প্রধান॥
মজলিস পাত্রের মহত্ত্ব শুন এবে।
নরপতি স্বর্গ আরোহণ হৈল যবে॥
যুবরাজ আইসে যবে পাটে বসিবারে।
দণ্ডাইল পূর্ব মুখে তক্তের বাহিরে॥
মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আবরণ।

সম্মুখে দণ্ডাই করে দড়াই বচন॥
"পুত্রবৎ প্রজারে পালিবে নিরন্তর।
না করিবে ছল-বল লোকের উপর॥
শাস্ত্র-নীতি রাজকার্য্যে হৈবে ন্যায়বন্ত।
নির্ব্বলীরে বলী না করৌক বলবন্ত॥
দয়াল চরিত্র হৈবে সত্য ধর্ম্মবন্ত।
সুনজরে সন্তোষিবে নাশিবে দুরন্ত॥
ক্ষমা-ধর্ম্ম আচরিবে, চঞ্চল না হৈবে।
পূর্ব্ব অপরাধে কারো মন্দ না করিবে॥"
আরো নানাবিধ প্রকাশন্ত রাজনীতি।
সত্য করিয়া যদি দড়াইল নৃপতি॥
প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করয়।
শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণাময়॥

– (সেকান্দর-নামা)

ইহা হইতে দেখা যাইবে, আরাকানের রাজসভা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুসলিম প্রভাবে ভরপুর ছিল। এই প্রভাব ধর্মীয় হউক বা না হউক, সাংস্কৃতিক প্রভাব তো বটেই। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই প্রভাব চরমে উঠে।

বলা বাহুল্য, আরাকানে যে মুসলিম প্রভাব বিস্তৃতিলাভ করে, তাহা প্রধানতঃ বঙ্গীয় মুসলিম-প্রভাব। ইহার ফলে, বঙ্গের বাহিরে স্বাধীন আরাকানে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠার মূলে আরাকানী অপকর্ষ এবং বাংলা-ভাষার উৎকর্ষও কার্যকর হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু, আরাকানের বাংলাভাষী সভাসদগণের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট না হইলে এবং তথাকার বিদ্বজ্জনের উৎসাহ লাভ না করিলে এই প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইত না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গ-রাজের যেসকল মুসলমান সভাসদ্ বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় স্বজাতীয় কবিকে নিয়োজিত করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীসুধর্ম রাজার (Thiri Thudhamma Raja) (১৬২২–১৬৩৮ খ্রী:) সমরসচিবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রীসুধর্মের রাজ্য ঢাকা হইতে পেগু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইঁহার 'লস্কর-উজীর' অর্থাৎ সমর-সচিব ছিলেন আশরফ খান। তাঁহারই আদেশে কবি দৌলত কাজী তাঁহার 'সতী ময়না' কাব্য রচনা করেন। আশরফ খান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বর্তমান হাটহাজারী থানার 'চারিয়া' গ্রামে তাঁহার বিরাট পাকা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এবং একটি দীর্ঘিকা আজিও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। রাউজান থানার অন্তর্গত 'কদলপুর' গ্রামে 'লস্কর উজীরের দীঘি'ও এই আশরফ খানের অন্যতম কীর্তি।

আরাকান-রাজ শ্রীসুধর্ম রাজার রাজত্বকালে আরও একজন মুসলমান কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার নাম 'মরদন' এবং তাঁহার কাব্যের নাম 'নসীরা-নামা'। শ্রীসুধর্ম রাজার পরে, নৃপতিগিরি বা নৃপগিরি (Narabadigy[1]) (১৬৩৮–১৬৪৫ খ্রী:) আরাকানের রাজা হইলেন। এই সাত বৎসর আরাকানে রাষ্ট্রবিপ্লব ও গৃহ-বিবাদ চলিতে থাকে। ফলে, ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভূভাগ আরাকান-রাজের হস্তচ্যুত হয়। দেশের

এই অরাজকতা ও অশান্তির সময় কোন সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, এই সময়ের কোন সাহিত্যিক নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু, পরবর্তী রোসাঙ্গ-রাজ সাদ উমাদার বা ছদো উমংদার (Thado Mintar) (১৬৪৫–১৬৫২)-এর রাজত্বকালে তাঁহার 'মুখ্যপাত্র' বা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষপুটে থাকিয়া মহাকবি আলাওল তাঁহার অমর কাব্য 'পদ্মাবতী' রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রধানমন্ত্রীর নাম 'মাগন ঠাকুর'। 'ঠাকুর' আরাকানী রাজাদের মহাসম্মানিত উপাধি। মাগন কোরেশ বংশ-সম্ভূত মুসলমান ছিলেন। তিনিও স্বয়ং একজন কবি ছিলেন। তাঁহার 'চন্দ্রাবতী' নামে একখানা কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সাদ উমাদারের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র চন্দ্র সুধর্ম (Thanda Thudhamma) (১৬৫২–১৬৮৪ খ্রী:) রোসাঙ্গের রাজা হইলেন। তখনও কোরেশী মাগন প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যপাত্র) এবং মহাকবি আলাওল মাগনের আশ্রয় ও অনুকম্পাপুষ্ট হইয়া কাব্যের পর কাব্য রচনায় বিভোর। মাগনের মৃত্যুর পর সুলেমান নামক আর একজন মুসলমান চন্দ্র সুধর্মের 'মহাপাত্র' বা প্রধানমন্ত্রী হইলেন। এই সময়ে সয়্যিদ মুহম্মদ চন্দ্র সুধর্মের সমর-সচিব ছিলেন। মহাকবি আলাওল ইঁহার আদেশেই 'সপ্ত পয়কর' কাব্য রচনা করেন। এই সময়ে মজলিস নামক অন্য এক ব্যক্তি চন্দ্র সুধর্মের রাজ-সভায় 'নবরাজ' ছিলেন, ইনি 'নবরাজ মজলিস' নামেই পরিচিত। আলাওল ইঁহার আদেশেই 'সিকান্দর নামা'র পদ্যানুবাদ করেন। চন্দ্র সুধর্মের আর এক মন্ত্রীর (পাত্রের) নাম সয়্যিদ মুসা। আলাওল তাঁহার আদেশে 'সয়ফুল-মুলুক' রচনা করিয়াছিলেন।

এইভাবে আরাকানে যে সাহিত্য-চর্চা চলিল, তাহা মহাকবি আলাওলের তিরোধানের সহিত সমাপ্ত হয় নাই। তিনি সাহিত্য-চর্চার যে-পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই পথ লক্ষ্য করিয়া আরও বহু মুসলমান কবি আরাকানে বাংলা-সাহিত্য চর্চায় অগ্রসর হইয়া থাকিবেন। অতীতের গর্ভে তাঁহারা বিলীন হইয়া গেলেও, কালের অন্ধ-যবনিকা ভেদ করিয়া আজও আলাওলের অধ্যাত্ম-উত্তরাধিকারীদের মধ্য হইতে অন্ততঃ একজন কাব্য-কীর্তি লইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নাম আবদুল করীম খোন্দকার। তিনি ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুল্লা-মজলিস' নামে একখানা বিরাট কাব্য রচনা করেন। আরাকানের রাজধানী মুরুং বা ম্রোহং (Mrohaung) নগরীতে বসিয়া রাজার এক অমাত্যের আদেশে কবি আবদুল করীম এই কাব্য লিখিয়াছিলেন।

উপরে আরাকানে বাংলা-সাহিত্য-চর্চার যে-ধারা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যাইবে। এইবার আমরা এই দেশের বাংলা-সাহিত্য-চর্চার বিশিষ্ট ধারণা প্রদান করিতেছি : –

১। **দৌলত কাজী** (আনুমানিক ১৬০০–১৬৩৮) :– আরাকানের রাজসভার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় যাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের চর্চা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দৌলত কাজীই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম। তিনি চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তীতে প্রকাশ, কবি অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অর্বাচীনতার অজুহাতে দেশের কোন পণ্ডিত তাঁহার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি না দেওয়ায়, কবি বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করেন এবং আরাকানের রাজসভায় গুণী ও জ্ঞানীর সমাদর হয় বলিয়া জানিতে পারিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি লাভের আশায় তথায় গমন করেন। যথা

সময়ে আরাকান রাজসভা তাঁহাকে বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি দান করে এবং রোসাঙ্গ-রাজ শ্রী সুধর্মের (১৬২২-১৬৩৮ খ্রী:) সমর-সচিব আশরফ খানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া কবি তাঁহার কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কাব্যের পূর্ণনাম 'সতী-ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী; সংক্ষেপতঃ 'সতী-ময়না' অথবা 'লোর-চন্দ্রাণী'।

তাঁহার কাব্যখানি মোট তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডকে 'পরিচয় খণ্ড' বলা যায়। ইহাতে কবি কাব্যের নায়ক-নায়িকার পরিচয়-সূত্রে তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের ঘটনাবলী এবং দাম্পত্য-জীবনের নিষ্ফলতা ও অতৃপ্তির পূর্ণ আভাস দিয়াছেন।

কাব্যখানির দ্বিতীয় খণ্ডকে 'বিরহ খণ্ড' নাম দেওয়া যায়। এই খণ্ডে কাব্যের প্রধান নায়িকা ময়নাবতীকে বিরহানলে দগ্ধ করাইয়া কবি শোধিত স্বর্ণে পরিণত করিয়াছেন। এই খণ্ডেই ময়নাবতীর বিরহ ও তৎপ্রতি ছাতনের সহস্র প্রলোভনের চিত্র অঙ্কিত; এই দুই বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া কবির কবিত্ব-সুধা 'বারমাসী'র আকারে মন্দাকিনীধারার ন্যায় শতস্রোতে উৎসারিত।

তৃতীয় বা শেষ খণ্ডের নাম দিতে হয় 'মিলন খণ্ড'। ইহাতে ময়নাবতীর সহিত তাঁহার স্বামী লোর ও সপত্নী চন্দ্রাণীর মিলন ঘটে।

কবি প্রথম খণ্ডেই কাব্যের মিলনান্ত পরিসমাপ্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের 'বারমাসী'-র একাদশ মাস (আষাঢ় হইতে বৈশাখ) পর্যন্ত লিখিয়া কবি মৃত্যুমুখে পতিত হন। কাব্যখানি এইভাবে প্রায় কুড়ি বৎসর অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। অতঃপর পরবর্তী কবি আলাওল ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দৌলত কাজীর ইঙ্গিত মত মিলনান্ত করিয়া কাব্যখানি সমাপ্ত করেন।

দৌলত কাজী শুধু বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহেন, প্রাচীন বাংলার শক্তিমান কবিদের মধ্যেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অসাধারণ, তাঁহার শিল্প ও সৌন্দর্য-বোধ তীক্ষ্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। বাংলা ও ব্রজবুলি—এই উভয়বিধ ভাষায় তাঁহার ক্ষমতা তুলনাবিহীন। তিনিই বাংলা-ভাষায় একমাত্র কবি, যিনি হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম অবলম্বন না করিয়াও চমৎকারভাবে বাংলা ভাষায় 'ব্রজবুলি'র ব্যবহার করা যায়। তাহার সামান্য প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :–

ময়নাবতীর উক্তি

আয় ধাঞি কুজনী কি মোক সুনাওসি
বেদ উকতি নহে পাঠং।
লাখোঁ উপায়ে মিটাতে কো পারয়ে
যো বিহি লিখল ললাটং॥
মালিনী, বোলসি অনুচিত বাণী।
ধরম না চাওসি ত্যজি সতীত্ব মতি
লোর প্রেম করাওসি হানি॥
মোহোর সুনায়র মহাগুণ সায়র
মধুর মুরতি বেশং।
সো মধু ত্যজিয়ে কৈসে বিখ পানাও

ভাল ধাঞি কহ উপদেশং॥
তুহি বড় পাপিনী পাপ সুনাওসি
ধরম করাওসি বামং।
পাতক ঘাতক সম ধাঞি মোর চিন্তসি
জাতি কুল করসি নির্ণামং॥
দুরন্ত দুর্মতি দূতীপণা দূর কর
চিন্তহ মোহোর কল্যাণং।
কাজী দৌলত ভণে দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশরফ খানং॥

২। **মরদন** (আনুমানিক ১৬০০-১৬৪৫) :–দৌলত কাজীর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে মাত্র একজনের কাব্য পাওয়া যায়, তাঁহার নাম মরদন। তিনি দৌলত কাজীর মত প্রতিভাবান কবি ছিলেন না। তবে তিনি যে আরাকান-রাজ শ্রীসুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার একমাত্র কাব্য 'নসীরা-নামা' পাঠে বুঝিতে পারা যায়। এই কাব্যে কবি মুক্তকণ্ঠে রোসাঙ্গ-রাজ শ্রীসুধর্মের গুণকীর্তন করিয়াছেন। বোধ হয়, কবি রোসাঙ্গের 'কাঞ্চি' নামক নগরের অধিবাসী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন,–

"সে রাজ্যেতে আছে এক কাঞ্চি নামে পুরী।
মোমিন মুসলমান কত বৈসে সে নগরী॥
আলিম মৌলানা বৈসে, কিতাব কোরান।
কায়স্থ বসয়ে শেখ সৈয়দ পাঠান॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বসয়ে পণ্ডিত।
নানা কাব্য রস-কথা কহএ পুরীত॥

'নসীরা-নামা' একটি কাহিনী-কাব্য। কাহিনীটি মৌলিক। 'অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়'–এই কথাই কাব্যটির প্রতিপাদ্য বিষয়। আবদুল করীম ও আবদুল নবী নামক দুই বণিক-বন্ধু পরস্পর বৈবাহিক বা বেয়াই হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। আব্দুল করীমের কন্যার নাম 'নসীরা বীবী' এবং আবদুল নবীর পুত্রের নাম 'আবদুল সবীর'। ঘটনাক্রমে দুই হবু-বৈবাহিকের মধ্যে আবদুল করীমের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে এবং নসীরার সহিত সবীরের বিবাহের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে আবদুল করীম অপমানিত মনে করে। তাহার স্ত্রী স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া 'অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়' এই কথাটি গল্পের সাহায্যে অবতারণা করে। এইভাবে কাব্যটি গড়িয়া উঠিলেও পরে আব্দুল করীমের ভাগ্য ফিরিয়া যায় ও 'নসীরা'র সহিত 'সবীর'-এর বিবাহ হয়।

৩। **কোরেশী মাগন ঠাকুর** (আনুমানিক ১৬০০-১৬৬০) :– আমরা 'আরাকান রাজ-সভায় বাংলা-সাহিত্য' নামক পুস্তকে প্রমাণ করিয়াছি যে, মহাকবি আলাওলের আশ্রয়দাতা 'মাগন ঠাকুর' এবং 'চন্দ্রবতী' কাব্য প্রণেতা 'মাগন' বা 'কোরেশী মাগন' এক ব্যক্তি।

তিনি আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোরেশ বংশ-জাত সিদ্দীকী-গোত্রভুক্ত মুসলমান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল, জানা যায় না। 'মাগন' তাঁহার ডাকনাম

মাত্র। তাঁহার নিঃসন্তান মাতাপিতা আল্লার নিকট বহু আরাধনা করিয়া, আল্লার কাছ হইতে মাগিয়া তাঁহাকে লাভ করেন, এই জন্য তিনি 'মাগন' নামে অভিহিত হইতেন। স্বয়ং আলাওল মাগন ঠাকুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ন্যায় গুণবান মনীষী তৎকালে রোসাঙ্গে কেহ ছিলেন না। তিনি আরবী, ফারসী, বর্মী ও সংস্কৃত ভাষা জানিতেন। বাংলা-ভাষায় তাঁহার কতখানি অধিকার ছিল 'চন্দ্রাবতী' কাব্যই তাহার জ্বলন্ত নির্দশন। তিনি সঙ্গীত, নাট্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানেই পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তিনি তথায় সমাহিত হন। তখন সুলতান শাহ শুজা নিহত হইয়াছেন।

মাগনের 'চন্দ্রাবতী' একখানি কাহিনী-কাব্য। এই কাহিনীও রূপ-কথা-শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। –ভদ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র 'বীরভান' এই কাব্যের নায়ক। সরন্দীপ-রাজ বা সিংহলদ্বীপ-রাজ সুরপালের কন্যা 'চন্দ্রাবতী' এই কাব্যের নায়িকা। চন্দ্রাবতীর রূপের কথা ও বীরভানের শৌর্য-বীর্যের কথা পরস্পর জানিতে পারিয়া নায়ক-নায়িকা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। অতঃপর, নায়কের পক্ষ হইতে নায়িকা লাভের অভিযান আরম্ভ হয়। 'জালিয়া', 'গোরাব', 'ডিঙ্গা' প্রভৃতি সহস্র নৌকার এক বহর সরন্দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিল। বীরভানের সহিত প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ও তাঁহার পরম বন্ধু 'সূত'ও চলিলেন। সমুদ্র-পথে ঝড়-তুফান হইতে আরম্ভ করিয়া কত দুর্যোগ যে ঘটিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। একে একে সমস্ত দুর্যোগ কাটাইয়া বীরভান ও সূত সরন্দ্বীপ পৌছিলেন এবং শুনিতে পাইলেন যে, চন্দ্রাবতীর বিবাহের জন্য এক নূতন প্রস্তাব করা হইয়াছে। বীরভান অধৈর্য হইলেন; তখন সূত আশ্বাস দিয়া বলিলেন,–

"শুন পারি বুদ্ধি-বলে মর্ত্যের মাঝার।
স্বর্গ হন্তে ইন্দ্র আর অপছরা আনিবার॥
পাতালেতে অনন্ত-নাগের শিরোমণি।
বুদ্ধি-বলে আনিয়া দিতে পারি পুনি॥
যদি বা থাকয়ে মোর কণ্ঠেতে জীবন।
চন্দ্রাবতী আনি দিমু তোমা বিদ্যমান॥"

সূত তাহার আশ্বাস-বাক্য পূর্ণ করিয়াছিলেন। বহু ঘটনা ঘটিবার পর বীরভানের সহিত চন্দ্রাবতীর বিবাহ হয়।

৪। **মহাকবি আলাওল** (আনুমানিক ১৬০৭–১৬৮০) :– মহাকবি আলাওল রোসাঙ্গ-রাজ-সভা কবিদের অন্যতম হইলেও, বাংলার মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘজীবী, মহাপণ্ডিত ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা কবি বাংলার হিন্দুদের মধ্যেও বিরল। ভাব-সম্পদ ও রচনা-পারিপাট্যে বাংলার খুব কম কবিই তাঁহার সহিত তুলিত হইবার যোগ্যতা রাখে। তবে, কাব্যকলায় আলাওল হইতে দৌলত কাজী অবি-সংবাদিতরূপে উৎকৃষ্ট।

আলাওল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। অতএব, এই স্থলে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হইল।

১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 'জোবরা' নামক গ্রামে আলাওলের জন্ম হয়। কবি মুকীমের পূর্বোদ্ধৃত চট্টগ্রামী কবির তালিকায়

দেখা যায়, আলাওলের পূর্ব পুরুষ 'গৌড়িয়া' ছিলেন, তিনি আরাকানেই জীবন অতিবাহিত করেন। কবির জীবনের শেষ কয়েক বৎসরও জন্মভূমি 'জোবরা' গ্রামে অতিবাহিত হয়। এই গ্রামে 'আলাওলের দীঘি'র পাড়ে আলাওলের মসজিদ ও কবর এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

কবির জীবন বৈচিত্র্যময়। তিনি ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্য-পুত্র ছিলেন। এই ফতেয়াবাদ ফরীদপুর জেলার 'সরকার ফতেয়াবাদ' নহে বলিয়া আমার ধারণা। 'গঙ্গা' অর্থে 'গঙ্গা নদী' না বুঝিয়া শুধু 'নদী' বলিয়া বুঝিলে (বলা বাহুল্য, 'গঙ্গা' অর্থ শুধু 'নদী'ও হয়) বহু গোলযোগের হাত রক্ষা পাওয়া যায়। কবির 'ফতেয়াবাদের' বর্ণনা পড়িলে তৎপূর্ববর্তী কবি দৌলত উজীর বাহরাম খানের,–

"নগর ফতেয়াবাদ, দেখিতে পুরয়ে সাধ,
চাটিগ্রামে সুনাম প্রকাশ।"

প্রভৃতির কথা মনে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের হালদা নদী যেখানে কর্ণফুলী নদীর সহিত মিশিয়াছে, সেই অঞ্চলের কথাও চিন্তা করিতে হয়। এই অঞ্চলেই ফতেয়াবাদ অবস্থিত।

একদা আলাওল ও তাঁহার পিতা ফতেয়াবাদ হইতে জলপথে কোন কার্যোপলক্ষে কোথাও চলিয়াছিলেন। পথে ফিরিঙ্গী জলদস্যু 'হার্মাদ'-দের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হয়। এই জলদস্যুদের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে কবির পিতা শহীদ হন এবং কবি আহত অবস্থায় আরাকানে নীত হন। তথায় তিনি আরাকান-রাজ সাদ উমাদারের (Thado Mintar ১৬৪৫–১৬৫২) রাজ-আসোয়ার (Royal Body Guard) বা রাজদেহরক্ষী অশ্বারোহী দলে ভর্তি হইলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কাব্যকলা-জ্ঞানের খ্যাতি অচিরেই ছড়াইয়া পড়িল। প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুর তাঁহার পরিচয় লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। এই মাগনের আশ্রয় লাভ করিয়াই কবি অসি ত্যাগ করিয়া মসী যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ শুজা যখন আরাকানে নিহত হন, তখন কবিরও ভাগ্য বিপর্যয় হয়। মীরজা নামক কোন পাপিষ্ঠের অপবাদে তিনি ষড়যন্ত্রের অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং পঞ্চদশ দিন 'গর্ভবাস-সম কর্মনিয়োজিত' কারাবাস ভোগ করিয়া মুক্তি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃতুল্য মাগন ঠাকুরও মারা যান। মাগনের মৃত্যুর পর বেশ কিছুকাল তাঁহার দুর্গত জীবন কাটিতে থাকে। অতঃপর তিনি ধারাবাহিকভাবে রোসাঙ্গ-রাজ-অমাত্য সয়্যিদ মুসা, সমর-সচিব সয়্যিদ মুহম্মদ খান, রাজ-মন্ত্রী নবরাজ মজলিস এবং অন্যতম সচিব শ্রীমন্ত সুলৈমান প্রভৃতি বহু সভাসদের অনুগ্রহ লাভ করেন। ইহা হইতে দেখা যাইবে, মাগনের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর হইতে তাঁহার আশ্রয়দাতার অভাব ছিল না। তথাপি তিনি আর জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। ইঁহাদের সাহায্যকে তিনি ভিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। এই সময়ে তিনি 'সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা দুঃখে দিন যায়' অথবা 'অসার্থক ভিক্ষামাত্র যাহার জীবন'- প্রভৃতি নানা খেদোক্তি কাব্যের নানাস্থানে করিয়াছেন।

কবি আলাওল তাঁহার 'সয়ফুল-মুলক' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,– 'রচিল পুস্তক বহু নানা আলাঝালা'। তাঁহার এই বহু পুস্তক হইতে এ পর্যন্ত মাত্র সাড়ে পাঁচখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার অন্য কোন পুস্তক আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনাও লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখানে তাঁহার কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল :–

(ক) **পদ্মাবতী** :– কাব্যখানি হিন্দী-ভাষার খ্যাতনামা কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' নামক রূপক-কাব্য-অনুসরণে রচিত। ইহা ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ ১০১৩ মঘী সনে) রোসাঙ্গ-রাজ সাদ উমাদারের (১৬৪৫-১৬৫২) রাজত্বের শেষভাগে আলাওল কর্তৃক ভাবানূদিত হয়।

(খ) **সতী ময়না** :– আলাওল 'পদ্মাবতী'র পরেই 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী'র উত্তরাংশ রচনা করেন। দৌলৎ কাজীর এই অসমাপ্ত পুস্তকটি সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য রোসাঙ্গ-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মের (১৬৫২-১৬৮৪) অন্যতম সচিব শ্রীমন্ত সুলেমান কবি আলাওলকে অনুরোধ করিতে গিয়া বলেন :–

"এই খণ্ড পুস্তক পূরাও মোর নামে।
দুগ্ধ মধু আনিয়া মিলাও এক ঠামে॥"

আলাওল এহেন মহৎ জনের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'লোর চন্দ্রাণী'র তৃতীয় ও শেষ খণ্ড রচনা করেন।

(গ) **হপ্ত-পয়কর** :– এই পুস্তকের পূর্বে 'সয়ফুল-মুলকে'র প্রথমাংশ মাগন ঠাকুরের আদেশে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহার পর মাগন পরলোক গমন করেন। এই সময়ে আরাকানের সমর-সচিব সয়্যিদ মুহম্মদের আদেশে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'হপ্ত-পয়কর' রচনা করা হয়। ইহা ঐ নামীয় ফারসী কাব্যের ভাবানুবাদ।

(ঘ) **তোহফা** :– 'হপ্ত-পয়করের' পরেই আলাওল ফারসী কবি ইউসুফ গদা-রচিত (রচনার তারিখ ৭৯৫ হিজরী বা ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দ) 'তোহফা' বা 'উপহার' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ইহা কাহিনীকাব্য নহে, ধর্মীয় উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল কর্তৃক এই গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। ইহার রচনায় দুই বৎসর আবশ্যক হইয়াছিল। ইহা মুসলমানদের ফিকহ বা হিন্দুদের সংহিতা শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহাতে যে সমস্ত ইসলামী ক্রিয়াকলাপের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা আজও পরিবর্তিত হয় নাই। ইহার বহুল-প্রচার বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) **সয়ফুল-মুলক্** :– কবি আলাওল 'তোহফা' রচনার বহুদিন পরে 'সয়ফুল-মুলক্ বদীউজ্জামালে'র শেষাংশ রচনা করিয়াছিলেন। মাগন ঠাকুরের লোকান্তর গমনের নয় বৎসর পরে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান-রাজ্যের প্রধান অমাত্য সয়্যিদ মুসার আদেশে 'সয়ফুলমুলক্' রচনা সমাপ্ত হয়। ইহাও ফারসী উপাখ্যান-কাব্যের ভাবানুবাদ।

(চ) **সিকান্দর-নামা** :– আলাওলের আবিষ্কৃত গ্রন্থের মধ্যে 'সিকান্দর-নামা'ই কবির শেষ রচনা। এই কাব্য রচনার সময় কবি বৃদ্ধ এবং তাঁহার অবস্থা–

"মন্দকৃতি ভিক্ষা বৃত্তি জীবন কর্কশ।
দারাপুত্র সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ॥"

মজলিস নবরাজ বা নবরাজ মজলিস নামে কোন আরাকান-রাজ-সচিবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া কবি ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাও ঐ নামীয় ফারসী কাব্যের ভাবানুবাদ।

এতদ্ব্যতীত আলাওল বহু গান ও পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই গান ও পদাবলীর কতকগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৫। **আবদুল করীম খোন্দকার** :– রোসাঙ্গের রাজ-সভায় থাকিয়া দৌলত কাজী, মরদন, মাগন ঠাকুর, আলাওল প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণ যে সাংস্কৃতিক ধারা ও বাংলা-সাহিত্য-চর্চার প্রবর্তন করেন, তাহা আলাওলের পরে অচিরে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল,–এমন মনে করা ভ্রম মাত্র। রোসাঙ্গে এই সাংস্কৃতিক পরিচর্যা যে আরও বহু দিন অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহার প্রধান প্রমাণ, এই দেশে আবদুল করীম খোন্দকার নামক আরও একজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব। 'দুল্লা মজলিস' নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থ কিঞ্চিৎ খণ্ডিত আকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে দেখা যায়–

সহস্রেক ষাইট শকে কহিতে অব্দ আর।
'হাজার মসাইল' আর 'তমীম আঞ্চার'॥
তার পাছে এই পুস্তক করিব রচন।
পদবন্ধ করি দিলুঁ ভাবি নিরঞ্জন॥
সহস্রেক ষাইট শকে কহিতে অব্দ আর।
মঘী সন এ লিখন শুন পুনর্বার॥

১০৬০ মঘী সনে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হয় এই 'দুল্লা মজলিস' কবির একমাত্র গ্রন্থ নহে। ইহার পূর্বে কবি 'হাজার মসায়েল' ও 'তমিম আনসারী' নামে আরও দুইখানিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আবদুল করীম আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। 'দুল্লা মজলিসে' প্রদত্ত কবির বংশবিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহার প্রপিতামহ 'রমজু মিঞা' রোসাঙ্গ-রাজের 'বিষয়-পদবী' লাভ করেন ও 'ডিঙ্গার হাসিল' উসুলকারী বা সামুদ্রিক বাণিজ্য শৌল্কিক (Colector of Sea-customs) ছিলেন। রমজু মিঞার পুত্রের নাম মুহসিন আলী। তিনিও রোসাঙ্গ-রাজ-সরকারের 'ডিঙ্গার দোভাষী' (Interpreter of the Department of Sea-customs) ছিলেন। মুহসিন আলীর পুত্র আলী আকবরই কবি আবদুল করীম খোন্দকারের পিতা। কবি রোসাঙ্গের রাজধানী ম্রোহং বা মুরং (Mrohaung) শহরে বসিয়া রোসাঙ্গ-রাজ প্রদত্ত 'সাদিউক-নানা' উপাধিধারী রাজ-কোষাধ্যক্ষ (তঙ্কশালা-মালিক) আতিবর নামক এক ব্যক্তির আদেশে 'দুল্লা মজলিস' রচনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ম্রোহং ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর ধরিয়া আরাকানের স্বাধীন রাজাদের রাজধানী ছিল।

'দুল্লা মজলিস' একটি ফারসী গ্রন্থের ভাবানুবাদ। ইহাতে হজরত আদম (আ:), ইবরাহীম, লুৎ, শুয়াইব, মুসা, সুলেমান, ঈসা, মুহম্মদ মুস্তফা (দ:) প্রভৃতি নবীদের কাহিনীর সহিত ফাতিমা, আলী, ইউসুফ সূফী, খালিদ, বিলাল, হাসান বসরী, হাসন কুরৈশী, নৈশাপুর রাজা, সুলতান আবু সয়ীদ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কথা এবং তদুপরি রোজা, নমাজ ও বিহিশতের বিবরণ প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহার 'হাজার মসাইল'ও বিরাট গ্রন্থ। ইহাকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের সার সঙ্কলন বলিয়া উল্লেখ করা যায়। এই নামের ফারসী গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সম্ভবতঃ পুস্তকটি তাহারই ভাবানুবাদ। কবিও বলিয়াছেন পুস্তকটি 'কিতাবেতু' বা কিতাব হইতে দেখিয়া লেখা।

'নূর-নামা' নামেও আর একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 'নূর' হইতে কিভাবে হজরত মুহম্মদ (দ:) সৃষ্ট হইলেন, ইহাতে সে কথা বর্ণিত হইয়াছে।

(খ) ত্রিপুরা রাজ্যের বাংলা-সাহিত্য

আরাকানের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা নির্ণয়ও কঠিন। বর্তমান নোয়াখালি জেলার প্রায় সমস্তটিই প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জেলাগুলি এখনও মুসলমান-প্রধান। আগেও এই জেলাগুলিতে অধিক সংখ্যায় মুসলমান বাস করিত। আরাকানের সমস্ত রাজপদে যেমন মুসলমান-প্রাধান্য দেখা যায়, ত্রিপুরা রাজ্যে তেমন ছিল না। কিন্তু অধিবাসীর মধ্যে মুসলিম-প্রাধান্য কালক্রমে বাড়িয়া যাইতে থাকে।

ত্রিপুরা এই দেশের আদিম অধিবাসীর রাজ্য। চাকমা গোত্রভুক্ত ব্যক্তিরাই এই রাজ্যে চিরকাল রাজত্ব করিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও, ইঁহারা বাঙালী-হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। মুসলমান-আমলে ত্রিপুরা কখনও পূর্ণমাত্রায় বিজিত না হইলেও, মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে এই রাজ্য মুক্ত ছিল না। রাজ-দরবার, শাসন, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যাপারে ত্রিপুরার উপর মুসলিম প্রভাব গভীর রেখাপাত করে। অধিকন্তু, বাংলা-ভাষার প্রাধান্য এই রাজ্যে চিরকালই স্বীকৃত হইয়াছে। এই রাজ্যের মুদ্রা ও দলিলপত্রে বাংলা-ভাষার প্রাচীন নিদর্শন দেখা যায়। এই রাজ্যের মুসলমানেরা বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

শেখ চান্দ (আনুমানিক ১৫৬০–১৬২৫) :– এই পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলমান কর্তৃক বাংলা সাহিত্য-চর্চার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কবি শেখ চান্দ-ই প্রাচীনতম। ইনি একাধারে সাধক ও শক্তিশালী কবি ছিলেন। তাঁহার কয়েকখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে লিখিত আমার 'কবি শেখ চান্দ' নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে সম্প্রতি যে কয়েকজন আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক আলী আহমদ সাহেবের প্রবন্ধের (মাহে-নও, জুলাই, ১৯৫২) আলোচনা মৌলিক।

সিলেট সাহিত্য-সংসদের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি-রূপে জনাব সয়িদ মরতুজা আলী তাঁহার ভাষণে বলেন, "কবি শেখ চান্দ দক্ষিণ সিলেটের অন্তর্গত 'ভানুগাছ' পরগনার অধীন 'ভাগের হাট' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।" কবির আদি নিবাস সিলেটে থাকা বিচিত্র নহে। তবে, অন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এই দাবী সমর্থন করা চলে না। কবির অধিকাংশ জীবন, বিশেষ করিয়া সাহিত্যিক জীবন যে ত্রিপুরায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবির প্রায় সমস্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কবি ত্রিপুরাতেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক আলী আহমদের 'কলমী পুঁথির বিবরণ' হইতে জানিতে পারা যায়, কবি ত্রিপুরার 'বাকসার' নামক স্থানে সমাহিত আছেন।

কবির পিতার নাম ফৎহ মুহম্মদ এবং পীরের নাম শাহ্ দৌলা। এই পীর সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ :–

> তালুক ভূমি অল্প তান শিষ্য বহুতর॥"

এই 'কাদবা' পরগনা ও 'হুরুয়া' গ্রাম ত্রিপুরা জেলার লালমাই রেল ষ্টেশনের ৪/৫ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। 'হুরুয়া' গ্রামে শাহ্ দৌলার কবরও আছে। 'হুরুয়া' হইতে

আরও ৪/৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'বাকসার' গ্রামে শেখ চান্দ সমাহিত। 'হুরুয়া' গ্রামে পীর শাহ্ দৌলার বাড়ি হইলেও, তিনি–

> "পরগনে পাইটকারা স্থানে গোঞাএ সাল।
> তালিপ তলপ শিষ্য পণ্ডিত বিশাল॥"

এই 'পাইটকারা' পরগনাও ত্রিপুরা জেলার 'পাটিকারা' পরগনা। তিনি এইখানেই দিন গুজরান করিতেন।

কবি সংসারত্যাগী সাধক ছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্যময় সাধকজীবন ধ্যান-ধারণা ও সাহিত্য-সাধনা করিয়াই কাটিত। তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে,–

> "দুনিয়ার জঞ্জাল ত্যজি, মুর্শিদ আর পীর ভজি,
> সৃষ্টি করি রছুল-চরণ।"
> –(রসূল বিজয়)

এইভাবে দুনিয়ার মায়া কাটাইয়া পীর মুর্শিদের চরণ সেবা করিয়া, 'রসুল-বিজয়' রচনার সৃষ্টির কার্যে ডুবিয়া থাকিয়া, কবি যে সাধনায় মগ্ন হইয়া রহিলেন, তাহার ফল ফলিল। তিনি দ্বাদশ বৎসরের কৃচ্ছ্র সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করিলেন। এই বিষয়ে কবির সাক্ষ্য এইরূপ :

> "দোয়াদশ বর্ষ পরে বাড়িলেক জ্ঞান॥
> মুর্শিদ চরণ মধ্যে একিদা ইমান॥"
> –(শাহ দৌলা পুঁথি)

কবির সময় সম্বন্ধেও নানা মত দেখা দিয়াছে। অধ্যাপক আলী আহমদ সাহেব কবির 'কিয়ামৎ-নামা' পুস্তকের যে চারিখানি পাণ্ডুলিপি পাইয়াছেন, তাহার একটিতে দুই স্থলে দুইরূপ তারিখ পাইয়াছেন। তাহা এইরূপ :–

(ক) "এক সও বাইস পুস্তক রেচান।
সাহা চান্দ ফকিরে বোলে সোন গুনিরগণ॥"

(খ) "মুরসিদের আজ্ঞা পাইয়া কহে হিন্যি চান্দে।
এগারস বাইস সন রচিল প্রবন্ধে॥"

আমাদের বিশ্বাস, 'এক সহস্র বাইশ সন"-১০২২ সন কবির 'কিয়ামত-নামা' রচনার কাল। ইহা বাংলা বা ত্রিপুরাব্দ হইতে পারে। তবে কবির সাহিত্যিক জীবন ত্রিপুরায় অতিবাহিত হওয়ায়, ইহা ত্রিপুরাব্দ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এই হিসাবে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস, কবি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক।

এই পর্যন্ত কবির পাঁচখানা পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :

(১) **রসূল বিজয়** :– ইহাই কবি শেখ চান্দের শ্রেষ্ঠ বৃহৎ কাব্য। ইহা কবির পীর শাহ দৌলার আদেশে লিখিত হয়। এই সম্বন্ধে কবি বলেন :

> "ফতে মোহাম্মদ সুত শেখ চান্দ নাম।
> গুরুর আজ্ঞায় পঞ্চালী রচে অনুপাম॥

কাছাছুল-আম্বিয়া এক কিতাবেত শুনি।
পঞ্চালী বাঁধিয়া তাকে পুস্তকেত ভণি॥"

'রসূল-বিজয়ের' শেষার্ধে ১১৬ অধ্যায়ের পরে, এক বৃহৎ অংশকে কবি 'শবেমেরাজ' নাম দিয়াছেন। ইহাতে হযরতের 'মিরাজ' হইতে বিহিশ্‌ত ও দোজখ পরিভ্রমণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যে বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি এইরূপ : ইব্লিসের শোক, তালেব নিধন, মুবারিজের স্ত্রীর শাস্তি, গোয়ালার ইসলাম গ্রহণ, জকিনামা, মুরিদের কথা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়।

(২) **শাহ্ দৌলা** :—ইহা কবির পীরের জীবন নহে; তবে শাহ্ দৌলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও ইহাতে আছে। পুস্তকখানি প্রধানতঃ 'মারফৎ' সম্বন্ধীয়। কবি শৈখ চান্দ গুরু শাহ্ দৌলাকে নানা জটিল তত্ত্বমূলক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শাহ্ দৌলা ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। এইরূপ তত্ত্বমূলক প্রশ্নোত্তর ছলে পুস্তকটি লিখিত। ইহা বহুদিন পূর্বে বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

(৩) **কিয়ামত-নামা** :—নামেই পুস্তকের বিষয়-বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যেই রচনার তারিখ পাওয়া গিয়াছে। ইহা এইরূপ :

"এক সহস্র বাইশ সনে পুস্তক রচন।
শাহ চান্দ ফকির বলে শুন গুণিগণ।"

(৪) **হর-গৌরী সংবাদ** :—ইহার মোট পত্র সংখ্যা ১৩ তের। ইহা একটি ক্ষুদ্র যোগ-শাস্ত্রীয় পুঁথি। এই সময়ের সূফী সাধকদের প্রথা অবলম্বনে ইহা লিখিত হয়।

(৫) **তালিব-নামা** :—ইহা একখানি চম্পূ-কাব্য। গদ্যে ও পদ্যে লিখিত বলিয়া পুঁথিখানি বিশিষ্ট। ইহার বিষয়-বস্তুর সহিত কবির 'শাহ্ দৌলা' গ্রন্থের বেশ মিল আছে। মরমীয়া-তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই পুস্তকটি বাংলা গদ্যের একটি প্রাচীনতম নমুনা হিসাবেও বাংলা-সাহিত্যের আসরে এক বিশিষ্ট স্থান লাভের অধিকারী। ইহার প্রথম দিকের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

পুস্তক তালিব-নামা

আল্লাহু গণী॥ মুহম্মদ নবী।
তুমি আসিয়াছ কোথা হতে? বাসা হতে॥
বাসাতে রাখিয়াছ কারে? আশা পহরী॥
আশা পহরী কে? দুনিয়ার উর্ধ্বেত যে॥
দুনিয়ার বাড়িত আসিয়াছ কোথা হতে? তৌজিপুর হতে॥
রহিয়াছ কোন্ ঠাঁই? সেই ঠিকানার নাম কি? নিয়ামতপুর॥
যাইবা কোন ঠাঁই? সাঁজগর্ভপুর॥
তুমি তালিব হইছনি? তালিব হইছি॥
কার তালিব? তলবের তালিব॥
তলব কার তালিব? মুর্শিদের তালিব॥
মুর্শিদ কে? মিহ্তর্ আজরাঈল॥
তান মুর্শিদ কে? মিহ্তর্ ইসরাফীল॥

তান মুর্শিদ কে? মিহ্তর জিবরাঈল॥
তান মুর্শিদ কে? মিহ্তর মিকাঈল॥
তান মুর্শিদ কে? অক্ষয় নিরঞ্জন॥
অক্ষয় নিরঞ্জন কে? যে দুনিয়ায় অটল সে॥
অক্ষয় নিরঞ্জন যে সংসারের সার॥

২। **সৈয়িদ মুহম্মদ আকবর** (১৬৫৭–১৭২০) :— ইনিও ত্রিপুরা জেলার কবি বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার পুঁথির সমস্ত পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরা জেলা হইতেই সংগৃহীত। একমাত্র 'জেবলমুলক-শামারুখ' ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কাব্য এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কাব্যখানি বহু দিন (প্রায় ৪০ বৎসর) পূর্বে কলিকাতার বটতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হইত।

কবি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যখানি প্রেমমূলক উপাখ্যান গ্রন্থ। মনের মত করিয়া কাব্যের নায়িকার রূপ বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়া কবি বলিতেছেন,—

"ফারসী হইত যদি কহিত বাখানি।
কলা অব্দ বয়সেতে রচিল কাহিনী॥"

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, কবি যে শুধু ফারসী জানিতেন, তাহা নহে, মাত্র 'কলা-অব্দ বয়সে' অর্থাৎ ষোল বৎসর বয়সে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্য রচনার তারিখও তিনি ফারসী-ভাষার আক্ষরিক সঙ্কেত (Chronogram) সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"লিখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম্ব দিল।
আরবা আনাছের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল॥"

এই 'আরবাতু আনাসির' বা 'চারি উপাদান' (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ) অর্থাৎ পৃথিবী কথার মধ্যে কাব্য সমাপ্তির তারিখ রহিয়াছে। ইহাতে ১০৮৪ হিজরী হয়, এই বৎসরে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ ছিল। সুতরাং ১৬ বৎসর বয়সে কাব্য লিখিলে কবি ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) একশত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। **শুকুর মুহম্মদ** (আনুমানিক ১৬৮০–১৭৫০) :— ইনি যে ত্রিপুরার কবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইনি পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী লোক নহেন। তাঁহার কাব্যের নাম 'ময়নামতীর গান'। কাব্যখানি সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিপুরার রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী রাণী ময়নামতীকে কেন্দ্র করিয়া যুগ-যুগান্তর ব্যাপী দেশে যে গান প্রচলিত ছিল, কবি তাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাব্যে রূপ দিয়াছিলেন। ইহাকে ঐতিহাসিক কাহিনী-কাব্য বলা যায়।

৪। **মুহম্মদ রফীউদ্দীন** :— কবির পিতার নাম আশরফ। তিনি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কুমিল্লার 'নারানঞা' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহার রচিত কাব্যের নাম 'জেবলমুলক্-শামারোখ'। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার কবি মুহমদ আকবর এই নামের আর একখানি কাব্য লেখেন। উভয় পুস্তকের ঘটনা ও বিষয় এক, কেবল ভাষার তফাৎ। রফীউদ্দীনের ভাষা পরিমার্জিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ইহাতে মনে

হয়, তিনি মুহম্মদ আকবরের পরবর্তী লোক। আমাদের ধারণা, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক। তাঁহার ভাষার নমুনা স্বরূপ মাত্র দুইটি চরণ উদ্ধৃত হইল :–

মালঝাঁপ ছন্দ

"কোকিল, করে গান, মোহজ্ঞান রঙ্গে।
সুধামৃত, শুনি গীত, পুলকিত অঙ্গে॥"

৫। **শেখ সাদী (১৭১২)** :–ত্রিপুরা রাজ্যের কবিদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইহার কাব্যের নাম 'গদা-মল্লিকা'। রুম-রাজনন্দিনী মল্লিকা অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া পণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার 'হাজার সওয়ালের' উত্তর দিতে পারিলেই, তিনি স্বয়ম্বরা হইবেন। বহু রাজপুত্র অকৃতকার্য ও লাঞ্ছিত হইল। পরে আবদুল্লাহ্ নামে এক দরিদ্র (গদা) তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া মল্লিকাকে বিবাহ করিলেন। ইহাই কাব্যের বিষয়-বস্তু। কাব্যটি রচিত বা অনুলিখিত হইয়াছিল :

"পড়িয়া বুঝিবা সব শাস্ত্রের উদ্দেশ।
একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ॥"

এই ১১২২ সাল ত্রিপুরাব্দ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং এই সময়ে পুস্তকটি রচিত, না হয় অনুলিখিত হয়। ইহাতে ১১২২+৫৯০=১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

৬। **শেরবাজ** :–শেরবাজও ত্রিপুরার কবি। তাঁহার কাব্যের পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরা হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পর্যন্ত তাঁহার তিনটি পুস্তকের সন্ধান ও পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, যথা–(ক) ফক্করনামা বা মল্লিকার হাজার সওয়াল; (খ) কাসেমের লড়াই; এবং (গ) ফাতিমার সুরত-নামা।

কবি শেখ সাদী ও কবি শেরবাজ,–এই দুইজনের মধ্যে কবি শেরবাজকেই পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মনে হয়। কবি শেখ সাদী কবি শেরবাজের 'ফক্কর-নামা' গ্রন্থের অক্ষম অনুকরণ করিয়াছেন। কবি শেরবাজ তাঁহার 'ফক্কর-নামা' ঐ নামের ফারসী পুস্তক দেখিয়া লিখিয়াছেন। তিনি বলেন–

"ফক্কর নামা নামে এক কিতাব আছিল।
পীরের প্রভাবে কিছু প্রচার করিল॥"

এমন কোন ইঙ্গিত শেখ সাদীর 'গদা-মল্লিকা'য় চোখে পড়ে নাই। তাহাতে মনে হয়, শেরবাজের কাব্য পড়িয়াই অথবা শুনিয়াই শেখ সাদী তাঁহার কাব্য লিখিয়াছেন। শেরবাজ মল্লিকার সখীগণের যে-নাম দিয়াছেন, তাঁহার রচনার উৎকর্ষ বিচারের জন্য তাহা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :–

"রূপে মনোহর বালা গুণে অনুপাম।
বাছি বাছি রাখিয়াছে সখীসব নাম॥
হিরাধার, চম্পাছরী, কমল-নয়নী।
কাজল-রেখা যে আর মুকুতা-দশনী॥
প্রভাবতী, মৃগ-আঁখি, কমল-মঞ্জরী।
এ সকল সখী থাকে কুমারীকে ঘেরি॥"

অধিকন্তু, গদা বা ভিখারী আব্দুল্লাহ যখন মল্লিকার হাজার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়া রূম-রাজ্য ও রাজকন্যাকে লাভ করিলেন, তখন কবি যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাও লক্ষণীয় :

"যাহার আছিল জান মাটিতে শয়ন।
সেই জান যায় নিদ্রা খাট-সিংহাসন॥
ললাট-লিখন জান না যায় খণ্ডন।
সেই সে আবদুল্লা হৈল রুমের রাজন॥"

কবির 'কাসেমের লড়াই' নামক পুস্তকে মোহরমের ঘটনার একাংশের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণনা মামুলী। তাঁহার 'ফাতিমার সুরত-নামা' একটি অদ্ভুত পুস্তক। ইহার বিষয়-বস্তু সত্যই অদ্ভুত। মনে হয়, ইহা বাংলা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মুসলিম জওয়াব।

৭। **মুহম্মদ আবদুর রজ্জাক (১৭৭০ খ্রী:)** :– কবি নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার অন্তর্গত 'বেদরাবাদ' পরগনার অধিবাসী ছিলেন। কবি ত্রিপুরার মহারাজ শ্রীবলরাম মাণিক্যের রাজ্যে বাস করিতেন; মহারাজ বলরাম মাণিক্য মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের (১৭৬০-১৭৮৩) প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কবি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার এই কাব্যটি লিখেন। কাব্যটির নাম 'সয়ফুলমুলুক-লালবানু'। ইহা একখানি উপাখ্যান-কাব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুঘল-আমলের বাংলা-সাহিত্যের সাধারণ আলোচনা

মুঘল-আমলের বাংলা-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যাহা দেখিতে পাই, তাহা আমাদিগকে একাধারে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করে। ইহার বিশালতা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই এবং বিষয়-বৈচিত্র্য ও মননশীলতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। এই বিশালতা, বিষয়-বৈচিত্র্য ও মননশীলতার দিক হইতে চিন্তা করিলে, মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে মুঘল-আমলকে 'স্বর্ণযুগ' বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। মুঘল-আমলে বাংলা-সাহিত্য স্বাধীনতার যুগের কিশোর-অবস্থা অতিক্রম করিয়া বলদৃপ্ত যৌবনের মহিমা কীর্তন করিতেছে। ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিল? ইহার উত্তর রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় নহে, মুঘল-আমলে দেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনেই পাওয়া যাইবে।

বাংলা-ভাষা স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে উন্নততর ফারসী-সাহিত্যের সংস্রবে আসিয়াছিল। মুসলমানেরা এই ফারসী-সাহিত্যকে অপেক্ষাকৃত সহজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফল বাংলার মুসলিম-সাহিত্যে সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক পরিমাণে প্রকট হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। মোটের উপর, ইংরেজ-আমলে হিন্দুরা সর্বাগ্রে মনে-প্রাণে ইংরেজীভাষাকে গ্রহণ করায়, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে হিন্দুদের মধ্যস্থতায় ইংরেজী-সাহিত্যের প্রভাব ও স্ফুরণ যেমন দেদীপ্যমান এবং তাহার ফলে হিন্দুদের বাংলা-সাহিত্য যেমন বিচিত্র ও বিশাল হইয়া উঠিয়াছে, মুঘল আমলেও ফারসী-ভাষার সহিত মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ ও গভীর আন্তরিক যোগ সাধিত হইবার ফলে এই যুগের মুসলিম বাংলা-সাহিত্য তেমনই বিচিত্র ও বিশাল হইয়া উঠিয়াছে। এইবার আমরা অতি সংক্ষেপে মুঘল-আমলের মুসলিম-বাংলা-সাহিত্যের বিশালতা, বৈচিত্র্য ও মননশীলতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

(ক) ইসলামী শরা-শরায়িৎ

এই সময়ের বাংলা-সাহিত্যে ইসলামী শরা-শরায়িৎ সম্বন্ধীয় পুস্তকের সংখ্যাই সর্বাধিক। অবশ্য, তাহার অধিকাংশই 'রিসালা' বা পুস্তিকা শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ হইলেও, কয়েকখানি বিরাট ধর্মীয় গ্রন্থ। এই পুস্তকগুলিতে ইসলামের 'ফীকহ্'-শাস্ত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, কবি সয়্যিদ সুলতানের উক্তিই উদ্ধৃত করিতে হয় :

"দেশেত আলিম থাকি যদি ন জানায়।
সে আলিম নরকেত যাইব সর্বথায়॥
নর সবে পাপ কৈলে আলিমের ধরি।

আল্লার সাক্ষাতে মারিবেন্ত দণ্ড বাড়ি॥
তোক্ষারা সবের মেলে মোর উতপন।
তেকারণে কহি আক্ষি শাস্ত্রের বচন॥
আল্লায় বলিব তোরা আলিম আছিলা।
মনুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ ন কৈলা॥
আছুক আপনা পাপ আলিমে খণ্ডাইব।
পরের পাপের লাগি লাঘব পাইব॥"
—(শব-ই-মিরাজ)

এই সময়ে যে-সমস্ত শাস্ত্রীয় পুস্তক রচিত হইয়াছিল, জনসাধারণের মধ্যে তাহার প্রচার ও প্রসার এই জাতীয় আরবী ফারসী পুস্তক হইতে অধিক। ইহাদের মধ্যে শৈখ মুত্তলিবের 'কিফায়িতু-ল-মুসল্লীন', আব্দুল হাকীমের 'শিহাবুদ্দীন-নামা', হায়াত মাহমুদের 'হিতজ্ঞানবাণী' এবং নসরুল্লাহ্ খানের 'শরীয়ৎ-নামা' বিরাট গ্রন্থ হইলেও বহুল প্রচারিত। নিম্নে এই শ্রেণীর পুস্তকগুলির একটা তালিকা দেওয়া হইল; এইগুলির পরিচয় পূর্ব-পরিচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

১।	নসীহৎ নামা	—	শৈখ পরান
২।	মূসার সওয়াল	—	নসরুল্লাহ্ খান
৩।	শরীয়ৎনামা	—	ঐ
৪।	কিফায়িতু-ল্-মুসল্লীন	—	শৈখ মুত্তলিব
৫।	হিদায়িতু-ল-ইসলাম	—	নসরুল্লাহ্ খান
৬।	নসীহৎ-নামা	—	আব্দুল হাকীম
৭।	বয়ানাৎ	—	নওয়াজিশ খান
৮।	সরসালের নীতি	—	কমর আলী
৯।	মুনাজাত	—	মুহম্মদ ফসীহ
১০।	নামাজ-মাহাত্ম্য	—	মুহম্মদ জান
১১।	শিহাবুদ্দীন-নামা	—	আব্দুল হাকীম
১২।	হিতজ্ঞান-বাণী	—	হায়াত মাহমুদ

(খ) মুসলিম কাহিনী

এইগুলিকে মুসলিম পৌরাণিক কাহিনীও বলিতে পারা যায়। আমার বিশ্বাস, হিন্দু পুরাণের বা পৌরাণিক কাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মুসলমান জনসাধারণের জন্য এই মুসলিম কাহিনীগুলিকে বাংলাকাব্যে রূপ দেওয়া হইয়াছিল। এইগুলির মধ্যস্থতায় বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে মুসলিম-সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই কাব্যগুলি আকারে এত বৃহৎ যে, ইহাদের একখানিও আদ্যন্ত পাঠ করিবার মত ধৈর্য খুব কমসংখ্যক লোকের আছে। এতৎসত্ত্বেও এই কাব্যগুলির পূর্ণ বা খণ্ডিত অসংখ্য প্রতিলিপি পাওয়া যায়। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে এইগুলির সমাদর বুঝিতে পারা যায়। এখানে কাব্যগুলির নাম দেওয়া হইল :—

১।	নবী-বংশ	—	সয়্যিদ সুলতান
২।	রসুল-বিজয়	—	ঐ

৩। শব্-ই-মিরাজ	—	ঐ
৪। ওফাৎ-ই-রসূল	—	ঐ
৫। ইবলীস-নামা	—	ঐ
৬। হানীফার লড়াই	—	মুহম্মদ খান
৭। আমীর হামজা	—	আবদুল নবী
৮। জঙ্গনামা (রসুল-বিজয়)	—	নসরুল্লাহ্ খান
৯। আম্বিয়া-বাণী	—	হায়াত মাহমুদ
১০। কিয়ামৎ-নামা	—	মুহম্মদ খান (পৃথক পুস্তক)

(গ) মুসলিম সৃষ্টিতত্ত্ব

মুসলিম-সৃষ্টিতত্ত্বকে মুসলিম কাহিনীভুক্তও করা চলে। মূলে ইহাও মুসলিম পৌরাণিক কাহিনী বটে। তবে, বাংলায় এই বিষয়ে একটা পৃথক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার সহিত সূফী-তত্ত্বও মিশিয়া যায়। এতৎসত্ত্বেও, এইগুলিতে ধর্মীয় প্রাধান্যই বেশী। এই শাখার সাহিত্যে এইগুলিই প্রধান :—

১। নূর-নামা	—	শেখ পরান
২। ঐ	—	মীর মুহম্মদ শফী
৩। ঐ	—	আবদুল হাকীম
৪। নূর-কন্দীল	—	মীর মুহম্মদ শফী

(ঘ) ইসলামী দর্শন বা সূফীতত্ত্ব

ইসলামী দর্শন প্রধানতঃ সূফীদিগকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার উর্বর ক্ষেত্র হইল ইরান, বুখারা ও সমরকন্দ। ফারসী-সাহিত্যে এই সূফী-সাহিত্যই প্রবল। ফারসীর মধ্যস্থতায় বাংলার মুসলমান এই দার্শনিক জ্ঞান লাভ করে। ইহার সহিত এ-দেশের যৌগিক-প্রক্রিয়া এবং তত্ত্বও মিশিয়া যায়। বাংলায় এই ইসলামী সূফী-সাহিত্য যেই রূপটি গ্রহণ করে, তাহাকে 'যোগ-কালন্দর'-জাতীয় সাহিত্য বলা উচিত। বাংলার 'যোগ-কালন্দর'-জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে এইগুলিই প্রধান :

১। জ্ঞান-চৌতিশা	—	সয়্যিদ সুলতান
২। জ্ঞান-প্রদীপ	—	ঐ
৩। নূর-জমাল	—	হাজী মুহম্মদ
৪। সির্র-নামা	—	শেখ মনসুর
৫। যোগ-কালন্দর	—	সয়্যিদ মরতুজা
৬। চারি-মকাম-ভেদ	—	আবদুল হাকীম

বলা বাহুল্য, ফারসী সূফী-সাহিত্যে যেমন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ও গজলিয়াত নামক দুইটি দিক আছে, বাংলা-সাহিত্যেও তেমনই এই শ্রেণীর সাহিত্যের দুইটি দিক আছে। উপরে লিখিত পুস্তকগুলি 'সূফী-আমলিয়াৎ' বা প্রক্রিয়া-পদ্ধতির দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, আর 'পদাবলী' এই শ্রেণীর সাহিত্যের 'গজলিয়াতের দিক তুলিয়া ধরিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, যাঁহারা বাংলায় সূফী-প্রক্রিয়ার পুস্তক বা 'যোগ-কালন্দর' লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই পদাবলীও লিখিয়াছেন।

(ঙ) মুসলিম প্রেমোপাখ্যান

এই যুগের সাহিত্যে এই শ্রেণীর পুস্তকগুলিতেই মুসলমানদের সাহিত্যিক রস অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট। প্রকৃতপক্ষে, এইগুলিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম-ললিত-কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উন্নত ধরণের কাব্য-কলায় অপূর্ব শ্রীবিমণ্ডিত ফারসী 'প্রেমোপাখ্যান'-মূলক কাব্যগুলির প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসার ফলে, বাংলা-সাহিত্যের এই কাব্যগুলি নানা দিক হইতে পৃথক ও অধিকতর কাব্যসুষমামণ্ডিত। হিন্দুদিগের কোন বাংলা-কাব্যই এইগুলির সহিত তুলিত হইতে পারে না। এই কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলিই প্রধান :—

১। ইউসুফ-জলিখা	—	আবদুল হাকীম
২। ঐ	—	গরীবুল্লাহ ও ইয়াকুব
৩। লালমতী-সয়ফুলমুলক	—	আবদুল হাকীম
৪। গুল-ই-বকাওলী	—	নওয়াজিশ খান
৫। জেবুলমুলক-শামারুখ	—	সয়্যিদ মুহম্মদ আকবর
৬। শাহজলাল-মধুমালা	—	মঙ্গল চাঁদ
৭। গদা-মল্লিকা	—	শেখ সাদী

(চ) মর্সীয়া-সাহিত্য

মুঘলদের আগমনের সহিত বাংলায় শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের বসতি এবং শিয়া-মত প্রচারের ফলে, এদেশে মর্সীয়া-সাহিত্য বা কারবালার ঘটনা-সম্বলিত পুস্তক রচনার তাগিদ আসিয়া থাকিবে। মুঘল-আমলের পূর্বে মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের এইদিক একরূপ অজ্ঞাত ছিল। শেখ ফয়জুল্লার 'জয়নবের চৌতিশা' এই সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হইলেও, ইহাতে মর্সীয়ার বিকাশ হয় নাই, উহা একটা শোক-গাথা মাত্র। বিশেষতঃ, 'জয়নবের চৌতিশা'টি 'গোরক্ষ-বিজয়', 'গাজী-বিজয়', 'সত্যপীর' প্রণেতা ফয়জুল্লার কিনা সে-বিষয়ও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

নিম্নলিখিত কাব্যগুলি মুঘল-যুগের সত্যকার মর্সীয়া সাহিত্য :

১। মকতুল হুসৈন	—	মুহম্মদ খান
২। কারবালা	—	আবদুল হাকীম
৩। মকতুল হুসৈন (জঙ্গনামা)	—	গরীবুল্লাহ ও ইয়াকুব
৪। মহরম পর্ব	—	হায়াত মাহমুদ

(ছ) ঐতিহাসিক-কাব্য

মুসলমানেরা দুনিয়ার সর্বত্র ইতিহাস রচনার জন্য চির-প্রসিদ্ধ। বাংলা-সাহিত্যেও মুসলমানেরাই প্রথম খাঁটি ইতিহাস রচনা করেন। ইতিহাসগুলি অবশ্য স্থানীয়। এতৎসত্ত্বেও এইগুলির সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক, এই উভয়বিধ মূল্য আছে। বাংলায় এই জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে নওয়াজিশ খান প্রণীত 'পাঠান প্রশংসা' ও 'জোরওয়ার সিংহের কীর্তি' এবং উজীর আলী প্রণীত (ইসলামাবাদের) 'শাহনামা' পুস্তকগুলিই প্রধান।

(জ) রূপক-কাব্য

সমগ্র মুসলিম বাংলা-সাহিত্যে, এমনকি হিন্দু-সাহিত্যেও একমাত্র মুহম্মদ খানই একখানি রূপক-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটির নাম 'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ'

(১৬৩৫ খ্রী:)। কাব্যটিতে সত্য ও কলি যুগের প্রতীক ব্যবহৃত হওয়ায়, ইহা হিন্দুয়ানী ব্যাপার বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ইহাতে সত্যের অর্থাৎ ধর্মের জয় ও কলির অর্থাৎ অধর্মের পরাজয় বিঘোষিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কুরআন শরীফের 'সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে', এই বাণীটিও স্মর্তব্য। মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ' যেমন হিন্দী মৌলিক রূপক-বাক্য, ইহাও তেমনই মৌলিক বাংলা রূপক-কাব্য। রূপক-কাব্যের প্রতীক হিন্দুর বা মুসলমানের হওয়া বড় কথা নহে; 'পদুমাবৎ' কাব্যেও তাহা করা হইয়াছে।

(ঝ) পদাবলী-সাহিত্য

আমরা একটু আগেই বলিয়াছি, মুসলমানদের মধ্যে 'ইলম্-ই-তসব্বুফ' বা সূফী-তত্ত্ব দুইভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা 'আমল' ও 'গজল'—এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পারস্য ও ভারতীয় দরবেশদের রচিত তত্ত্ব ও গান—উভয়েই আছে। কেহ কেহ শুধু তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, কেহ কেহ শুধু গান রচনা করিয়াছেন। বাংলার মুসলিম সূফী-সাহিত্যে এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায়। 'পদাবলী'কেই বাংলায় সূফী-গজল বলিয়া ধরা হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, সয়্যিদ সুলতান 'জ্ঞান-প্রদীপ', সয়্যিদ মরতুজা 'যোগ-কালন্দর' প্রভৃতি সূফী-তত্ত্বমূলক পুস্তক রচনার সহিত 'পদাবলী'ও রচনা করিয়াছেন; শাহ আকবর, নসীর মামুদ, সালবেগ (সালিহ্‌বেগ), কবীর, কমর আলী প্রভৃতি শুধু 'পদাবলী' লিখিয়াছেন; আবার আবদুল হাকীম, শেখ মনসুর প্রভৃতি শুধু সূফী-তত্ত্বমূলক পুস্তক লিখিয়াছেন।

(ঞ) বিবিধ

মারফতী গানও অনেক লিখিত হইয়াছিল। তাহা পরবর্তী সময়ের 'রাগমালা', 'ধ্যানমালা' প্রভৃতি নানা সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থে মীর মুহম্মদ শফীর 'সায়াৎ-নামা' এবং সংস্কৃতি-সমন্বয়সঞ্জাত গ্রন্থে গরীবুল্লার 'সত্যপীর' প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ইংরেজ-আমলে মুসলিম বাংলা-সাহিত্য

(১৭৫৭–১৯৪৭)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইংরেজ-আমলের বাংলা-সাহিত্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বাংলার পলাশী-প্রাঙ্গণে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ে বাংলার যে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল, তাহাতে আর যাহাই হউক, অন্ততঃ বাঙালী-মুসলমানের সর্বনাশ শুরু হইল। ইহা একদিনে বা এক বৎসরে সাধিত হয় নাই; সাংঘাতিক ধীরক্রিয় বিষ-প্রয়োগের ন্যায় দীর্ঘদিন বাংলার মুসলমানকে ক্ষয়ঙ্কর যন্ত্রণা দিতে দিতে পরিশেষে ইহা তাঁহাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। বাংলার মুসলমানদের এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের ইতিহাস দীর্ঘ ও অরুন্তুদ। এই স্থলে অতি সংক্ষেপে আমরা বাংলার এই করুণ ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিব মাত্র।

পলাশী যুদ্ধের পরে সিরাজের প্রধান সেনাপতি ও আত্মীয় মীরজাফর নামে বাংলার নবাব হইলেন বটে, কামে বঙ্গবিজেতা ক্লাইভ দেশের সর্বাধিনায়করূপে দেশের ভাগ্যবিধাতা হইলেন। বাংলার স্বাধীনতার শেষ-রশ্মি গিরিয়া উদয়নালা ও বকসারে মীর কাসিমের উপর্যুপরি পরাজয়ে (১৭৬৪ খ্রী:) চিরতরে বিলুপ্ত হইলে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব দানের প্রতিশ্রুতিতে ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব-আদায়ের ক্ষমতা লাভ করিলেন। সৈন্যের দ্বারা দেশরক্ষা করার ভার পূর্ব হইতেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল; এইবার কোম্পানী আইনতঃ দেশের প্রকৃত মালিক হইলেন।

দেশে দ্বৈত-শাসন চলিল। মুহম্মদ রিজা খাঁ বাংলায় এবং শিতাব রায় বিহারে 'নায়িব-দিওয়ান' নিযুক্ত হইয়া যে-অবস্থা ঘটাইলেন, তাহাতে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইহারই নাম 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১১৭৬ বাংলা ১৭৬৯ খ্রী:)। এই 'মন্বন্তরে' দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে মরিল। আজও বাংলায় জনসাধারণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত চিঠির খামের উপ '৭৬' সংখ্যা লিখিয়া দিয়া ১১৭৬ বাংলার 'মন্বন্তরের' ভয়াবহতা স্মরণ করিয়া থাকেন। ইহা এখন বাংলার সংস্কৃতিতে একটি অভিশপ্ত সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। পত্র-প্রাপক ব্যতীত মাঝখান হইতে অন্য কেহ পত্র খুলিয়া পড়িলে, তাহার উপর 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' কোটি-কোটি মৃত ব্যক্তির অভিশাপ বর্ষিত

হউক,—পত্র-লেখক "৭৬" সংখ্যা তাহার পত্রের খামের উপর লিখিয়া দিয়া জনসাধারণকে এই অভিশাপের কথাই জানাইয়া থাকেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসনে ইংরাজগণ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন। লর্ড হেষ্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিস এই সময়ে বাংলার বড় লাট। এই সময়ের গোড়ার দিকে মুর্শিদাবাদ, হইতে কলিকাতায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হইল; নবাব বৃত্তিভোগী হইলেন এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার জনসাধারণের বিশেষ করিয়া মুসলিম জনসাধারণের দ্বিতীয় অভিশাপরূপে কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হইল। ইহা বাংলার মুসলমানদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অফিস-আদালত হইতে ফারসী-ভাষা উঠিয়া গেল। ইহাতে বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বাঁচিয়া থাকার শেষ সম্বলও চিরতরে নিঃশেষ হইল।

ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব হইতেই ইংরাজগণ দেশে ইংরেজী-শিক্ষা প্রচলনে সচেষ্ট হন। চার্লস গ্রান্টই ইহার সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা। তিনি যাহা করিতে পারেন নাই, ইংরেজ মিশনারীরা তাহা সমাধা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে ইংরেজী-শিক্ষা-বিস্তারে ইংরেজদের মধ্যে উইলিয়ম কেরীই সর্বাগ্রগণ্য। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরী কলিকাতায় আসেন এবং শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনে যোগ দেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় তথায় ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয় এবং শ্রীরামপুর হইতে বাইবেলের বাংলা গদ্য অনুবাদ প্রচারিত হয়। তারপর ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী-শিক্ষা-বিস্তারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল এবং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন' গঠিত হইল। তাহার উদ্যোগেই 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং ফারসী শিক্ষার ক্ষেত্র দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। হিন্দুগণ ইংরেজী শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন, আর মুসলমানেরা বিদেশী ভাষার মাধ্যমের প্রতি সহানুভূতিহীনতাবশতঃ তাহা হইতে সরিয়া রহিলেন।

এই সময়ে মুসলমানেরা রাজ্যহারা, ভাষাহারা, সম্পদহারা এবং ইংরেজ মিশনারীদের প্রচারে ধর্মহারা হইবার আশঙ্কায়ও কবলিত। এতৎসত্ত্বেও তাঁহারা দিশাহারা হইলেন না। একদিকে ইংরেজ অধিকারের স্থায়িত্ব ও ক্রমবর্ধন এবং অন্যদিকে শাসন-সংক্রান্ত পরিবর্তন ও সংস্কৃতিগত বিবর্তন মুসলমানদিগকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে 'ওহাবী আন্দোলন' নামে খ্যাত এক রাষ্ট্রনৈতিক ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দিল। চব্বিশ-পরগনার বারাসত মহকুমার অধিবাসী মীর নিসার আলী, প্রকাশ 'তিতুমীর' এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঁশবেরিয়া'র বাঁশের কিল্লায় ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইলেন। অতঃপর, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার পীর দুধু মিঞাও এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন। বাংলার মুসলমান ইহাতেও দমিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে লাগিল। পরিশেষে জাতীয় জীবন পুনরুজ্জীবিত করিবার মানসে বাংলার মুসলমান মরিয়া হইয়া ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদ করিতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সিপাহী-বিদ্রোহে' যোগ দিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ দমিত হইল। বাংলার মুসলমানও ইংরেজদের কাছ হইতে ক্রমবর্ধমান বিমাতাসুলভ ব্যবহার লাভ করিতে করিতে জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া রহিলেন।

বাংলার মুসলমানের এই কাহিনী অত্যন্ত করুণ ও অতিশয় মর্মবিদারী। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার সাহেব তাঁহার 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স্' নামক গ্রন্থে বাংলার মুসলমানদের যে-চিত্র আঁকিয়াছেন, নিম্নে আমি তাহারই সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি :

"পলাশী-যুদ্ধের সময় হইতে সিপাহী-বিদ্রোহের বহুদিন (অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর) পর পর্যন্ত, প্রায় ১২৫ বৎসর যাবৎ বাংলার মুসলমানদের প্রতি আমাদের অবিচারের সীমা ছিল না। এই সেদিন পর্যন্ত যাঁহারা দেশের বিজেতা ও শাসকসম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা আজ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেও অসমর্থ। এই সম্প্রদায় আজ সর্বপ্রকারে নিঃস্ব ও ধ্বংসোন্মুখ। ইহার জন্য দায়ী আমাদের কল্পনাবিরহিত শাসন।"

"বাংলার অভিজাত মুসলমান ধ্বংস হইয়াছে। তাঁহাদের আয়ের পথ ছিল তিনটি,—যথা, সৈন্য বিভাগের উচ্চপদ, দেওয়ানী ও বিচার-বিভাগের পদগুলি এবং উচ্চ রাজনৈতিক পদগুলিতে নিয়োগ। সৈন্য-বিভাগ এখন বাংলার অভিজাত মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের কেহই আমাদের সেনাদলে (Regiment) প্রবেশ করিতে পারে না। দেওয়ানী বিভাগও তাহাদের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বড় বড় পদগুলি ইংরেজরা, ছোট ছোট পদগুলি হিন্দুরা দখল করিয়াছে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দেওয়ানী বিভাগ হইতে মুসলিম অভিজাত বিতাড়ন সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। যে-সমস্ত হিন্দু রাজস্ব আদায়ের নিম্নস্তরে থাকিয়া চাষীদের কাছ হইতে খাজানা আদায় করিত, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র ফলে তাহারা জমির মালিক হইয়া জমিদাররূপে ধনী হইয়া উঠিয়াছে, আর মুসলমান অভিজাত জমিদারী হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। আমাদের অবিচারে এবং কর্নওয়ালিস-কোড় প্রভৃতির মারপ্যাচে তাঁহাদের কেহই এখন উচ্চ রাজনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত নাই। অথচ এই সেইদিন পর্যন্ত এই সমস্ত পদ তাঁহাদের একচেটিয়া ছিল। আইন ও ভৈষজ্য ব্যবসায় তাঁহাদেরই ছিল। তাহাও ফারসী ভাষার অবসানের সহিত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বড় ছোট সমস্ত রাজপদের দরজাও এখন তাহাদের জন্য বন্ধ ও হিন্দুর জন্য মুক্ত।

"শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলার মুসলমান ও হিন্দুর অবস্থা এক নহে। মুসলমানেরা ইংরেজী শিখেন না। যে ফারসী-ভাষার সাহায্যে তাঁহারা এই সেদিন পর্যন্ত দেশ শাসন করিয়াছেন, গুণী-জ্ঞানী ও মনীষীর জন্ম দিয়াছেন, আমাদের ইংরেজী শিক্ষা যতই ভাল হউক, তাঁহাদিগকে ইহার উপকারিতা বুঝাইতে সময় লাগিবে। হিন্দুরা মুসলমান-রাজত্বে যেমন ফারসী শিখিয়াছে, এখন তেমন ইংরেজী শিখিতেছে ও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করিয়া লইতেছে।"

বাংলার মুসলমানদের এই অবস্থার জন্য হান্টার সাহেব একমাত্র তাঁহার স্বজাতিকেই দায়ী করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ-আমলে বাংলার মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য প্রধানতঃ ইংরেজই দায়ী।

বাংলার মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বিমাতাসুলভ ব্যবহার ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পরও সমান তালে চলিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের পর মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের অবিশ্বাস বাড়িয়া যাওয়ার ফলে, তাঁহারা সর্বপ্রকারে মুসলমানদের

সর্বনাশ সাধনে ব্রতী হওয়ায় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার সাহেব বাংলার মুসলমানদিগকে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে মুসলমানদের এই জীবন্মৃত অবস্থায় কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে, মুসলমানেরা মরিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার মত জাতি নহে। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট হিন্দুদের সহিত কিছুতেই পাল্লা যাইতেছে না, তখন তাঁহারা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গ-বিভাগ' করিয়া পৃথক হইবার চেষ্টা করিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের এই প্রচেষ্টাই জীবন্মৃত বাঙালী মুসলমানের জাতীয়-জাগরণের একটি প্রধান নিদর্শন। যাহা হউক হিন্দুদের প্রবল আন্দোলনেই অল্পকাল পরেই 'বঙ্গ-বিভাগ' রহিত হইল– মুসলমানদের স্বার্থ ও ইচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধেই।

ইহার পর হইতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই অবস্থা দেখা দিল। আবার মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতে লাগিল। ফল হইল, ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট দেশ-বিভাগ ও পাকিস্তানের জন্ম।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরেজ-শাসন বিশেষ কোন পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। এতদিন ইংরেজদিগকে শাসন-কার্য চালাইবার জন্য ফারসী ও আরবী শিখিতে হইত, পাল্কীতে চড়িতে হইত, নৌ-ভ্রমণ করিতে হইত, হুকায় তামাক খাইতে হইত, এমন কি তাঁহাদের অনেকেই পানও খাইতেন। মোটের উপর, মুসলমান দিওয়ানদের সাক্ষাৎ ও জীবন্ত অভিনয় করিতে যাহা যাহা আবশ্যক হইত, তাহার সমস্তই তাঁহারা করিতেন। এমন কি আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে বাইজীর গান ও মোঘলাই খানাপিনার বন্দোবস্ত করিতেও তাঁহারা কসুর করেন নাই।

বাহ্যতঃ মুসলমানদের মন-ভুলানো এরূপ নীতি গ্রহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলার হিন্দুদিগকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল ইংরেজদের অপ্রকাশ্য নীতি। ব্রিটিশ সরকার উদারভাবে হিন্দুদের পূজা-আর্চা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং তাহাদের এই শ্রেণীর কোন কোন অনুষ্ঠানে সেনাদলের মহড়া হইত ও সেলামীতোপ-ধ্বনি করার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুদের পূজা-পার্বণে এইরূপ সরকারী অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা উঠিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, ইংরেজগণ শুধু যে 'যাত্রাগান' শুনিতেন এমন নহে, তাঁহাদের কেহ কেহ 'যাত্রাগান' বাঁধিতেন। এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা কবিওয়ালা এন্‌টনী ফিরিঙ্গীর নাম স্মর্তব্য।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তৃতিতেই দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে অনিবার্য পরিবর্তন দেখা দিল। এই ব্যাপারে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-স্থাপন একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ছিটাফোঁটা আকারে অতঃপর ইংরেজী শিক্ষা দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং হিন্দুগণ ঝোপ বুঝিয়া কোপ দিলেন, আর মুসলমানেরা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে 'ওহাবী আন্দোলন' (১৮৩১–১৮৪৭) ও সিপাহী-বিদ্রোহে (১৮৫৭) মাতিয়া রহিলেন। ফল হইল, হিন্দুদের পুনরুজ্জীবন ও সমৃদ্ধি এবং মুসলমানদের ক্রমাবনতি ও দুর্গতি।

ইংরেজ-আমলের বাংলা-সাহিত্যেও মুসলমানদের এই রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রতিবিম্বিত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ বাংলা-সাহিত্যের একটি দিক নির্ণায়ক স্তম্ভ। এই বৎসরে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজ হইতে ১৮২৫

খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা-গদ্যে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া গদ্যের মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। তখন পর্যন্ত পদ্যের মাধ্যমে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাচীন ধারা বজায় ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলায় হিন্দুগণ প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্যের নূতন গদ্য-ধারার আগমনী-গীতি গাহিয়া চলিল। এই বিষয়েও বাংলার মুসলমানেরা উক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন মুঘল-ঐতিহ্য বহিয়া চলিলেন এবং হিন্দুরা প্রাচীন সাহিত্য-ধারা পরিত্যাগ করিয়া গদ্যে পাশ্চাত্যভাব-পরিপুষ্ট বাংলা-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিলেন। চট্টগ্রামের খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ খান প্রাচীন মুঘল-ঐতিহ্যবাহী শেষ মুসলিম-সাহিত্যিক। তাঁহার ফারসী 'তওয়ারীখ-ই-হামীদিয়াহ' সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বাংলা 'শাহাদৎউদ্যান' (১৮৬৩) ও 'ত্রাণপথ' নামক তাঁহার কাব্যগুলিও উপাদেয়।

বলা বাহুল্য, মুসলমানেরা যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুঘল-ঐতিহ্য বহিয়া চলিয়াছেন (১৮০০ হইতে ১৮৫৭) তখন হিন্দুদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (মৃত্যু ১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১) ও অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২১–১৮৮৭) বাংলা-গদ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব আমদানী করিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪) তাঁহার সৃজনী-শক্তিবলে বাংলা-গদ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবকে বাংলা-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়েই মুসলমানেরা বাংলা-গদ্য গ্রহণ করেন। মীর মুশর্রফ হুসেন-ই (১৮৪৭–১৯১২) মুসলমানদের মধ্যে প্রথম খ্যাতনামা গদ্যলেখক।

উপরের ইংরেজ-আমলে বাংলার মুসলিম-সাধনার দিশারী-স্বরূপ যে-সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রাচীন মুঘল-ঐতিহ্যবাহী বাংলা-সাহিত্য-সাধনাই চলিয়াছে। ইহাকে "প্রাচীন সাহিত্যিক ধারার অনুবর্তন" বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহার সহিত পাশ্চাত্য-প্রভাবের কোন যোগাযোগ নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পরেই তাঁহারা বাংলা-সাহিত্যের নব-গদ্যধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মীর মুশর্রফ হুসেনের (১৮৪৭–১৯১২) 'রত্নবতী' নামক উপন্যাসই আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য-প্রভাবপুষ্ট প্রথম বাংলা গদ্য রচনা বলিয়া মনে হয়। 'রত্নবতী'-র (প্রকা:–২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯) পর হইতে বাংলা সাহিত্যের এই ধারায় মুসলমানেরা যে সাধনা করেন, তাহাকে 'নব্য বাংলা-সাহিত্য-ধারা' নাম দেওয়া যাইতে পারে। পরবর্তী দুই অধ্যায়ে আমরা একে একে বাংলার মুসলমানদের এই সাহিত্যিক ধারার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

৲

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইংরেজ-আমলের মুসলিম বাংলা-সাহিত্য :
প্রাচীন সাহিত্যিক ধারার অনুবর্তন
(১৭৫৭–১৮৬০)

আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, ইংরেজ-আমলের প্রথম একশত বৎসরের মুসলিম-সাহিত্য-সাধনা মুঘল-যুগের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সৃষ্টি মাত্র। ইহাতে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই। তবে, এই সময়ে বাংলা-সাহিত্যে ফারসী-সাহিত্যের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক।

মুঘল-যুগের শেষ দিকে হিন্দুর বাংলা-সাহিত্যেও ফারসী ভাষার প্রভাব অধিক পরিমাণে দেখা যায় বটে, তবে তাহাকে 'মুসলমানী-বাংলা' বলা চলে না। ইহা হিন্দুদিগের ব্যাপক ফারসী চর্চার ফল মাত্র। ফারসী ভাষায় অধিকার ও বিদ্যাবত্তা প্রতিষ্ঠার মানসে, কিংবা মুসলিম-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রকাশের বাহন রূপে ঐ সম্পর্কীয় আলোচনা কালে হিন্দুরা ফারসী শব্দ কাব্যে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। ভারতচন্দ্রের কথায় (মানসিংহ-কাব্যে ব্যবহৃত; ১৭৫২ খ্রী:) ইহাকে 'যাবনী মিশাল ভাষা' বলা চলে, 'দোভাষী-বাংলা' বা 'মুসলমানী-বাংলা' বলা চলে না। বিপ্রদাস পিপিলাই (১৪৯৩ খ্রী:) নামক প্রাচীন হিন্দু কবির 'মনসা-মঙ্গলে', কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী-মঙ্গলে' (১৫৭৬), ঘনরামের (১৭০৯) 'ধর্ম-মঙ্গলে' স্থানবিশেষে (যেখানে মুসলমানদের কথা অথবা যুদ্ধবিগ্রহ ও সাংস্কৃতিক ব্যাপার জড়িত সেখানে) ফারসী বা আরবী শব্দ ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়।

মোট কথা, 'দোভাষী-বাংলা' বা 'মুসলমানী-বাংলা' ইংরেজ আমলের সৃষ্টি। ইহা নিম্ন-বঙ্গ এবং তৎসন্নিহিত 'ওহাবী আন্দোলনের' প্রভাবে প্রভাবিত অঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মুসলমানের মৌখিক ভাষা। এই সম্বন্ধে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন :

> "To this day the peasantry of the Delta is Muhammadan. So firmly did Islam take hold of lower Bengal, that it has developed a religious literature and a popular dialect of its own. The 'patois' known as Musalman Bengali is as distinct from the Urdu of Upper India, as Urdu is different from the Persian of Herat"

> "আজ পর্যন্ত ব-দ্বীপ অঞ্চলের কৃষক-সমাজ মুসলমান। নিম্ন-বঙ্গে ইসলাম এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ইহা এক স্বকীয় ধর্মীয়-সাহিত্য ও লৌকিক উপভাষার উদ্ভব ঘটাইয়াছে। হিরাতের ফারসী-ভাষা হইতে উত্তর-ভারতীয় উর্দু যতখানি পৃথক, 'মুসলমান-বাংলা' নামে পরিচিত এই উপভাষা উর্দু হইতে ততখানি পৃথক।'

হান্টার সাহেব নিম্ন-বঙ্গ বলিতে, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ-পরগনা, কলিকাতা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, বরিশাল ও যশোহরকেই বুঝাইয়াছেন। তিতুমীর (১৮৩১) ও দুধুমিঞা (১৮৪৭) এই অঞ্চলেরই অধিবাসী। তাঁহাদের 'ওহাবী' বা 'ফরায়েজী' নামক ইসলাম ধর্মের সংস্কারমূলক আন্দোলন প্রধানতঃ এই নিম্ন-বঙ্গকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহার পূর্ব হইতেই নব্য বাংলা-ভাষার চর্চা হিন্দুদের হাতে চলিয়া যায়, ইংরেজ-আমলের গোড়া হইতে রাজনৈতিক কারণে তাঁহাদের কাছ হইতে মুসলমানেরা বিমাতাসুলভ ব্যবহার পাইতে থাকেন এবং হিন্দুরা মাতৃসুলভ ব্যবহার লাভ করে। ফলে, নিম্ন-বঙ্গের সাধারণ মুসলমানেরা তাঁহাদের বাংলা-ভাষাকে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের প্রতিবাদস্বরূপ ফারসী, উর্দু ও হিন্দী ভারাক্রান্ত করিয়া এক স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি করিতে থাকেন। এই ভাষা 'ওহাবী' বা 'ফরায়েজী' আন্দোলন হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া এক বিরাট ধর্মীয়-সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পায়। কলিকাতার বটতলার কল্যাণে হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগনার মুসলমানেরা এই সাহিত্য মুদ্রিত করিয়া দেশে ছড়াইতে ছড়াইতে ভাল ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে। এই সেদিন পর্যন্ত বাংলার শিক্ষিত মুসলমানেরা এই সাহিত্যকে 'বটতলার পুঁথি' নামে অবজ্ঞা করিয়াছেন। আজও বাংলা-ভাষায় 'বটতলার পুঁথি' কথাটি সাহিত্যিক অপকর্ষসূচক প্রবচন-রূপে চালু আছে।

বলা বাহুল্য, আমরা এই পরিচ্ছেদে যে প্রাচীন সাহিত্যিক ধারার অনুবর্তনের কথা লিখিতেছি, তাহার অধিকাংশই বাঙালী মুসলমানেরা সাহিত্যিক ভাষার অনুবর্তন। ইহাতে সাহিত্য আছে, রস আছে, শিল্পও আছে। তবে, তাহার বেশীর ভাগই মোগলাই।

মুঘল-যুগের অবসান ও ইংরেজ-যুগের প্রারম্ভকালে একজন খ্যাতনামা কবির জন্ম হয়, তাহার নাম মুহম্মদ রজা (১৬৯১-১৭৬৭)।

১। মুহম্মদ রজা
(১৬৯১–১৭৬৭)

এই কবির জীবনকাল মুঘল ও ইংরেজ যুগের সন্ধি-স্থলে অবস্থিত। অধুনালুপ্ত চট্টগ্রামের 'সত্যবার্তা' কাগজে এই কবির এক বিবরণ প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে প্রকাশিত হয়। এই বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানার বখৎপুর গ্রামের অধিবাসী। তাঁহার বংশধরেরা এই গ্রামে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি। তাঁহাদের বংশ-লতিকা হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে (১০৫৩ মঘী) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (১১২৯ মঘী) পরলোক গমন করেন।

তাঁহার কবি-খ্যাতি শুধু দেশ নহে, বটতলার প্রসাদে তাঁহার 'তমীম-গোলাল' নামক কাব্যখানি মুদ্রিত হইয়া বছর ত্রিশেক পূর্বেও বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হইত ও আনন্দ পরিবেশন করিত। ইহা একখানি কাহিনী-কাব্য। ইহার পূর্ণ নাম 'তমীম-গোলাল ও চতুর্ণ-ছিল্লাল'। এই গ্রন্থে শিমাল-রাজ ইউসুফ জলালের পুত্র তমীম গোলাল এবং শীরাজ-রাজকুমারী চতুর্ণ-ছিল্লালের প্রণয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নায়ক-নায়িকা যৌবনে পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং লাভ করিবার জন্য অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে গন্ধর্ব-মতে তাঁহাদের বিবাহ হইল, কিন্তু মিলন ঘটিবার কোন উপায় দেখা যাইতেছিল না। এই সময়ে—

"দিবসে বসিয়া কন্যা গাঁথে পুষ্পহার।
রাত্রিতে গোলালচন্দ্র গলেতে দিবার॥

যার লাগি এত দুক্ষ দেখা নাহি তার।
কার লাগি প্রতিদিন গাঁথে পুষ্পহার॥"

কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া শীরাজ-রাজ তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিলেন, স্বয়ম্বর-সভা আহূত হইল, দেশ-দেশান্তর হইতে পাণিপ্রার্থী আসিলেন, তমীম-গোলালও উপস্থিত। স্বয়ম্বরের শর্ত ছিল পাঁচটি, যথা– (ক) ভীষণ পার্বত্য অশ্বে জিন লাগাইয়া আরোহণ; (খ) শীরাজ-শহর ধ্বংসকারী ভীষণ অজগরের ধ্বংস সাধন; (গ) শীরাজের মানুষখেকো রাক্ষসীর হত্যা সাধন; (ঘ) শীরাজ নগরীর অনিষ্টকারী বলমিত্র নামক দৈত্যের বন্ধন; এবং (ঙ) শীরাজ বিধ্বস্তকারী রিপুরাজের পরাজয় ঘটানো। তমীম-গোলাল এক এক করিয়া সমুদয় শর্ত পূর্ণ করিয়া চতুর্ণছিল্লালকে লাভ করিলেন। অতঃপর, সুখেই তাঁহাদের জীবন কাটিল।

মুহম্মদ রজার দ্বিতীয় কাব্যের নাম 'মিসরী-জমাল'। ইহাও একটি প্রেমমূলক উপাখ্যান-কাব্য। কুর্বার-রাজ আবদুল করীম শাহের কন্যা মিসরী-জমালের সহিত বিমল-নগরপতি শরীফ সুলতানের পুত্র তোরাব-হামীমের প্রণয়কে কেন্দ্র করিয়া কাব্যখানি রচিত। নায়ক-নায়িকা পরস্পরের চিত্রপট দেখিয়া প্রেমে পড়েন। অতঃপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়া উভয়ের মিলন ঘটে।

গল্পের দিক হইতে মুঘল-যুগের অবসান-কালীন মুসলিম কাব্য-কলার সাধারণ প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার কাব্যে নাই। কিন্তু অন্য দুইটি বিষয়ে তাঁহার কাব্য প্রাচীন ধারার ব্যতিক্রম বলিয়া বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক। প্রথমতঃ, মুঘল-যুগের কাব্যমালার ন্যায় এই কাব্য দুইটিতে দীর্ঘ মঙ্গলাচরণ নাই। কবি মঙ্গলাচরণ দুইটি চরণ-সমন্বিত একটি শ্লোকেই শেষ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষে ভণিতা দেওয়ার প্রাচীন রীতিকে কবি অবহেলা করিয়া অনুচ্ছেদের একেবারে গোড়াতে অথবা সুবিধামত মাঝখানে ভণিতা দিয়াছেন।

২। আলী রজা
(১৬৯৫–১৭৮০)

আলী রজা বাংলার সাধক কবিদের অন্যতম। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার অন্তর্গত 'ওশখাইন' গ্রামে কবির জন্ম হয়। এই গ্রামেই কবির বসতবাটির নিকটে তাঁহার সমাধি ও দরগাহ্ আছে। ইনি সাধারণতঃ 'কানু-ফকীর' নামে পরিচিত। কবির বংশধর এখনও এই গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের কাছ হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, কবি ১১৪২ মঘীতে (১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে মারা যান। কবির পুত্রের নাম শরাফতুল্লাহ্। তিনি প্রায় আশী বৎসর জীবন ধারণ করিয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মারা যান।

আলী রজার গুরুর নাম শাহ্ কিয়ামুদ্দীন। তাঁহার নিজেরও বহু শিষ্য ছিল। তাঁহার এই গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :

(ক) সিরাজ কুলুব, (খ) জ্ঞান-সাগর, (গ) আগম, (ঘ) ধ্যানমালা, (ঙ) যোগ-কালন্দর এবং (চ) ষট্‌চক্রভেদ। এতদ্ব্যতীত, তিনি অসংখ্য মারফতী গান ও পদাবলী রচনা করেন। তাঁহার কোন কোনটি 'রাগমালা' নামক পদাবলী-সংগ্রহে পাওয়া যাইতেছে।

আলী রজার 'জ্ঞান-সাগর' সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 'আগম' ও 'জ্ঞান-সাগর' একই গ্রন্থের দুই ভাগ মাত্র; কিন্তু সেই মূল গ্রন্থের

নাম কি জানা যায় না। তবে প্রথম ভাগের নাম 'আগম' ও দ্বিতীয় ভাগের নাম 'জ্ঞান-সাগর'–এই কথা জানা গিয়াছে। কবি 'আগমে'র গোড়াতেই বলিয়াছেন,–

"হৃদয় প্রদীপ মোর তুমি গুরু সার।
কৃপা কর গাঁথিবারে 'আগম বিচার'॥
প্রভুর গোপত-তত্ত্ব মারফত যে হয়।
সেই মারফত নাম আগম বলয়॥
শাহা কেয়ামদ্দি গুরু জ্ঞান-সুধা ধার।
তোমা কৃপা হইতে গতি আগম আমার॥"

তাঁহার কাব্যের মধ্যে 'তসববুফ্'-এর সহিত যোগশাস্ত্রীয় কথার মিলন ঘটিয়াছে। দারা শিকোহ্ 'মজমউল বহরয়ন্' লিখিয়া যেরূপ হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কথা প্রচার করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই কবির এই গ্রন্থগুলিও এই কথা প্রচার করিতেছে।

৩। মুহম্মদ মুকীম
(আনুমানিক ১৭০০–১৭৭৫)

মুহম্মদ মুকীম এই যুগের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম। তিনি কবি আলী রজার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া কবি শ্রদ্ধাভরে লিখিয়াছেন, "মন মোর লীন জান তান প্রেম-রসে।" ইনি তাঁহার 'গুল-ই-বকাওলী' গ্রন্থে তাঁহার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কবিদের নাম উল্লেখ করিয়া মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের এক অন্ধকার যুগের উপর যে আলোক সম্পাৎ করিয়াছেন, তাহার তুলনা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে বিরল। আমরা কবির এই মূল্যবান রচনাটুকু ইতঃপূর্বে সম্পূর্ণটি উদ্ধৃত করিয়াছি। কবির আত্মবিবরণীর এই অংশও মূল্যবান :

"মুকিম মোহের নাম জ্ঞানহীন অতি।
চাটিগ্রাম রাজ্যে জান আমার বসতি॥
জন্মভূমি নোয়াপাড়া গ্রাম মনোহর।
কুলশীল নরগণ সাধু সদাগর॥
নোয়াপাড়া নাম জান নবীন সদায়।
নব সুখ নব ভোগ নব যুব রায়॥
—(ফায়দুল মুকতদী)

কবি চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামে নব্য বাংলা-সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি নবীন চন্দ্র সেনও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

'গুল-ই-বকাওলী' নামক কাব্যে কবির যে সুদীর্ঘ আত্মবিবরণী পাওয়া যায়, তাহাতে লিপিবদ্ধ আছে যে, কবির পূর্বপুরুষগণ বর্তমান নোয়াখালী জেলার ফেণীর অধিবাসী ছিলেন। রাজনৈতিক গোলযোগে তাঁহাদিগকে ফেণী ত্যাগ করিতে হয় এবং কার্য-ব্যপদেশে চট্টগ্রামের উত্তর দিকবর্তী ফতেয়াবাদে আসিয়া বাস করিতে হয়। কিছুদিন ফতেয়াবাদে বাস করিবার পর, তাঁহার পূর্বপুরুষ–

"ফতেয়াবাদ হন্তে পুনি আজিমপুর গ্রাম।
অল্প দিন রহি তথা আইল এই ঠাম॥
কি কহিব গ্রামবাসী ধিক সুমহৎ।

পশ্চিমে হাল্‌দা নদী শুদ্ধ বারিস্রোত॥
দক্ষিণে সুন্দরপুর ধুরঙ্গ সে পূর্বে।
উত্তরে রাজার-খিল গ্রাম নাম ভবে॥
মধ্যভাগে আজিমপুর কি কহিব ভাষ।
মহাধনী মহাদাতা জ্ঞানে সুপ্রকাশ॥"*

বর্তমানে এই 'আজিমপুর' গ্রাম ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত। এই গ্রামে কবির পূর্বপুরুষ 'বড় সাদা' বাস করিতেন। পরবর্তী কালে এইখান হইতে কবির পূর্বপুরুষ 'নোয়াপাড়া' গ্রামে বাস উঠাইয়াছিলেন। বড় সাদার বড় ছেলে মুহম্মদ আফজল। আফজলের পুত্র সয়্যিদ মুহম্মদ দৌলত। এই সয়্যিদ মুহম্মদ দৌলতের পুত্র হইলেন কবি মুহম্মদ মুকীম। মুকীম শৈশবেই পিতৃহারা হইয়াছিলেন। স্থানীয় কাসিমুদ্দীন চৌধুরীর পুত্র জীবন হুসৈন চৌধুরী তাঁহাকে নিজ ব্যয়ে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। কবি যৌবনে জমিদার আলী আকবর চৌধুরীর সেরেস্তায় কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন। এই সময়ে চট্টগ্রামের শাহ্ ঘাজী শরীফের বংশে শাহ্ আসহাবুদ্দীন দেয়াংগে (চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণে অবস্থিত) আগমন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে কবি তাঁহার 'গুল-ই-বকাওলী' কাব্যে সসম্ভ্রমে নানা কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে যে, শাহ্ আসহাবউদ্দীনের নির্দেশেই কাব্যখানি ফারসী হইতে অনূদিত হইয়াছিল।

"দৈবগতি সে চরণ দেয়াংগে আসিল।
আমিহ সে কার্যগতি তথাতে আছিল॥
সন্ধিযোগে দুইজন এক স্থানে বাস।
তাহাতে শুনিলু এক বাক্য সুপ্রকাশ॥
নর-পরী প্রসঙ্গ এক ফারসী কিতাব।
হেরিয়া কহিল মধুভাষে পরস্তাব॥
তাজে বকাওলী কিচ্ছা ফারসী বয়ান।
বঙ্গ ভাষে মোহাম্মদ মুকিমে যে ভাণ॥"***

এই 'গুল-ই-বকাওলী' কবির প্রথম কাব্য। ইহা তাঁহার প্রৌঢ় বা যৌবনান্ত বয়সের রচনা। ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ হইলেও ইহাতে কবির স্বাধীন রচনা ও সংযোজনা বিস্তর আছে। পল্লবগ্রাহিতার সূত্রেই হউক, অথবা স্বকীয় জ্ঞানবত্তার জন্যই হউক, কবি যে বিবিধ বিষয়ের অধিকারী ছিলেন, তাঁহার এই কাব্যটি ইহার প্রধানতম উদাহরণ। ছন্দ-শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, এমন কি হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিতেন, তাহার সবটুকুই তিনি এই কাব্যের নানা স্থানে ছড়াইয়া দিয়াছেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁহার আশ্চর্য পারদর্শিতা ছিল; তিনি এই শাস্ত্রটি একরূপ সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন। এই দিক হইতে ভাবিতে গেলে, পাণ্ডিত্যে একমাত্র মহাকবি আলাওল ব্যতীত আর কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা চলে না।

তাঁহার কাব্যের বন্দনা-খণ্ডেও অনেক নূতন বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায়। ইহাতে খোদা, রসূল ও আসহাবগণের বন্দনা তো আছেই, তদুপরি তাঁহার পূর্বপুরুষগণের প্রশংসা, চারি পীর, দ্বাদশ ইমাম ও চতুর্দশ সূফী খান্দানের বন্দনাও আছে। ইহার পর,

সপ্ত আকাশ, সপ্ত ভূমি, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ, গিরিরাজি প্রভৃতির নাম করিয়া পৃথিবীর সপ্ত সিংহাসনেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে।

'গুল-ই-বকাওলী' রচনার তারিখ পাওয়া যায় নাই। তথাপি ইহার তারিখ নির্ণয়ে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। তিনি এই কাব্যের প্রারম্ভে চট্টগ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"উত্তরে পর্বতারাশি দক্ষিণে সাগর।
স্বর্গপ্রায় স্থল নাম চাটিগাঁ শহর॥***
ইংরেজ নৃপতি সে যে ফিরিঙ্গীর জাত।
ইসবি ছুচান নিত্য পাদরী সাক্ষাৎ॥****
চিরদিন ইংরাজ এথা মহীপাল।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ তস্করের কাল॥"

ইংরেজগণ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীর কাসিমের কাছ হইতে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'গুল-ই-বকাওলী' রচিত হইয়া থাকিবে। এই কাব্যের পরে কবি আরও তিনখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার পঞ্চম, হয়তো শেষ গ্রন্থ 'ফায়দুল মুকতদী' কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন,—

"প্রেম-রস কাব্য কথা সুগন্ধি শীতল।
'কালাকাম' ভাঙ্গি কৈলু পয়ার নির্মল॥
'মৃগাবতী' নামে আর পরীর নন্দিনী।
মিত্রজনে শুনে সেই অপূর্ব কাহিনী।
মোরে আজ্ঞা দিলা পীর রচিতে পয়ার।
দেশী ভাষে রঙ্গ কথা লোকে বুঝিবার॥
'আয়ূব নবীর কথা' আছিল কিতাবে।
পয়ার না কৈলু তাহে মন্দ কহে সবে॥
সুরস কথন অতি দুষ্ক ব্যবহার।
কিঞ্চিৎ লেখিলু তাহে প্রকাশি পয়ার॥"

কবির 'কালাকাম', 'মৃগাবতী' ও 'আইয়ুব নবীর কথা' নামক কাব্যত্রয়ের কোন পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মনে হয়, 'কালাকাম', 'মৃগাবতী' ও 'আইয়ুব নবীর কথা' ধর্মীয় কাহিনী। ইহা কবি তাঁহার পীর আলী রজার আদেশেই লিখিয়াছিলেন।

কবির পঞ্চম, হয়তো শেষ গ্রন্থের নাম 'ফায়দুল মুকতদী'। ইহা কাব্যকাহিনী নহে, ধর্মীয় গ্রন্থ। ইহার রচনা-কাল সম্বন্ধে কবির উক্তি এইরূপ :—

কিতাব হইল সাঙ্গ যেদিন অবধি।
প্রকাশি কহিয়ে শুন দিন সন আদি॥
ঋতু বেদ চন্দ্র শত আশী আর নয়।
ইতি সার জান মঘী সনের নির্ণয়॥
শ্রাবণের শেষ পক্ষ দিন জুমাবার।
বেলা অবসানে হৈল পয়ার সুমার॥

অঙ্কস্য বামাগতি হিসাবে 'ঋতু বেদ চন্দ্র শত' হয় 'চন্দ্র শত বেদ ঋতু' অর্থাৎ ১০৪৬ এবং তাহার সহিত 'আশী আর নয়' অর্থাৎ ৮৯ যোগ করিলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১১৩৫ মঘী অর্থাৎ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর পরে, মুকীম 'ফায়দুল মুকতদী' রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্য কবির বৃদ্ধ বয়সের রচনা বলিয়া মনে হয়।

৪। মুহম্মদ আলী
(১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত)

কবির আত্মবিবরণী হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি চট্টগ্রামের আজিমনগরের অন্তর্গত 'ইদিলপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কবি মুহম্মদ মুকীমের সমসাময়িক। চট্টগ্রামের প্রশ্ন বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি তাঁহার 'হয়রতু-ল্-ফিকহ্' (হায়রতুল ফেকা) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মুহম্মদ মুকীমের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'লেলাঙ্গ'-এর জমিদার ইউসুফ হাফেজের আদেশে কবি তাঁহার কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা 'ফিকহ্' বা মুসলিম ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহা 'হয়রতু-ল্-ফুকহা' বা 'শাস্ত্রবেত্তাতঙ্ক' নামক মূল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। সত্যই মুসলিম শাস্ত্রবিদ্‌গণের আতঙ্ক সৃষ্টি করে, এমন অদ্ভুত সমস্যা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি :—

"আর এক জাহিল কথা শুন মন করি।
বন্দীতে রাখিছে এক মুসলমানে ধরি॥
অন্নজল ভক্ষ্য দ্রব্য না দেয় খাইবার।
দুই তিন দিন কিবা রাখে অনাহার॥
রান্ধিয়া শূকর মাংস সম্মুখে আনিয়া।
খাইতে করয় আজ্ঞা তাড়িয়া তাড়িয়া॥
পদুত্তর কহ কি ভক্ষিব না ভক্ষিব।
অনাহারে বন্দীতে কিরূপে রহিব॥
খাবার খাইয়া প্রাণ রাখিব তাহার।
না খাইয়া যুক্ত নহে মৃত্যু হইবার॥"

ইহা ছাড়া, তিনি আরও দুইখানি প্রেমমূলক উপাখ্যান-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যগুলির নাম 'শাহাপরী মল্লিকজাদা' ও 'হাসনবানু'। চট্টগ্রামের দক্ষিণে শাহাপরীর দ্বীপ আছে। এখানকার শাহাপরীকে লইয়া চট্টগ্রামে কত কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে! আমরা দুই একটির খবর ইতিপূর্বেই দিয়াছি। 'হাসনবানু' কাব্যের মাত্র দুইটি পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্যামদেশের রাজকুমার হাসনবানু নাম্নী এক সুন্দরীর চিত্রপট দেখিয়া দিওয়ানা হইয়া চলিয়াছেন,—ইহাই প্রাপ্ত দুই পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইয়ার আলী নামক কোন গুণগ্রাহী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া কাব্যটি রচিত হইয়াছিল। এই দুই পত্র হইতে বাংলায় কবির 'ফারসী-ছন্দ' ব্যবহারের একটু নমুনা দিতেছি :—

"মুণ্ড আদি পদাবধি নিরক্ষি।
রূপ-বৃক্ষে বসিল মন-পক্ষী॥
যেই অঙ্গে দৃষ্টি করে কুমারে।
সে অঙ্গেতু না যায় আনান্তরে॥

হেরি মন আঁখি হৈল ভোর।
প্রেম গৃহ কপাট পেটি জোর॥
অচৈতন্য-চৈতন্য-সৈন্য মরি।
সংজ্ঞা কেল্লা লুটি নিল প্রহরী॥****
শ্রীমন্ত এয়ার আলী গুণবান।
রচে মোহাম্মদ আলী আরতি তান॥"

৫। মুহম্মদ কাসিম
(১৭৩০—১৮০০?)

এই কবির মাত্র একটি কাব্য সম্বন্ধে এযাবৎ আলোচিত হইয়াছে ('মাহে-নও', —ফাল্গুন, ১৩৫৮)। মরহুম আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ সাহেব বহুদিন পূর্বে তাঁহার "বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে" এই কবির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। এ-যাবৎ কবির এই কাব্যগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে : (ক) হিতোপদেশ; (খ) সুলতান জমজমা; এবং (গ) সিরাজুল কুলুব (রচনা ১৭৯০)।

কবি তাঁহার 'সিরাজুল কুলুব' নামক কাব্যে সে দীর্ঘ আত্মবিবরণী দিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম শাহ্ আজীজ এবং তিনি নোয়াখালী জেলার 'যুগীদিয়া' নামক 'রাজ্যে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, 'যুগীদিয়া' এখন আর 'রাজ্য' নহে,— একটি গ্রাম মাত্র। পুস্তকটি ১১৯৭ সনে, অর্থাৎ ১১৯৭+৫৯৩=১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙালী মুসলমানকে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মীয় কথা শুনাইয়া সৎপথ দেখাইবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া পুস্তকটি রচিত হইয়াছিল। পুস্তকটি পঞ্চদশ পর্বে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। জিকিরের বয়ান, বিসমিল্লার বয়ান, সূরা ফাতিহার বাখান, নমাজের কথা, রোজার বিবরণ, হাদিসের বচন, রওয়ায়িৎ-ই-হাদিস কথন, গোরের মধ্যে পুণ্য দর্শন, মা-বাপের কাহিনী, কিতাবের বচন, পঞ্চবিংশ সওয়াল, নমাজ কথন, রসূলের কাহিনী, হাশরের বিবরণ, বিহিশ্‌তের কথা।

কবির 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত 'হিতোপদেশের' অনুবাদ নহে; ইহা 'তসব্বুফ' বা সূফী- তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক। জানা যায়, ইহা আরবী 'বুরহানু-ল্-আরিফীন' নামক গ্রন্থের ভাবানুবাদ।

'সুলতান জমজমার' কাহিনী মুসলমানদের মধ্যে সুপরিচিত। মৃত্যুর পর সুলতান জমজমা হজরত ঈসা (আ:)-র চেষ্টায় পুনর্জীবন লাভ করিয়া যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তকটির বর্ণিত বিষয়। পাপের জন্য পারলৌকিক শাস্তি অনিবার্য, এই কথা প্রচার করিবার জন্য পুস্তকটি রচিত।

কবি মুহম্মদ কাসিম শাস্ত্রীয় গ্রন্থকার। তাঁহার গ্রন্থের লিপিকৌশল আলাদা। জনহিতার্থেই এইগুলির প্রচার এবং সার্থকতা। সেই হিসাবে কাব্যগুলি ব্যর্থ নয়।

৬। সয়্যিদ নূরুদ্দীন
(১৭৩০—১৮০০?)

ধর্মগ্রন্থ-রচয়িতা কবিদের মধ্যে সয়্যিদ নূরুদ্দীন অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ। ইনি চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী বলিয়া জানা যায়। এই পর্যন্ত আমরা যতগুলি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ দেখিয়াছি,

তন্মধ্যে ইহার কাব্য যেরূপ জ্ঞানগর্ভ ও মূল আরবী ফারসী অনুসারী, তেমনটি আর কোন গ্রন্থই নহে। ইহা হইতে মনে হয়, কবি জবরদস্ত আলিম ছিলেন। তাঁহার কাব্যগুলির বহু প্রতিলিপি এখন দেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। বাংলা ও আরবী এই উভয়বিধ হরফে তাঁহার কাব্য দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। আরবী হরফে তাঁহার কাব্যের যে সমস্ত প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার প্রাচীনতম তারিখ ১২১৫ মঘী অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। বাংলা প্রতিলিপির কয়েকটি তারিখ ইহার পূর্ববর্তী। সুতরাং মূল কাব্য বাংলা হরফেই রচিত হইয়াছিল। কবির চারিখানি কাব্যের সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, যথা :– (ক) 'দকায়িক' বা 'দকায়িকু-ল্-হকায়িক', (খ) 'মূসার সওয়াল', (গ) 'রাহাতু-ল্-কূলুব' বা 'কিয়ামত নামা', এবং (ঘ) 'হিতোপদেশ' বা 'বুরহানু-ল্-আরিফীন'।

'দকায়িক' বিরাট গ্রন্থ। ইহা ২২ বাইশ বাবে বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহা 'কনজু-দ-দকায়িক' নামক আরবী ফিক্‌হ্ শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ। ইমাম হাফিজুদ্দীন আবু-ল বরকাৎ আব্‌দুল্লাহ্ বিন-আহ্‌মদ্ নস্‌ফী (মৃত্যু ৭১০ হিজরী = ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ) মূল গ্রন্থের রচয়িতা। মূল গ্রন্থের বহু ভাষ্য বর্তমান। এই সমস্ত ভাষ্য কবি নূরুদ্দীন তাঁহার বাংলা 'দকায়িক' গ্রন্থে কতদূর ব্যবহার করিয়াছিলেন বলা যায় না। এই পুস্তকের রচনা সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,–

"সৈয়দ নূরুদ্দীন কয় আজিজ-নন্দন।
বিরচি কহি যে আমি শুন গুণিগণ॥
এগার শ সাতানব্বই সন হৈল যবে।
পুস্তক বাংলা কৈলু শুন নর সবে॥
পুস্তকের বয়াতে যতেক লিখা যায়।
কদাঞ্চিৎ এক মিথ্যা না বুঝ সবায়॥"

ইহা হইতে জানিতে পারা গেল যে, কবির পিতার নাম সয়্যিদ আবদুল আজিজ এবং তিনি 'দকায়িক' গ্রন্থটি ১১৯৭ সনে অর্থাৎ ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন।

কবির 'মূসার সওয়াল' একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। ইহার পত্র-সংখ্যা মাত্র বার। ইহাও মূল গ্রন্থ নহে। ইহা যে কোন ফারসী বা আরবী গ্রন্থের সার-সঙ্কলন, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে অনুবাদ নহে। এই সম্বন্ধে কবি বলেন,

"সওয়ালের বিবরণ কিতাবে দেখিয়া।
রচিলেক নূরুদ্দীন প্রভুকে ভাবিয়া॥"

ইহার বিষয়-বস্তুও ধর্মীয়। প্রশ্নোত্তরচ্ছলেই কাব্যখানি রচিত : প্রশ্নকর্তা হযরত মূসা (আঃ) এবং উত্তরদাতা স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। এইভাবেই ইহাতে নানা নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে :–

"মুসা-নিবেদন শুনি প্রভু করতার।
কৃপাযুক্ত হই তবে লাগে কহিবার॥"

'রাহাতু-ল্-কুলুব' বা 'কিয়ামত-নামা' কাব্যটিও প্রকাণ্ড। ইহার মূল ভিত্তি 'রাহাতু-ল-কুলূব' নামক গ্রন্থ হইলেও, নানা হাদীস ও তফসীরগ্রন্থ মন্থন করিয়া কবি এই গ্রন্থে তাহার সার সংকলন করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থ উনবিংশ বাব বা অধ্যায়ে সমাপ্ত। অধ্যায়গুলি এইরূপ :– কিয়ামতের কথা, কিয়ামতের ভয়, পিতামাতার হক, দোজখের কথা, বিহিশ্‌তের কথা, রিবাখোরের (সুদখোরের) কথা, রোজা-নমাজের কথা, সুরাপানের কথা, নমাজের পুণ্য, কুরআন-পাঠের পুণ্য, স্ত্রী-পুরুষের দায়, মিথ্যা বলার পাপ, পরচর্চার দোষ, হাসদের (ঈর্ষার) কথা, নেকীর কথা, ক্ষমার কথা, অছিয়তের বয়ান, বিবিধ প্রস্তাব। ইহা হইতে দেখা যাইবে, শরাশরায়িৎ মত ইসলামী জীবন যাপন করিতে হইলে, যে সমস্ত নৈতিক উপদেশ পালন করা যেকোন মুসলমানের আবশ্যক, তাহার প্রায় সমস্তই এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। ইহা এ দেশের মুসলমানের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

তাঁহার 'হিতোপদেশ' বা 'বুরহানু-ল্-আরিফীন' তসব্বুফ বা সুফী শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। কবি যে শুধু একজন জবরদস্ত আলিম ছিলেন, তাহা নহে, ইল্‌মু-ৎ-তসব্বুফ বা সুফী শাস্ত্রেও তাঁহার অধিকার ছিল। তবে, তিনি শরীয়ৎ-পন্থা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার কাব্যগুলির কোথাও পীরের কথা নাই। কবি এই কাব্য-রচনার তারিখ এইভাবে দিয়াছেন–

"বারশ তিন সনে পুস্তক লিখা যায়।
পড়িলে শুনিলে জ্ঞান জন্মিবে সবায়
'বোরহানুল আরেফিন' কিতাব দেখিয়া
কহি 'হিত উপদেশ' বাংলা রচিয়া।

৭। সয়্যিদ হামজা
(১৭৫৫–১৮১৫?)
কাব্য-জীবন : ১৭৯০–১৮০৬

বর্তমান হাওড়া-হুগলী জেলার সীমান্তে অবস্থিত ভুরশুট পরগনার 'উদনা' বা 'অদুনা' গ্রামে কবি সয়্যিদ হামজার পৈতৃক নিবাস ছিল। ১১৯৯ সালের (১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের) দামোদর নদের বন্যায় তাঁহাদের বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার সমস্ত ভাসিয়া গেলে, হামজা রায়ড়া পরগনার 'রাণাঘাট' গ্রামে বাস উঠাইয়া আনেন। কবির পিতামহের নাম সয়্যিদ আবদুল কাদির ও পিতার নাম সয়্যিদ হিদায়িতুল্লাহ্। কবির দুই পুত্র ছিল; তাঁহাদের একজনের নাম কলীমুদ্দীন এবং অপরের নাম কুৎবুদ্দীন। এতদ্ব্যতীত, কবির জীবন সম্বন্ধে তাঁহার কাব্যে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এই পর্যন্ত কবির পাঁচখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কবি স্বয়ং তাঁহার 'হাতিম তাঈ' নামক গ্রন্থে চারিখানার উল্লেখ করিয়াছেন।

"কেচ্ছা মধুমালতীর, জঙ্গনামা আমীরের,
জৈগুণ পুঁথি লিখেছিনু আগে।
আল্লাতালা ভালা করে, যাহার খাহেস পরে
হাতেম লিখিনু শেষ ভাগে॥"
–(হাতিম তাঈ)

ইহা হইতে মনে হয়, 'মধুমালতী' কবির প্রথম রচনা, 'আমীর হামজা' দ্বিতীয় রচনা, 'জৈগুনের-পুঁথি' তৃতীয় রচনা এবং 'হাতিম তাঈ' চতুর্থ রচনা। 'সোনাভান' নামে

আরও একখানা কাব্য সৈয়িদ হামজার নামে পাওয়া যায়। অতএব 'সোনাভান' কবির পঞ্চম রচনা।

'মধুমালতী' সম্ভবতঃ ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। কাব্যখানি সয়িদ হামজার কাব্যের মধ্যে নানা কারণে বিশিষ্ট। প্রথমতঃ ইহা নিম্ন-বঙ্গের 'দোভাষী-বাংলা' বা 'মুসলমানী বাংলা'য় রচিত না হইয়া সাধুভাষায় বা তখনকার দিনের সাহিত্যিক ভাষায় রচিত। দ্বিতীয়তঃ, কাব্যকলা ও কল্পনা-বিলাসে, ভাষা-সৌষ্ঠব ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে, কবির সৌন্দর্য-বোধ ও সাবলীল ভাবের অভিব্যক্তিতে এবং স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতায় কাব্যখানি হামজার অন্যান্য কাব্য হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তৃতীয়তঃ, মুসলিম উপাখ্যান ইহার উপজীব্য নয়–ইহা ধর্ম-সম্পৃক্ত সাহিত্যও নহে, শ্রোতাকে নিছক রস-পরিবেশনে তৃপ্ত করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। চতুর্থতঃ, ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, কবি হামজার সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিম্ন-বঙ্গের মুসলমানেরাও কেবল ধর্ম সম্পৃক্ত বিষয় ও মুসলিম উপাখ্যান ব্যতীত কাব্য-গুণান্বিত সাহিত্যিক সৃষ্টির জন্য 'সাধু ভাষারই' আশ্রয় লইতেন এবং ধর্মীয় বিষয় ও মুসলিম উপাখ্যানগুলি 'দোভাষী-বাংলায়' রচনা করিতেন। পঞ্চমতঃ, 'দোভাষী-বাংলার' ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতা, রস-সৃষ্টি করার শক্তি, 'নাজুক'-সৌন্দর্যবিকাশের সামর্থ্য 'সাধুভাষা' হইতে ক্ষীণতর।

কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আমীর হামজা' বিরাট কাব্য। কবি এই কাব্যের গোড়ায় আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ইহা তৎপূর্ববর্তী কবি গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা' নামক ক্ষুদ্র কাব্যের অনুবৃত্তি। কবি মনে করেন, 'আমীর হামজা'র সমস্ত গল্প মূল পুস্তকের অভাবে কবি গরীবুল্লাহ্ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই :–

"তামাম কেতাব যদি পাইত দেওয়ান।
গাঁথিত কবিতা-হার মুক্তার সমান॥
যত দূর আছে তাঁর কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক হয় জারজার॥"

এই সংক্ষিপ্ত কাব্য পাঠ করিয়া জনসাধারণের কাব্য-পিপাসা মিটিতেছে না দেখিয়া কবি এই বিরাট কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। পুস্তক রচনায় হাত দিবার আগেই কবি তৎপূর্ববর্তী কবি গরীবুল্লাহ্‌র প্রতি এইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন,–

"আল্লার মকবুল সাহা গরীবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম॥
পীর শাহ গরীবুল্লা কবিতার গুরু।
আলমে উজালা যার কবিতার শুরু॥
আমার শায়েরী নয় কেতাব সমান।
কেবল বুঝিবে লোক কেচ্ছার বয়ান॥"

এই কাব্যে আমীর হামজার অসংখ্য যুদ্ধ-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সমস্ত কাব্যখানিই পয়ারে লেখা, পুস্তক-শেষে ত্রিপদীতে অতি নগণ্য অংশ লিখিত। পুস্তক রচনা সমাপ্তির তারিখটি এইরূপ :

"বার শত এক সাল বাংলার শেষে।
কেতাব মিলিল মুঝে বহুত কোশেশে॥

করিনু শায়েরী পুঁথি আখেরী কেচ্ছার।
লেখা গেল শাহাদৎ আমীর হামজার॥"

'জৈগুনের পুঁথি' কবির তৃতীয় কাব্য। ১২০৪ সালের ২৩শে আশ্বিন (১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) এই কাব্য রচিত হয়। বীবী জৈগুনের সহিত মুহম্মদ হানিফার যুদ্ধের কথাই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। হানিফার জয় ও বীবী জৈগুনের পরাজয়ই এই যুদ্ধের পরিণতি।

'হাতিম তাঈ' কবির চতুর্থ কাব্য। শাহ ইজ্জতুল্লাহ্ (পুঁথির 'এজতুল্লা') নামক এক ব্যক্তির আদেশে কবি কাব্যখানি রচনা করিতেছিলেন। রচনা কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর, উৎসাহদাতার বিরাগ, ফুরসতের অভাব, মনের অব্যবস্থিত অবস্থা প্রভৃতি নানা কারণে–

"ছয় সওয়ালের কেচ্ছা হইবে তামাম।
কলমের ঘোড়া জেরা তুড়িয়া লাগাম।
আশু নাহি চলে আর কলমের ঘোড়া।
বাগডোর তুড়িয়া হইল ফিরে খাড়া॥
কহিল আমাকে তুমি নাহিক চালাও।
আমি পেরেশানী হই তুমি দুঃখ পাও॥
সর্বলোক শায়ের করিল আল্লা নবী।
দেশেতে রসিক নাই কে শুনিবে কবি॥"

কিছুদিন নিষ্ক্রিয়ভাবে অতিবাহিত হইল। ভূরশুট পরগনার বসন্তপুর গ্রামনিবাসী শেখ চাঁদ মোল্লার পুত্র শেখ কলীমুল্লাহ্ একদিন কবিকে বুঝাইয়া দিলেন যে "আধা কাম করা কভু নাহি শোভা পায়।" সাতপাঁচ ভাবিয়া চিন্তিয়া–

"কালুর কথায় ফের খেঁচিনু কলম।
আল্লা যদি করে পুঁথি করিব খতম॥"

কবি হাতিমের সপ্তম সওয়াল হইতে লিখিয়া কাব্য সমাধা করিবার জন্য আবার "কলমের ঘোড়া খেঁচিলেন।" ঘোড়া এইবার নাচিয়া চলিল। পুঁথিখানিও ধীরে ধীরে সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। চাঁদ মোল্লা ও তৎপুত্র কলীমুল্লাহ কেহই লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু কাব্য শুনার সখ তাঁহাদের ছিল। তাই কাব্যখানি তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন,–

"বহুত খাহেশ আছে, রাখিব তোমার কাছে,
হয় যদি পছন্দ খাতির॥
কথার জেওর দিয়া, নানারূপে সাজাইয়া,
বড় দুঃখে করিনু তৈয়ার।
যে ঘড়ি খাহেশ হবে, লোক দিয়া পড়াইবে,
দেল তাজা হইবে তোমার॥"

সয়িদ হামজার 'হাতিম তাঈ' প্রকাণ্ড গ্রন্থ। 'হাতিম তাঈ' সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া লিখিবার একমাত্র উদ্দেশ্য :–

"লোকের ভালাই কর বুঝিয়া ভালাই।
দেখ না হাতেম তাঈ কি করিল ভাই॥"

'সোনাভান' কবির পঞ্চম ও শেষ গ্রন্থ। ইহা খুবই ক্ষুদ্র কাব্য, 'আমীর হামজা' ও 'হাতেম-তাঈ' গ্রন্থের তুলনায় ইহাকে একেবারেই নগণ্য বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহাও 'দোভাষী বাংলায়' লিখিত।

সৈয়িদ হামজার সমস্ত পুস্তক কলিকাতার বটতলার কল্যাণে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই মুদ্রিত পুস্তক এখনও বাংলার মুসলমানদের ঘরে পাওয়া যায়। মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও বাংলার মুসলমান সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই সমস্ত পুস্তক পড়িয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক কাব্যপিপাসা মিটাইতেন।

৮। কবি চুহর

(১৮০৪–১৮৩৫-এর মধ্যে জীবিত)

কবির আত্মবিবরণী হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহার পূর্বপুরুষ আজমত গৌড় হইতে আসিয়া চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বসতি স্থাপন করেন। আজমতের পুত্র কামাল মৃধাকে মঘরাজা (রোসাঙ্গ-রাজ) প্রশংসা করিয়াছিলেন। কবি এই আজমত হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। কবির পিতার নাম ওয়ায়িজুদ্দীন ও পীরের নাম মুতীউল্লাহ। কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দোহাজারীর জাফর আলী চৌধুরী। এই জাফর আলী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উকীল ছিলেন,—

"চাটিগ্রাম ঢাকা আদি ভ্রমি নানাস্থান।
কলিকাতা টাঁকশালে লিখাইল নাম॥
ভাগ্যবলে কোম্পানীর উকিল হইয়া।
পুনরপি চাটিগ্রামে আইল পলটিয়া॥"

তখন তিনি কবিকে দিয়া কাব্য লিখাইলেন। ইহা হইতে কবির কালও জানিতে পারা যায়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন টাঁকশাল স্থাপিত হয় এবং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা হইতে চতুর্থ উইলিয়মের নাম ও মূর্তি-অঙ্কিত টাকা প্রথম বাহির হয়। সুতরাং কবি এই সময়েরই লোক।

কবির চারিখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মাত্র 'আজর শাহ সমনরুখ' নামক কাব্যখানির পাণ্ডুলিপিই পাওয়া গিয়াছে। কবি তাঁহার পীর মুতীউল্লার আদেশে 'মনোহর মধুমালতী' ও 'দিলারাম' নামক দুইখানি প্রেমমূলক উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। 'আজর শাহা সমনরুখ' ও 'সুজান চিত্রাবতী' রচিত হইয়াছিল জাফর আলী চৌধুরীর আদেশে। এই দুইখানিও প্রেমমূলক উপাখ্যান কাব্য।

'আজর শাহা সমনরুখ' কাব্যের যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার শেষাংশ খণ্ডিত। এই কাব্যের গল্পটি এইরূপ :—

আবিজ দেশের রাজা 'আজর শাহা' অপত্যহীন অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলেন। নানা দিগ্দেশের গুণী ও পণ্ডিতেরা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, রাণী সুনালার গর্ভে কোন সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং মশরিক রাজকন্যা 'সমনরুখ'কে বিবাহ করিলে রাজার সন্তান হইবে। বৃদ্ধ মন্ত্রীর ঘটকালিতে বিবাহ হইয়া গেল। ইহাতে সপত্নী সুনালা ঈর্ষাপরবশ হইয়া রাজাকে দারু-টোনার প্রভাবে বীর্যহীন কাপুরুষ করিয়া দেন এবং দৈবজ্ঞের পরামর্শে রাজা আজর প্রতিষেধক ব্যবহার করিয়া সুস্থ থাকেন। ফলে, সমনরুখের গর্ভে এক সন্তান হয়। সুনালার দারু-টোনায় মাতা ও সন্তানের জীবন বিপন্ন

হয়। মন্ত্রী বহু রাজ্য ঘুরিয়া, বহু অসাধ্য সাধন করিয়া 'ছফাহান' নামক পীরের দোয়ার জন্য বাগদাদে গমন করেন। তথায় পীরের সহিত তাঁহার দেখা হয়।

অতঃপর পুঁথি খণ্ডিত।

কবি চুহর এই কাব্যে আলাওল প্রভৃতি পূর্ব কবিদিগের বহু অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন সত্য, তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্য যথেষ্ট ছিল। তাঁহার কবি-প্রতিভাও বেশ প্রশংসার্হ। এই কাব্যে হিন্দু শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে কবির পাণ্ডিত্যও প্রকট।

৯। হামীদুল্লাহ্ খান

(১৮০৮–১৮৭০)

খানবাহাদুর হামীদুল্লাহ্ খান চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। বিদ্যাবত্তা ও মান-প্রতিপত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়াও, চট্টগ্রাম শহরের 'বক্শীর হাট' নামক বিরাট বাজারের অনতিদূরে 'লামার বাজার' নামক গঞ্জের স্থাপয়িতা-রূপে তিনি আজও এই জেলার লোকের নিকট সুপরিচিত। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা-ভাষায়ও তাঁহার অধিকার কম ছিল না। অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা যায়, তাঁহার জীবনকাল ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময় কবির বয়স প্রায় ৫০ বৎসর ছিল। তিনি কোম্পানী বাহাদুরকে এই সময়ে নানাভাবে সাহায্য করেন বলিয়া, 'খানবাহাদুর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মুঘল যুগের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ইংরেজ-আমলের সাহিত্যিকদের মধ্যে হামীদুল্লাহ্ খান শেষ ব্যক্তি, এই কথা আমরা পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। তাঁহার পরে আর কেহ ইংরেজী-প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া প্রাচীন রীতির অনুসরণ বা অনুকরণ করেন নাই, এমন নহে। প্রকৃতপক্ষে, আরও কেহ কেহ তাঁহার পরেও প্রাচীন ধারার অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদিগকে মুঘল-আমলের ঐতিহ্যবাহী বলা যায় না। ফারসী-সাহিত্যের সহিত গভীর ও সাক্ষাৎ পরিচয় তাঁহাদের ছিল না এবং মুঘলযুগের ফারসী সাহিত্যের বাহ্যিক সাংস্কৃতিক বিকাশ তাঁহাদের মধ্যে সামান্য স্ফূর্ত হইয়াছিল। ফারসী 'তওয়ারীখ-ই-হামীদিয়ার' রচয়িতারূপে হামীদুল্লাহ খান আজও বাংলার ঐতিহাসিক মহলে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত এই ফারসী ইতিহাসটি চট্টগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস না হইলেও, ইহাতে চট্টগ্রামের অনেক প্রাচীন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

যাহা হউক, তিনি যে ফারসীর গোলাপ-কুঞ্জ ত্যাগ করিয়া বাংলা সাহিত্যের কমল-বনেও প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই কথা আজ অনেকেই জানেন না। বাংলা-ভাষায় তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহা নগণ্য হইলেও হৃদয়গ্রাহী। এই পর্যন্ত তাঁহার দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইহার একটির নাম 'ত্রাণপথ' ও অপরটির নাম 'শাহাদতুদ্যান' বা 'গুলজার-ই শাহাদৎ'। তিনি একখানি গদ্যগ্রন্থও লিখিয়াছেন; তাহার বিবরণ এযাবৎ আমাদের হস্তগত হয় নাই। 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

'গুলজার-ই-শাহাদৎ' মহর্রমের ঘটনা সম্বলিত কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির বহু পৃষ্ঠা জুড়িয়া বন্দনা ও ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

কহি কিছু এ পুস্তকে শাহাদত কথা।
মোহমিন উর্ধ্বপদ তাতে আছে যথা॥
যে কারণে নবীবংশ শহীদ হইল।
যেমতে তাহারা স্বর্গে গমন করিল॥***
দেখিলাম আছে বহু বাঙ্গালা ভাষাতে।
পদবন্দ পুস্তকাদি নানা লোক হাতে॥***
শুদ্ধ রওয়ায়িত হতে কিছু কিছু কহি।
চুম্বক সংক্ষেপ মতে কহিতেছি এহি॥***
নাম এ পুস্তকের 'গুলজার শাহাদত'।
বঙ্গ ভাষে 'শাহাদতুদ্যান' সেই মত॥

কবি যখন এই কাব্য রচনা করেন, তখন বয়স পঞ্চান্ন বৎসর। তিনি ফারসী 'আবজদ-রীতির'র মতে 'রমজান ফকৎ' (   ) কথায় পুস্তক রচনার তারিখ দিয়াছেন, যথা :–

"মুহম্মদ হামীদুল্লা খান বাহাদুর।
'শাহাদৎ নামা' যবে রচিল প্রচুর॥
'রমজান ফকত' সে তারিখ তাহার।
জমল হিসাবে মতে সংখ্যা ধর তার॥
সমাপ্ত হইল শাহাদত-নামা জান।
জুমাব্বার আছিলেক সতর রমজান॥
হিজরীর সন হৈল বার শত আশী।
বার শত সত্তর ফাল্গুনার্ধ প্রকাশি॥"

ইহা হইতে দেখা যায়, বাংলা ১২৭০ সালের ১৫ই ফাল্গুন মোতাবেক ১২৮০ হিজরীর সতের রমজান, শুক্রবার এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল। ইংরেজী মতে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পুঁথি রচনা সমাপ্ত হয়, তখন কবির বয়স ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর। সুতরাং, কবি ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'রাহ্-ই-নিজাত' বা 'ত্রাণপথ' রচিত হয়। ইহা ধর্মীয় গ্রন্থ। জনসাধারণকে ধর্মীয় উপদেশ দানই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের এই শ্মশ্রুহীনতার যুগে "দাড়ি রাখন ও কাটনের বিবরণে' কবি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বেশ উপভোগ্য :–

"দাড়ি মুখে দিল প্রভু পুরুষ লক্ষণ।
নারী-খোজা-মুখে দাড়ি না হয় কখন॥
আপনার পুরুষত্বে কি মন্দ দেখিলা।
যার জন্য পুরুষত্ব লক্ষণ ত্যজিলা॥

কবি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্ভবতঃ একখানি ক্ষুদ্র গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইহার নাম জানা যায় নাই। হামীদুল্লাহ্ খানের গ্রন্থগুলি মুঘল-প্রভাবের অবসান ও বাংলা-কাব্যে নব্য ধারার সূচনা–এই দুই যুগের সন্ধি-সময়ের নিদর্শন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইংরেজ আমলের মুসলিম বাংলা সাহিত্য
নব্য বাংলা-সাহিত্য-ধারা
(১৮৫৭–১৯৪৭)

(ক) এই ধারার গতিপথ নির্দেশ

আধুনিক কালের মুসলিম বাংলা-সাহিত্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি, এমনকি সভ্যতারও ব্যাপক বিস্তৃতির ফল। ইংরেজী ভাষার মধ্যস্থতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করায় এই শিক্ষা বাঙালীর মনোরাজ্যে এক নূতন দ্বার খুলিয়া দিল; তাঁহাদের মনের পরিবর্তনে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ও বিবর্তন শুরু হইল। ইতঃপূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইবার পর হইতে দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তৃতির যে প্রচেষ্টা চলিল, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলার মুসলমানেরা সে সুযোগ গ্রহণ করেন নাই ও করিতে পারেন নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীবিপ্লবের পর হইতেই বাধ্য হইয়া মুসলমানেরা ধীরে, অতি ধীরে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। কাজে কাজেই বাংলার মুসলমানেরা বাংলার হিন্দুদের অন্যূন অর্ধ শতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে অলক্ষিতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের যে ক্ষতি সাধিত হইল, তাহা তাঁহারা আজও পূরণ করিতে পারেন নাই।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া গদ্য-রীতি অবলম্বনে যে আধুনিক বাংলা-সাহিত্য ও ভাষা চর্চা আরম্ভ হইল, তাহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে বাংলার মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। অথচ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে গদ্য-রীতির ব্যাপক ব্যবহারই হইল বাংলাদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রবর্তনের সর্বপ্রথম সাহিত্যিক ফল। উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, গল্প, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রবর্তন ও ব্যাপক প্রচার বাংলায় গদ্য-রীতির প্রবর্তনেই সম্ভব হইল। বাংলার সনাতন কাব্য-জগতেও পাশ্চাত্য-প্রভাব ফুটিয়া উঠিল, বাংলার কাব্য রূপ ও রস পরিবর্তন করিয়া অভিনব মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল এবং তাহার সহিত পাশ্চাত্য জগতের গভীর আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইল। বাংলা কাব্য-জগতের এই পরিবর্তন দেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বিতীয় ফল। ১৮০০ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১), অক্ষরকুমার দত্ত, (১৮২১–১৮৮৭) বিহারী লাল চক্রবর্তী (১৮৩৫–১৮৯৪), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪) প্রমুখ সাহিত্যিকদের অক্লান্ত চেষ্টায় 'আধুনিক' বাংলা-সাহিত্যের নানা শাখায় গদ্য-রীতি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও

পাশ্চাত্য-প্রভাব-দীপ্ত কাব্যধারা যখন পূর্ণ-বিবর্তিত, সবে তখনই বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানেরা প্রবেশ করিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের এই যে অর্ধ শতাব্দীরও অধিককালের বিলম্বিত প্রবেশ, ইহাই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে মুসলিম অবদানের স্বল্পতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। তাহারই ফলে তৎকালীন বাংলা-সাহিত্য প্রধানতঃ হিন্দু-ঐতিহ্যবাহী। কেননা, হিন্দুদের কাছ হইতে হিন্দু-ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য ব্যতীত ইসলামী ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য সৃষ্টির আশা বাতুলতা মাত্র।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে হিন্দুদের দ্বারা 'তোতা কাহিনী' বা 'গোলে বকাওলী' জাতীয় পতন-যুগের মুসলিম-ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য প্রচারের চেষ্টা করা হইলেও, উন্নত প্রকৃতির পাশ্চাত্য-প্রভাব ও ভাব-পরিপুষ্ট বাংলা-সাহিত্যের আসরে এইগুলির কদর হয় নাই। কিন্তু মীর মুশর্রফ হুসৈনের (১৮৪৮–১৯১২) 'বিষাদ-সিন্ধু' (প্রথম খণ্ডের প্রকাশ–১৮৮৫) বাংলার হিন্দু-মুসলমান, এমন কি মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুই অধিক পরিমাণে ঘরে ঘরে পাঠ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, হিন্দুদের ন্যায় বাংলার মুসলমানও যদি যথাসময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে সচেতন হইতেন, তবে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তাঁহাদের সৃষ্টি, হিন্দুদের তুলনায় পরিমাণ ও গুণ–এই দুইয়ের কোনটিতেই নিকৃষ্ট বা ন্যূন হইত না। হয়ত নজরুল ইসলাম ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে বহু পূর্বেই আরও অনেক গগনচুম্বী সাহিত্য-প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিত।

১৮০০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫৭ (বরং ১৮৬০) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পদ্য ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীপ্ত মনীষাই আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের এই প্রতিষ্ঠার মূলীভূত কারণ বলিয়া, পাশ্চাত্য পোশাকে বিভূষিত হিন্দু-ঐতিহ্য এই সাহিত্যে অধিকতর পরিস্ফুট। কিন্তু এই হিন্দু-ঐতিহ্যে বাঙ্গালী মুসলমানেরা কখনও প্রভাবিত হন নাই। ভাষায় সংস্কৃত-শব্দের প্রাধান্যকে কখনও হিন্দু-ঐতিহ্য বলা যায় না। আমরা দেখিয়াছি, মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্যিক ভাষা মূলতঃ সংস্কৃত-শব্দ-প্রধান। ইহাকে পরবর্তীকালে 'সাধুভাষা' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। 'মুসলমানী-বাংলা' বা 'দোভাষী-বাংলা' ভাষার মূল কাঠামোটিও 'সাধু-ভাষা'। তবে 'সাধু-ভাষা'-র শব্দের প্রাকৃত ও সংস্কৃত মূলকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিয়া উর্দু বা হিন্দী শব্দের মূল রূপকে গ্রহণ করিবার একটা প্রচেষ্টা 'দোভাষী-বাংলা'-য় ছিল। কিন্তু তাহার ফলে, 'মুসলমানী-বাংলা'-য় যেমন জীবন জিজ্ঞাসাপ্রধান আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইল না, তেমনই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সৃজ্যমান নবীন গদ্যে লিখিত হিন্দুদের ফারসী-ভারাক্রান্ত 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' গোলে বকাওলী' বা 'তোতা কাহিনী'-ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

সিপাহী-বিপ্লবের পরে মুসলমানেরা যখন আধুনিক বাংলা-সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তখনও দেশের মুসলমানদের মধ্যে সাধু বাংলাভাষার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হয় নাই। তখনও সাধারণ মুসলমান আত্মবিস্মৃত। সারাদিন কুলী-মজুরের কাজ করিয়া গতর খাটিয়া পরিশ্রান্ত অবস্থায় সন্ধ্যায় অবসর বিনোদনের জন্য তাহারা 'বটতলার পুঁথি' লইয়া বসিয়া পড়িত। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সামর্থ্য ও অবসর তাহাদের ছিল না। মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় তখনও অতীতে গৌরবের

গোরস্থানে বসিয়া বাঙালী মুসলমানের ভাষা 'বাংলা' কি 'উর্দু'– সে বিচার লইয়া মশগুল। কিছুদিন পরেই সমিতি গড়িয়া, সভা ডাকিয়া, বাংলা-ভাষায় বক্তৃতা দিয়া, তাঁহারা বাংলার জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাংলা নহে, 'দোভাষী-বাংলা'-ও নহে, একেবারে সরাসরিভাবেই 'উর্দু'। তাঁহাদের এই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা অচিরেই বিফল হইল।

এই সময়ে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, কুলী-মজুরের কাজও করা যায় না, বসিয়া খাওয়ারও সামর্থ্য নাই, তখন তাঁহারা ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজ দপ্তরে কেরানী-দপ্তরীর কাজ করিয়া গ্রাম্য মান-মর্যাদা রক্ষায় তৎপর হইলেন। দারিদ্র্যের তাড়নায় ইঁহাদের কেহই উচ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষা পান নাই। কিন্তু, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে তাঁহাদের মানসিক বিকাশে বিশেষ বাধার সৃষ্টিও যে হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। এই সমাজের মধ্য হইতে কতিপয় প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাবই তাহার প্রমাণ। তাঁহাদের মধ্যে মীর মুশর্রফ হুসৈন (১৮৪৮–১৯১২), মওলভী মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৮৩২–১৯১৬), কায়কোবাদ (১৮৫৮–১৯৫২), দাদ আলী (১৮৫২–১৯৩৬), শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯–১৯৩১), রিয়াজুদ্দীন মশহাদী (১৮৫৯–১৯১৯), মোজাম্মেল হক (১৮৬০–১৯৩৩), মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২–১৯৩৩), ডাক্তার আবুল হোসেন (১৮৬০–১৯১৯), মওলভী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ, তসলিমউদ্দীন আহমদ (১৮৫২–১৯২৮), মনশী মোহম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ (১৮৭০–১৯৩০), মৌলভী আব্বাস আলী, কবি আর্জুমন্দ আলী (১৮৭০–১৯১৪), কবি আবু মালি মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৬৫–১৯৫৩), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজায়ী (১৮৪৫–১৯১০?) আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৬৯–১৯৫৩), নওশের আলী খান ইউসুফজায়ী (১৮৬৪–১৯২৪), মওলানা মোহাম্মদ মুনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০) প্রমুখ মুসলিম মনীষী ও সাহিত্যিকই প্রধান।

(খ) আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিকদের পথ-প্রদর্শকদল

১। মীর মুশর্রফ হুসৈন
(১৮৪৮–১৯১২)

মীর সাহেব আধুনিক যুগের মুসলিম বাংলা-সাহিত্যিকদের প্রথম দলের সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি। ইনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮–১৮৯৪) কনিষ্ঠ সমসাময়িক লেখক। তিনি নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার (অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জিলার) 'লাহিনীপাড়া' গ্রামে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খুব বেশী দূর ইংরেজী শিক্ষা পান নাই। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

অতি অল্প বয়সেই তাঁহার সাহিত্যিক-প্রতিভা বিকশিত হয়। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' নামক উপন্যাস ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার একুশ বৎসর বয়সে রচিত ও প্রকাশিত হয়। তাঁহার শেষ গ্রন্থের নাম 'আমার জীবনী'। ইহা বার খণ্ডে ১৯০৮ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'রত্নবতী' ও 'বীবী কুলসুম' প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কাব্য, গীতি-নাট্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য, সমাজ-চিত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি প্রায় ৩০ ত্রিশখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান :–

(১) রত্নবতী—২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯—উপন্যাস
(২) গৌরীসেতু—১৮৭৩—কাব্য
(৩) বসন্তকুমারী—১৮৭৩—নাটক
(৪) জমিদার-দর্পণ—১৮৭৩—নাটক
(৫) এর উপায় কি?—১৮৭৬—প্রহসন
(৬) বিষাদ-সিন্ধু—১৮৮৫-১৮৯১—মহরমের ঘটনাভিত্তিক উপন্যাস
(৭) সঙ্গীত-লহরী—১৮৮৮—গান
(৮) গো-জীবন—১৮৮৯—প্রবন্ধ
(৯) বেহুলা-গীতাভিনয়—১৮৮৯—গীতি-নাট্য
(১০) উদাসীন পথিকের মনের কথা—১৮৯০-১৮৯১—উপন্যাস
(১১) টালা-অভিনয়ে—১৮৯৯—যাত্রা
(১২) তহমিনা—১৮৯৯—উপন্যাস
(১৩) গাজী মিঞার বস্তানী—১৮৯৮-১৮৯৯ সমাজ-চিত্র (রস-রচনা)
(১৪) মৌলুদ শরীফ—১৯০২—গদ্য ও পদ্য, ধর্মীয় গ্রন্থ
(১৫) মুসলমানের বাংলা শিক্ষা—১৯০৩-১৯০৮—শিক্ষা-বিষয়ক
(১৬) বীবী খোদেজার বিবাহ—১৯০৫—কাব্য
(১৭) হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ—১৯০৫—ঐ
(১৮) হজরত বেলালের জীবনী—১৯০৫—ঐ
(১৯) হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ—১৯০৫—ঐ
(২০) মদীনার গৌরব—১৯০৬—ঐ
(২১) মোসলেম বীরত্ব—১৯০৭—ঐ
(২২) ইসলামের জয়—১৯০৮—গদ্য-পদ্য, (ধর্মীয় গ্রন্থ)
(২৩) বাজীমাৎ—১৯০৮—কবিতা
(২৪) আমার জীবনী—১৯০৮—১৯১০—আত্মজীবনী
(২৫) বীবী কুলসুম—১৯১০—উপন্যাস।

উপন্যাস, জীবনী, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, গান—এমন কোন সাহিত্যিক বিষয় নাই, যাহা মীর সাহেব বাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' আজও অসাধারণ জনপ্রিয় গ্রন্থ। মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাঁহাকে কাঁদাইয়াছিল। মুসলিম গৌরব-গাথা তাঁহার জীবনকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি নানা কাব্যে বাংলার মুসলমানকে প্রাচীন মুসলিম গৌরব ও ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

২। কায়কোবাদ
(১৮৫৮—১৯৫২)

তাঁহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ কাজিম আল্‌-কুরৈশী। বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিন বৎসরের বড়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবী। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা জিলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত 'আগলা-পূর্বপাড়া' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুরের গোড়াইল ছিল। তিনি বার বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। ইহার পূর্বেই তাঁহার মা মারা যান। তিনি তাঁহার মামার বাসায় থাকিয়া ঢাকায় লেখাপড়া শিখেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্বেই লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া তিনি ডাক-বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন

এবং সরকারী চাকুরির সহিত জীবনব্যাপী কাব্যসাধনায় রত থাকিয়া ১৯৫২ ইংরেজীতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন।

ছাত্র-জীবনে তিনি দুইটি কবিতা সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'বিরহ-বিলাস' এবং 'কুসুম-কানন' নামে তরুণ কবির কবিতা সঙ্কলন দুইটি পাঠ করিয়া এক তরুণী তাঁহার প্রতি ভক্তিমতী হইয়া উঠেন; তাঁহার নাম 'গিরিবালা'। ইহা কবির কাব্য রচনায় বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে। কবি তাঁহার 'অশ্রুমালা' নামক কাব্যের কয়েকটি কবিতা এই গিরিবালার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। 'অশ্রুমালা' কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ হইলেও, প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহার প্রকাশের পরেই বাংলা কাব্য-জগতে কবি অভিনন্দিত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১১ সালে) কবির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মহাশ্মশান' কাব্য প্রকাশিত হইল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় ও আহমদ শাহ্‌ আবদালীর বিজয়কাহিনী এই মহাকাব্যে কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের মহাকাব্যকার হিসাবে তাঁহাকে মধুসূদন-পরবর্তী হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের সহিত স্থান দিতে হইবে। তাঁহার কাহিনী-কাব্য 'শিব-মন্দির' ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'শ্মশান-ভস্ম' তাঁহার রচিত আর একটি কাহিনী-কাব্য। তাঁহার শেষ মহাকাব্য 'মহরম শরীফ' ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'অমিয়-ধারা' নামক গীতিকাব্যখানি প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে।

এতদ্ব্যতীত, তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আটখানি। এই গ্রন্থগুলির নাম :— (১) প্রেমের ফুল, (২) প্রেমের রাণী, (৩) প্রেমের তীর্থ, (৪) মন্দাকিনী-ধারা, (৫) অনুতপ্ত মুসলমান, (৬) প্রেম-কুঞ্জ বা বড়পীর, (৭) প্রেম-পারিজাত ও (৮) উপদেশ-রত্নাবলী।

কায়কোবাদের প্রতিভা গীতি-কবির। তাঁহার মহাকাব্যগুলির মূল সুর গীতিমধুর। তথাপি মহাকাব্য রচনায় তাঁহার বিরাম ছিল না। জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলাই তাঁহার কাব্য-সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য।

৩। শেখ আবদুর রহীম
(১৮৫৯—১৯৩১)

ইনি চব্বিশ-পরগনা জিলার বশীরহাট মহকুমার বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত 'মুহম্মদপুর' গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। টাকীর জমিদার রাধামাধব বসুর অর্থানুকুল্যে তিনি এন্ট্রান্স পর্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তিনি 'সুধাকর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদন ও প্রকাশ শুরু করেন। 'মিহির ও সুধাকর' তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গ-ভঙ্গ' আন্দোলনে শেখ সাহেব এই পত্রিকার মারফৎ মুসলমানদের পক্ষে প্রচার-কার্য চালান। ফলে 'মিহির ও সুধাকর' বন্ধ হইয়া যায়। তারপর তিনি 'মোসলেম-হিতৈষী' কাগজ প্রকাশ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহাও বন্ধ হয়। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে এইগুলিই প্রধান :—

(১) হজরত মোহাম্মদ (দ:) জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি—১৮৮৭
(২) ইসলাম-তত্ত্ব—১৮৮৭
(৩) নমাজ-তত্ত্ব—১৮৯৮

(৪) হজ-বিধি-১৯০৩
(৫) ইসলাম ইতিবৃত্ত-১৯১০
(৬) প্রণয়-যাত্রী (অনুবাদ)-১৯২০
(৭) ইসলাম নীতি (প্রথম ভাগ)-১৯২৫
(৮) কোরান ও হাদিসের উপদেশাবলী-১৯২৬
(৯) ইসলাম নীতি (দ্বিতীয় ভাগ)-১৯২৭
(১০) রোজা-তত্ত্ব-১৯২৭
(১১) খোৎবা-১৯২৮

"হজরত মোহাম্মদ (দ:) জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি" তাঁহার খ্যাতনামা গ্রন্থ। তাঁহার পূর্বে আর কোন মুসলমান হজরতের জীবনী লিখেন নাই। ইহা হজরতের একটি প্রামাণিক জীবনী।

৪। দাদ আলী
(১৮৫২-১৯৩৬)

নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমার (এখনকার কুষ্টিয়া জিলার) 'আটি' গ্রামে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কোন উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই; তথাপি তাঁহার মধ্যে অতি অল্প বয়স হইতেই কাব্য-প্রতিভা স্ফুরিত হইতেছিল। অনুভূতির গভীরতা তাঁহার কাব্যে ছিল, অবশ্য উচ্চ ভাব তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায় না।

দাদ আলীর প্রথম কাব্যের নাম 'ভাঙ্গাপ্রাণ'। ইহা তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ অবলম্বনে রচিত কবিতার সমষ্টি। তাঁহার 'শান্তিকুঞ্জ' আর একখানি কাব্যগ্রন্থ; আধ্যাত্মিক ভাব অবলম্বনে রচিত কবিতার গুচ্ছ হিসাবে এই কাব্যখানি আনন্দদায়ক। কবির 'আশেকে-রসূল' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) কাব্যখানি বাংলা 'নাতিয়া' শ্রেণীর কবিতা ও গীতি-সমষ্টি। ইহা এক সময় বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে গীত হইত। ইহার 'আখেরে মওত' বা 'অন্তিম মৃত্যু' নামক কাব্যখানি মৃত্যুর কথা স্মরণে লিখিত।

৫। মোজাম্মেল হক
(১৮৬০-১৯৩৩)

ইনি নদীয়া জিলার শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। বিশেষ উচ্চ শিক্ষা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তবে বাংলা, ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান :

(১) কুসুমাঞ্জলি-কবিতা
(২) প্রেমহার-ঐ
(৩) জাতীয় ফোয়ারা-ঐ
(৪) অপূর্বদর্শন-কাব্য
(৫) হজরত মোহাম্মদ চরিতামৃত-ঐ
(৬) মহর্ষি মনসুর-জীবনী (প্র: সং-১৮৯৬)
(৭) তাপস-কাহিনী-জীবনী (দ্বি: সং-১৯১৪)
(৮) বড়পীর চরিত-জীবনী

(৯) ফিরদৌসী চরিত-জীবনী (প্র: সং-১৮৯৮)
(১০) টিপু সুলতান-ইতিহাস (১৯৩১)
(১১) শাহনামা-(কাব্য-কাহিনী) (১৯০৯)
(১২) হাতেম তাঈ-কাহিনী (১৯১৯)
(১৩) জোহরা-উপন্যাস (১৯১৭:-প্রথম প্রকাশ-১৯৩৫)
(১৪) দরাফ খান গাজী-উপন্যাস (১৯১৯)
(১৫) রঙ্গিলাবাঈ-উপন্যাস (অপ্রকাশিত)
(১৬) খাজা ময়ীন উদ্দীন চিশতী (১৯১৮)

তাঁহার 'জাতীয় ফোয়ারা' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং তাঁহার সম্পাদিত 'লহরী' (১৯০০) নামক কবিতা-পত্রিকা একদা মুসলমানকে নব-প্রেরণা ও জাতীয় গৌরবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার 'হজরত মোহাম্মদ' জীবনী-কাব্য হিসাবে সার্থক সৃষ্টি এবং 'ফিরদৌসী-চরিত', 'মহর্ষি-মনসূর' ও 'শাহনামা' চমৎকার গদ্যগ্রন্থ। তিনি 'টিপু সুলতান' নামক গদ্যগ্রন্থে মহীশূরের বীর-সুলতানের বীরত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাংলা 'সাধু-ভাষায়' তাঁহার মত দক্ষতা তখন হিন্দুরাও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

৬। আবদুল করীম সাহিত্য-বিশারদ
(১৮৬৯-১৯৫৩)

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পটিয়া থানার সংলগ্ন 'সুচক্রদণ্ডী' গ্রামে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মের পূর্বে তিনি পিতৃহীন হইয়া পিতামহ ও পিতৃব্যের হাতে মানুষ হইয়াছিলেন। ছাত্র-জীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং সংস্কৃত-সহ এনট্রেন্স পাশ করেন। তিনি এফ. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন এবং দীর্ঘ অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। বিভাগীয় ইনসপেকটার অব্ স্কুলস-এর অফিসে দ্বিতীয় কেরানীর কাজ করিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন।

বাংলার মুসলমানের অতীত সাহিত্য-সম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জাতির লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার তীব্র বাসনা তাঁহার মনে অতি অল্প বয়স হইতেই জাগরিত হয়। এই বাসনাই তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনায় পরিণত হইয়াছিল। এইভাবে প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারে লিপ্ত হইয়া তিনি প্রায় দুই হাজার বাংলা পুস্তকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উদ্ধার করেন। তাহার মধ্যে মুসলমান গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা প্রায় বার শত। এই সমস্ত পাণ্ডুলিপি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দু গ্রন্থকারদের পাণ্ডুলিপিগুলি রাজশাহীর 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি' রক্ষার ভার পাইয়াছেন।

তিনি বাংলা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির শুধু যে সংগ্রাহক ছিলেন, তাহা নহে; সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির গবেষণার কাজে তিনি সমগ্র জীবন বিভোর হইয়া কাটাইয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তকের ন্যায় অনর্গল প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাঠ করার ক্ষমতায় আমি জীবনে আর কাহাকেও তাঁহার সমকক্ষ দেখি নাই। তাঁহার এই জীবনব্যাপী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও গবেষণার ফলে, তিনি প্রায় দেড় শতাধিক প্রাচীন মুসলিম কবি ও গ্রন্থকার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই সাধনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মধ্যযুগে, এমনকি

ইংরেজ-আমলের প্রথম একশত বৎসর পর্যন্ত, বাংলা-সাহিত্যসাধনায় মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে অগ্রগামী ও উন্নত ছিলেন।

তাঁহার দীর্ঘ জীবনের ফল স্বরূপ তিনি বাংলার মুসলমানকে প্রায় ছয় শতাধিক মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দান করিয়াছেন। চট্টগ্রামের পণ্ডিত-সমাজ তাঁহাকে 'সাহিত্য-বিশারদ' এবং নদীয়ার বিদ্বন্মণ্ডলী 'সাহিত্য-সাগর' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও গবেষণার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারও তাঁহাকে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) 'সাহিত্যিক বৃত্তি' দিয়া সম্মানিত করেন।

প্রাচীন পুস্তক সম্পাদনেও তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রাচীন পুস্তক সম্পাদন করিয়াছিলেন। তৎসম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ-বিজয়', রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' এবং আলী রাজার 'জ্ঞান-সাগর' বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য-গবেষকদের প্রধান সহচর। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির চট্টগ্রাম অধিবেশনের (১৯১৮ সালে) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-রূপে যে অভিভাষণ দান করেন, তাহাও অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান। এতদ্ব্যতীত, তিনি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সহিত 'আরাকান-রাজ সভায় বাংলা-সাহিত্য' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার মৌলিক গবেষণার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। তৎসম্পাদিত আলাওলের 'পদ্মাবতী' এবং 'মুসলিম প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামক পুস্তকের চারি খণ্ডের সমস্ত মাল-মসলা সাহিত্য-বিশারদেরই দান।

৭। মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী
(১৮৭৫–১৯৫০)

চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার 'বরমা' গ্রামে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দুতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজী-ভাষায় তিনি কাজ চালাইবার মত শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার দান অপরিসীম। তাঁহার জীবন সমাজ-সেবা ও দেশ-সেবায় উৎসর্গিত হইয়াছিল। চট্টগ্রামে 'ইসলামাবাদ টাউন ব্যাঙ্ক' ও 'এতীমখানা' তাঁহার জীবনের দুইটি অক্ষয় কীর্তি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পূর্বে দেশবাসী তাঁহাকে বাংলার আইনসভার সদস্যপদে নির্বাচন করেন।

বক্তা হিসাবে ইসলামাবাদী বাংলার বাহিরেও সুপরিচিত ছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে বাংলায় তাঁহার নাম জানে না, এমন লোক নাই। মাসিক 'আল্-ইসলাম' এবং 'দৈনিক সুলতান' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হন।

ইসলামাবাদীর জীবন ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি-চর্চায় অতিবাহিত হইলেও, সাহিত্য-সেবা তিনি কম করেন নাই। তাঁহার 'খগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান' 'ভারতে মুসলমান-সভ্যতা', 'ভারতে ইসলাম প্রচার' প্রভৃতি গ্রন্থ মৌলিক গবেষণায় ভরপুর। বর্তমান মুসলিম-জগৎ সম্বন্ধে তিনি কতটা সজাগ ছিলেন, তাঁহার 'মুসলিম জগতের অভ্যুত্থান' ও 'কনষ্টান্টিনোপল' নামক গ্রন্থদ্বয় সে-সাক্ষ্য আজও বহন

করিতেছে। 'কোরান ও রাজনীতি' এবং 'কোরান ও স্বাধীনতার বাণী' তাঁহার রাজনৈতিক প্রজ্ঞাদীপ্ত মূল্যবান গ্রন্থ। 'নিজামুদ্দীন আউলিয়া' তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ। 'সমাজ-সংস্কার', 'সুদ-সমস্যা' 'নিম্নশিক্ষা' ও 'শিক্ষা-কর' প্রভৃতি পুস্তিকাসমূহে তিনি উন্নত চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, তৎসম্পাদিত 'আল-ইসলাম' পত্রিকায় তাঁহার বহু চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'কোরান ও বিজ্ঞান' নামক তাঁহার ধারাবাহিক প্রবন্ধটি, তাঁহার ইসলামী মনীষার সহিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে যোগ-সাধন করিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

আধুনিক যুগের বাংলা-সাহিত্যিকদের দলে ইঁহারা ছাড়া আরও কয়েকজন মনীষী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী (মৃত্যু– ১৯১৯), মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১–১৯০৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইঁহারাই আধুনিক যুগের বাংলা-সাহিত্যে আমাদের পথিকৃৎ। সমগ্র বাংলা-সাহিত্যে ইঁহাদের দান সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনকে বাদ দিলে সেই যুগের অন্যান্য হিন্দু সাহিত্যিকদের তুলনায় ইঁহাদের সাহিত্যিক দান উৎকৃষ্ট বই নিকৃষ্ট নহে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা বাঙালী হিন্দুর মধ্যে হিন্দু-ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়াছিল। এইযুগের বাংলা-সাহিত্যে তাহা নানাভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে ঠিক তেমনিভাবে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় অল্প হইলেও, এই শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম-ঐতিহ্য ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ জাগাইয়াছে। এ যুগের রচিত মুসলিম বাংলা-সাহিত্যের আদ্যন্ত ইহারই চিত্রে ভরপুর। এই সময়কার বাংলা-সাহিত্যের চর্চা করিয়া বাঙালী মুসলমান হিন্দু-ভাবাপন্ন ও হিন্দু-জাতীয়তায় প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, এই অপবাদের মূলে কোন সত্য নাই। কারণ এই যুগের মুসলিম সাহিত্য-সাধনা ইহার বিপরীত প্রমাণ আজও বহন করিতেছে।

পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাব বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা মূলতঃ এক–একেবারেই এক; ইহাকে আত্মবিশ্লেষণের প্রতিক্রিয়া নামে অভিহিত করা যায়।

আত্মবিশ্লেষণের ফলেই আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচিতি ঘটে। এইখানে আসিয়াই বাংলার হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন পথ ধরিল। তাঁহারা বুঝিলেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু হিন্দুই এবং মুসলমান মুসলমানই, তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া একজাতি হইতে পারে নাই ও পারিবে না। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করিলেন, মধ্যযুগের বিশেষ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়ের হিন্দু-মুসলমান-সংস্কৃতি-সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বারংবার মুসলমানদের সাহিত্যে এই যুগের এই বোধ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মীর মুশর্রফ হুসৈন হইতে আরম্ভ করিয়া ইসলামাবাদী পর্যন্ত সকলেই প্রাচীন মুসলিম কাহিনী, ইতিহাস, শৌর্য-বীর্যের কথা কহিয়া কিংবা বীরত্ব-গাথা গাহিয়া বাংলার জীবন্মৃত মুসলমানকে জাগাইবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা আবার জাগিয়া উঠিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ বিভক্ত হইল। মুসলমানেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু, ইহা টিকিল না, কয়েক বৎসরের মধ্যে (১৯০৫–১৯১০) হিন্দুরা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন শুরু করিলেন; সেই আন্দোলনের ফলেই বৃটিশ সরকার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিলেন।

(গ) আধুনিক বাংলা-সাহিত্যিকদের মুসলিম পথিকৃৎগণ

আমাদের সাহিত্যিকদের দ্বিতীয় দল মীর মুশর্রফ হুসৈন প্রমুখ প্রথম দলের আরব্ধকার্য গ্রহণ করিলেন। এই দল প্রথম দল হইতে সংখ্যায় অনেক অধিক হইল। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁহাদের দান অধিকতর ভাব-সমৃদ্ধ, মূল্যবান ও সুদূরপ্রসারী হইল। এই দ্বিতীয় দলের পুরোভাগে যিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি মুসলিম বঙ্গের খ্যাতনামা বক্তা, কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও সমাজসেবী সয়িদ আবু মুহম্মদ ইসমাঈল হুসৈন সিরাজী।

১। সৈয়িদ ইসমাঈল হুসৈন সিরাজী
(১৮৮০–১৯৩১)

পাবনা জিলার অন্তর্গত 'সিরাজগঞ্জে' ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যনিবন্ধন উচ্চ শিক্ষা লাভের বিশেষ সুযোগ তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। তিনি কেবল ব্যক্তিগত চেষ্টায় যে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। দেশ ও জাতির সেবা করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল; এই ব্রত পালনের জন্য তিনি বক্তৃতা প্রদান ও লেখনী চালনাকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার গৈরিক-নিস্রাবের মত অনলবর্ষী বক্তৃতায় বাংলার সুপ্ত মুসলমানের ঘুমের ঘোর কাটিয়া যায় ও সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনায় মুসলমান আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পায়। পরবর্তী যুগের কবি নজরুল তাঁহারই মানস-সন্তান।

তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অপরাজেয় সেনানায়ক ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহাকে বৃটিশের হাতে বহু বিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এক ধারে ইংরেজ ও অন্য ধারে হিন্দু, এই দুই দলের সহিত তিনি কথা ও কাজে সব্যসাচীর মত আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'অনল-প্রবাহ' (১৯০০) নামক কাব্যই এই সংগ্রামের প্রধান কীর্তিস্তম্ভ। এই কাব্যে তিনি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'ভারত-সঙ্গীত' নামক গাথার ছন্দে যে অনলোদ্‌গার করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজ কামানের অনল-বর্ষণ হইতেও ফলদায়ক হইয়া উঠে। ইংরেজ সরকার বাধ্য হইয়াই 'অনল-প্রবাহ'-কাব্য বাজেয়াপ্ত করেন।

তাঁহার সেবাধর্ম, ইসলাম ও মুসলিম-প্রীতি এবং স্বাজাত্য-বোধ এতই প্রবল ছিল যে, তিনি স্বাধীনতার জন্য আজীবন ভারতীয় কংগ্রেসের একজন খ্যাতনামা সদস্য ও জন-নায়করূপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলেও, বিগত বলকান যুদ্ধে তুর্কীর রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া পড়ায় সদল-বলে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের পরবর্তীকালীন সভাপতি ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারী-সহ তুরস্কে গমন করেন (১৯১২)। তথায় তিনি প্রায় দুই বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিয়া তুর্কীদিগের সেবাকার্যে এতই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন যে, তুরস্কের সুলতান তাঁহাকে 'গাজী' উপাধি এবং বহু মূল্যবান খেলাত দান করেন। তুরস্কের রাজ-দরবার হইতে এই উপাধি ও খেলাত গ্রহণকালে তিনি তুর্কী ভাষাতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া যান। তাঁহার এই সমস্ত অভিজ্ঞতা 'তুরস্ক ভ্রমণ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা একখানি উপাদেয় ভ্রমণ-কাহিনী।

তিনি দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার স্বল্প আয়ের জন্য নহে। তিনি 'দয়ার সাগর' নামে পরিচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও দয়ায় হার মানাইয়া দেন। গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া ও বহু বক্তৃতা দিয়া তাঁহার প্রচুর আয় হইত। তিনি বাড়িতে দরিদ্র ছাত্রের জন্য

দান-সত্র খুলিয়া তাহা খরচ করিয়া দিতেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য তিনি জীবনপাত করিয়াছেন। তাঁহার 'স্ত্রী-শিক্ষা' জ্ঞানীর কল্পনা-বিলাস নহে; ইহা তাঁহার কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রক্ষার নিদর্শন; তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা বহু; তন্মধ্যে এগুলি প্রধান :—

(১) অনল-প্রবাহ (১৯০০)—মুসলিম গৌরব ঘোষণার অপূর্ব গাথা।
(২) উচ্ছ্বাস (১৯০৭)—কবিতা
(৩) উদ্বোধন (১৯০৭)—ঐ
(৪) নব-উদ্দীপনা (১৯০৭)—ঐ
(৫) রায়-নন্দিনী (১৯১৮)—ঐতিহাসিক উপন্যাস
(৬) নূরুদ্দীন (১৯২৩?)—ঐ
(৭) তারাবাঈ (১৯২২)—ঐ
(৮) ফিরোজা বেগম (১৯২৪?) উপন্যাস
(৯) তুরস্ক-ভ্রমণ (১৯১৩)—ভ্রমণ-বৃত্তান্ত
(১০) স্ত্রী-শিক্ষা—সামাজিক প্রবন্ধ
(১১) তুর্কী-নারী জীবন (১৯১৩?)—সাময়িক ইতিহাস
(১২) সঙ্গীত-সঞ্জীবনী (১৯১৫)—গীতিকাব্য
(১৩) প্রেমাঞ্জলি (১৯১৬)—ঐ
(১৪) স্পেন-বিজয় কাব্য (১৯১৪)—মহাকাব্য
(১৫) সুচিন্তা —প্রবন্ধ
(১৬) স্বজাতি-প্রেম (১৯০৯)—প্রবন্ধ
(১৭) আদব-কায়দা শিক্ষা (১০০৭)—সামাজিক প্রবন্ধ
(১৮) স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬)—সাংস্কৃতিক ইতিহাস
(১৯) কারা-কাহিনী—অপ্রকাশিত
(২০) মহাশিক্ষা কাব্য (১৯১০ সমাপ্ত)—অপ্রকাশিত মহাকাব্য
(২১) সিরিয়া ভ্রমণ—অপ্রকাশিত
(২২) তুরস্ক-ভ্রমণ (২য় খণ্ড)—অপ্রকাশিত

২। মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী
(১৮৮৬–১৯৩৮)

ফরীদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত 'মাগুড়াডাঙ্গী' নামক গ্রামে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৩ বঙ্গাব্দে) তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন; কিন্তু বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়া তিনি স্বাস্থ্যের অজুহাতে পাঠে ক্ষান্ত দেন। তিনি কয়েক বৎসর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড স্কুলে শিক্ষকতা করেন, কিন্তু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ দিয়া শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। অতঃপর দেশ-সেবা ও সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়।

তাঁহার 'শান্তিধারা' বাংলা-গদ্যের এক চমৎকার নির্দশন। এই গ্রন্থে 'ইসলামের স্বরূপ', 'রমজান', 'আজান', 'নমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে ইসলামের আত্মা পুষ্পের স্বাভাবিক বিকাশের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি সত্যই বলিয়াছেন,— "পুষ্পের যাহা সুরভি, পল্লবের যাহা শ্যামলতা, দিগন্ত-বিস্তৃত গগনের যাহা অসীম নীলিমা, ইসলাম সেই সুরেরই ঝঙ্কার।" এই পুস্তকের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে এই ঝঙ্কারই বাজিয়াছে।

'মানব-মুকুটে' তিনি হজরত মুহম্মদ (দ:)-এর চরিত্র-মাহাত্ম্য যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার 'নূরনবী' বাংলা শিশু-সাহিত্যের যুগান্তকারী গ্রন্থ। রূপকথার ভাষার এমন চমৎকারভাবে হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গীতে হজরতের জীবনী লিখিতে পারা যায়,—এমন চিন্তা 'নূরনবী' প্রকাশের পূর্বে কেহ মনে স্থান দিতে পারে নাই। তাঁহার 'ধর্মের কাহিনী'-ও (১৯১৪) মুল্যবান গ্রন্থ।

পুস্তক রচনা ব্যতীত মাসিক পত্রিকা পরিচালনায়ও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি মুসলিম বঙ্গের সুপরিচিত সাহিত্য-মাসিক 'কোহিনূরের' প্রাণস্বরূপ ছিলেন। মুলতঃ প্রবন্ধকার হইলেও গল্প লেখায়ও তাঁহার হাত ছিল। বাংলা-সাহিত্যের জন্য তিনি কতখানি দরদ পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহার 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান' নামক প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশে ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"তবে আস হে মোসলেম সাহিত্য-কাননের কলকণ্ঠবিহঙ্গকুল! বঙ্গ-সাহিত্য-কুঞ্জে আবার তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। পীত-অম্বরতল মুখরিত করিয়া আবার তোমরা ফিরিয়া আস। অবসাদ ভোগ করিয়া আমরা আড়ষ্ট হইয়াছি, তোমাদের সঞ্জীবনী রাগিণী শুনাও হে! সংসারের কর্ম-রৌদ্রে পুড়িয়া আমাদের দেহ-মন শুষ্ক ও কর্কশ হইয়াছে। তোমাদের সঙ্গীতের পীযূষ-প্লাবনে জীবন সরস কর হে। আস কায়কোবাদ, ফজলুল করিম, মোজাম্মেল হক, বাঁশরী ও ভেরী আবার তেমনি করিয়া বাজাও দেখি; আমরা উল্লাসে ও আবেগে কর্মপথে অগ্রসর হই। আস এমদাদুল হক, এমদাদ আলী, আবদুল করিম, ওসমান আলী, একরাম আলী; রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনা-গবেষণায় আমাদিগের পথ তেমনিভাবে উজ্জ্বল করিয়া তোল! আর আস নব-নব ভাবে উল্লসিত শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়, সাদরে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। সাহিত্যের আসর তোমাদিগের গীত-ধ্বনিতে প্রাণময় হইয়া উঠুক!"

৩। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
(১৮৮৯—১৯৩৬)

ইনি ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি যশোর জেলার অধিবাসী; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। হোমিওপ্যাথিক ব্যবসা করিয়া অতি দরিদ্র অবস্থায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইত। ইনি চিররুগ্ন ছিলেন; ভগ্নস্বাস্থ্য ও চির-দারিদ্র্য লইয়াই তিনি জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনা করিয়াছেন।

মুসলিম বঙ্গে তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল প্রবন্ধকার অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার 'মহৎজীবন', 'মানব-জীবন', 'উন্নত-জীবন' প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তক উন্নত মনীষীর পরিচয় প্রদান করিতেছে। 'প্রকাশ' (১৯১৫) তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা-গ্রন্থ। 'প্রীতি-উপহার' (তৃ: সং-১৯৩০) উপন্যাসে তিনি দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 'রায়হান' (১৯১৯) নামক উপন্যাসটি তাঁহার মৌলিক সৃষ্টির অন্যতম নিদর্শন।

৪। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
(১৮৯৬—১৯৫৪)

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত 'বাঁশদহ' গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং বহু

বৎসর রোগজীর্ণ অবস্থায় দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

ইনিও প্রধানতঃ প্রবন্ধকার। তাঁহার 'মরু-ভাস্কর' নামক হজরতের জীবনী একটি চমৎকার গ্রন্থ। তিনি সরল 'সাধু-ভাষা' ও লৌকিক 'চলতি ভাষা', এই দুই রীতিতে সমান দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কিছু কবিতাও রচনা করেন এবং কয়েকটি নক্সাও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার 'সিন্দবাদ হিন্দবাদ', 'শাহানামা', 'ছোটদের হজরত মোহাম্মদ' এবং 'ছোটদের কায়েদে আজম' শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত, তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার সব কয়টিই জীবনী। সেগুলির নাম : (ক) মওলানা মোহাম্মদ আলী, (খ) মহামানুষ মহসিন, (গ) সৈয়দ আহ্মদ এবং (ঘ) নবাব আবদুল লতীফ।

৫। এস্ ওয়াজেদ আলী
(১৮৯০—১৯৫১)

ইনি হুগলি জেলার 'বড়তাজপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবার পূর্বে তিনি কেম্‌ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর, শেষ জীবনে তিনি আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করেন। মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার মত এত অধিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি একরূপ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তিনি প্রৌঢ় বয়সেই বাংলা-সাহিত্য-সাধনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং অচিরেই একজন প্রতিভাবান মননশীল সাহিত্যিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি বহুদিন কলিকাতাস্থ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' সভাপতিরূপে ইহার প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। প্রবন্ধ ও ছোট গল্পে তিনি বাংলার যে কোন হিন্দু-মুসলমান-সাহিত্যিকের সমর্যায়ে আসন পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। উপন্যাসেও তাঁহার হাত ছিল। তিনি নাটকও রচনা করিয়াছেন। মীর মুশর্রফ হুসৈন ও সয়্যিদ ইসমাইল হুসৈন সিরাজী ছাড়া বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে আর কেহ তৎকালে তাঁহার মত এত গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে এইগুলিই প্রধান :—

(১)	বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ	—	প্রবন্ধ-পুস্তক
(২)	মাশুকের দরবার	—	গল্প
(৩)	গ্রানাডার শেষ বীর	—	ঐতিহাসিক উপাখ্যান
(৪)	সুলতান সালাদিন	—	নাটক
(৫)	গুলদাস্তা	—	গল্প
(৬)	মোটরযোগে রাঁচি সফর	—	ভ্রমণ-কাহিনী
(৭)	দরবেশের দোয়া	—	গল্প
(৮)	জীবনের শিল্প	—	প্রবন্ধ-পুস্তক
(৯)	আমাদের সাহিত্য	—	আলোচনা
(১০)	আল্লার দান	—	
(১১)	মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ	—	আলোচনা

(১২) আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা — ইতিহাস
(১৩) ইসলামের ইতিহাস — ঐ
(১৪) ভাঙ্গা বাঁশী — গল্প
(১৫) বাদশাহী গল্প — শিশু-সাহিত্য
(১৬) গল্পের মজলিস — ঐ
(১৭) খেয়ালের ফেরদৌস — রম্যরচনা
(১৮) একবালের পয়গাম — আলোচনা
(১৯) Bengalees of To-morrow — ইংরেজী প্রবন্ধ-পুস্তক
(২০) Aligarh Memories and a persian Bouquet —স্মৃতিকথা

৬। নজীবুর রহমান
(১৮৭৮—১৯২৩)

মোহাম্মদ নজীবুর রহমান পাবনা জেলার শাহজাদপুরের নিকটবর্তী 'বেলতৈল' গ্রামের অধিবাসী। ইনি সয়্যিদ ইসমাঈল হুসৈন সিরাজীর সমসাময়িক হইলেও, প্রতিভায় সিরাজী হইতে ভিন্ন। ইনি ঔপন্যাসিকের প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন এবং তখনকার দিনের কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের সহিত আদৌ কোন যোগ রক্ষা না করিয়া, কেবল সাহিত্যিক হিসাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি', 'হাসনগঙ্গা বাহমনী', 'গরীবের মেয়ে' ও 'দুনিয়া আর চাই না' নামে পাঁচখানা উপন্যাস রচনা করেন। 'আনোয়ারা' (১৯১২) তাঁহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। গ্রামের মুসলমান মধ্যবিত্ত ঘরের কাহিনী মনোজ্ঞ ইসলামী পরিবেশ লইয়া এই গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা এখনও বাংলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে পঠিত হয়।

৭। শেখ ফজলুল করীম
(১৮৮২—১৯৩৬)

রংপুর জেলার 'কাকিনারা' গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কবি হিসাবে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি অর্জিত হইলেও, গদ্য-লেখক হিসাবেও ইনি বাংলায় কম পরিচিত নহেন। একমাত্র সাহিত্য-সাধনা ব্যতীত তিনি জীবনে অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই। তাঁহার অসংখ্য কবিতা আজও বনফুলের মত অধুনালুপ্ত বহু সাময়িক কাগজের পৃষ্ঠায় ফুটিয়া রহিয়াছে। 'পরিত্রাণ' কাব্যে তিনি শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার 'লাইলী-মজনুঁ' নামক উপন্যাস এক সময়ে বাংলার সাহিত্য-রসিকদের বিশেষ সমাদর লাভ করে। ইঁহার ভাষা অত্যন্ত সুন্দর, সরল ও সাবলীল। 'চিন্তার চাষ' গ্রন্থে তিনি চিন্তার উদ্রেককারী কথা ঢালিয়া দিয়াছেন। 'পথ ও পাথেয়' ছোট ছোট ধর্মীয় গল্পের সঙ্কলন হইলেও, সাহিত্য হিসাবে ফেলিয়া দিবার মত বই নহে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকখানি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ আছে।

৮। কাজী ইমদাদুল হক
(১৮৮২—১৯২৬)

এই সময়কার মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে খুলনা জেলার অধিবাসী কাজী ইমদাদুল হক বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা-বিভাগের গুরু দায়িত্বপূর্ণ

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও দীর্ঘ দিন ধরিয়া একাগ্রচিত্তে সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'আবদুল্লাহ্' নামক উপন্যাসে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রসারের ফলে যে নব-জীবন সঞ্চারিত হইতেছিল, তাহার সুস্পষ্ট স্পন্দন চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমানের সামাজিক উপন্যাস হিসাবে 'আবদুল্লাহ্'-এর মূল্য এখনও কমে নাই। 'নবী-কাহিনী'-তে তিনি যে মার্জিত ভাষায় নবীদের কথা লিখিয়াছেন, তাহা বটতলার 'কসসুল-আম্বিয়া'-র সমাদরের অবসান ঘটাইল। তাঁহার 'প্রবন্ধমালা' মূল্যবান প্রবন্ধ-পুস্তক।

৯। বেগম রোকেয়া সখাওৎ হুসৈন
(১৮৮০—১৯৩২)

রংপুর জেলার 'পায়রাবন্দ' গ্রামে এই মহীয়সী মহিলা ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার স্বামী সখাওৎ হুসৈন বিহারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই অসাধারণ মহিলা একমাত্র নিজের চেষ্টায় ঘরে বসিয়া যে শিক্ষা লাভ করেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না। স্বামীর অকাল-মৃত্যুর পর তিনি সমাজ-কল্যাণ ও সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলার মুসলিম সমাজে নারীর দুর্দশা অবলোকন করিয়া তিনি তাহাদের কল্যাণ সাধনের জন্য কলিকাতায় 'সখাওৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' স্থাপন করেন এবং নারীর দুঃখদুর্দশা সমাজের নিকট তুলিয়া ধরিবার জন্য প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় 'অবরোধ-বাসিনী' (১৯২৮) নামে একটি প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহার 'Sultana's Dream' (সুলতানার স্বপ্ন) উপাদেয় ইংরেজী উপন্যাস। 'মতিচুর' ও 'পদ্মরাগ' নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বাংলার মুসলিম নারীর মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনায় তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, আজ পর্যন্ত বাংলার কোন মুসলিম মহিলা তাহা করিতে সমর্থ হন নাই। যেদিক হইতেই বিবেচনা করা যাউক না কেন, তাঁহাকে বাংলার মুসলিম সমাজের নারী-প্রগতির অগ্রদূতী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

১০। ইকরামুদ্দীন
(১৮৮২—১৯৩৫)

এই যুগের শক্তিমান লেখকদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি বর্ধমান জেলার কুলিয়া গ্রামের অধিবাসী ও উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি সমালোচক, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখক ছিলেন। তাঁহার 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' (১৯২৬) মুসলমান সমাজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সর্বপ্রথম পরিচিত করিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় সমালোচনা গ্রন্থ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র' ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার 'কাঁচ ও মণি' একখানা ভাল উপন্যাস। 'নতুন মা' নামক আর একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসে শেষ বয়সের বিবাহে মুসলিম সমাজে যে পারিবারিক বিভ্রাট ঘটে, তাহার উজ্জ্বল চিত্র চমৎকারভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি 'বারোয়ারী' উপন্যাসেরও একজন লেখক।

১১। শাহাদৎ হুসৈন
(১৮৯৩—১৯৫৩)

চব্বিশ-পরগনা জেলার অন্তর্গত দেগঙ্গা থানার 'পণ্ডিতপোল' গ্রামে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি শাহাদৎ হুসৈন জন্মগ্রহণ করেন। বেশী দিন এক সঙ্গে লেখাপড়া করা তাঁহার ধাতে সহে

নাই। প্রথম বয়সে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি বঙ্গীয় নাট্যশালার দিকপালগণের সংস্রবে ও সাহচর্যে থাকিয়া তিনি অভিনেতারূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'-র প্রথম গ্রন্থাগারিক রূপে যখন তিনি কলিকাতায় কাজ করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট হন। অতঃপর, তিনি মাসিক 'সহচর' ও সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগতে'র সম্পাদকরূপে কাজ করেন। তিনি বহুদিন সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'র সহকারী সম্পাদকও ছিলেন। ১৯৩১ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ করেন। পাকিস্তান হওয়ার পর জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি ঢাকায় চলিয়া আসেন ও 'রেডিও পাকিস্তানে' চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৯53 সালে তিনি দেশের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে গিয়া রোগাক্রান্ত হন ও কলিকাতার এক হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার ন্যায় নীরব ও নিরহঙ্কার সাহিত্য-সাধক বিরল। সাহিত্যই তাঁহার জীবনে একমাত্র সাধনা ছিল। তিনি সর্বশুদ্ধ মোট পঁয়তাল্লিশখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান :– (ক) কাব্য : মৃদঙ্গ, কল্পলেখা, চিত্রপট ও রূপচ্ছন্দা; (খ) নাটক : সরফরাজ খাঁ, আনারকলি, মসনদের মোহ; (গ) উপন্যাস : রিক্তা, যুগের আলো, পথের দেখা, কাঁটাফুল ও হিরণরেখা; (ঘ) জীবনী : জাহানারা, জেবুন্নিসা, নূরজাহান ও গুলবদন ; (ঙ) শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ : মোহনভোগ, ছেলেদের গল্প ও বালিকা-জীবন। তিনি মনে প্রাণে কবি ছিলেন। তাঁহার নাটকগুলি নাটকীয় কলাকৌশলে সাহিত্য তো বটেই, তদুপরি রঙ্গমঞ্চের উপযোগিতায়ও চমৎকার। উপন্যাসেও তাঁহার প্রতিভা সাহিত্যিকের প্রতিভা। তাঁহার ভাষা ও নাটকগুলির সংলাপ সাধারণ নহে। কাব্যে তিনি রূপের কবি ও ছন্দের যাদুকর।

১২। গোলাম মোস্তফা
(১৮৯৭–১৯৬৪)

ইনি পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত যশোহর জেলার 'মনোহরপুর' গ্রামে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ., বি. টি. পাশ করিয়া শিক্ষকরূপে তিনি সরকারী স্কুলে চাকুরি গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণকালে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা-বিভাগের প্রাদেশিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ঢাকা শহরের শান্তিনগর অঞ্চলে বসতবাটি নির্মাণ করিয়া শেষ জীবন যাপন করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু কবি-সাহিত্যিকেরা গোলাম মোস্তফাকেই আধুনিক কবিরূপে প্রথম স্বীকৃতি দেন। ইঁহার পরে শাহাদাৎ হুসৈন, নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন প্রমুখ কবি আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার রূপায়ণই তাঁর সাহিত্য-সাধনার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে আজ পর্যন্ত তিনি অবিচল আছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু মনীষীর আওতায় পড়িয়াও তিনি তাঁহার স্বকীয়তা বিসর্জন দেন নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে নজরুল ইসলামের দ্বারা তিনি অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হইলেও, তাঁহার মৌলিকত্ব বা স্বকীয়তা তিনি হারান নাই। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'রক্তরাগ' (১৯১৮)। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যকে নিম্নের দুইটি সার্থক লাইন দ্বারা অভিনন্দিত করেন :–

"তব নব-প্রভাতের রক্তরাগখানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।"

গোলাম মোস্তফার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির নাম : 'খোশরোজ', হাস্নাহানা', 'কাব্য-কাহিনী', 'সাহারা' ও 'বুলবুলিস্তান'। কাব্যের অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি 'মোসাদ্দাস-ই-হালী'-র সার্থক অনুবাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইকবালের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার তিনি যে বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা সুখপাঠ্য হইয়াছে। নূতন ছন্দ অনুশীলনেও তিনি এক সময়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এই সমস্ত ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যধিক। আরবী ছন্দকে বাংলায় প্রবর্তিত করিবার চেষ্টাও তিনি বহুদিন আগে করিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'নূতন ছন্দের' সূত্রগুলি ১৩৩১ সালে 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সঙ্গীত-শাস্ত্রেও তিনি অভিজ্ঞ এবং গান রচনায়ও তাঁহার হাত ছিল। তাঁহার লেখায় নজরুল ইসলামের গভীর প্রভাব সুস্পষ্ট। এই প্রভাব তাঁহার ইসলামী সঙ্গীত ও পাকিস্তানী গান রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'তারানা-ই-পাকিস্তান' নামক তাঁহার গীতি-সঞ্চয়নে এই সমস্ত গান স্থান পাইয়াছে।

গদ্য রচনাতেও এই কবি সিদ্ধহস্ত। এমন কাব্যগন্ধী-গদ্য বাংলা-সাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁহার 'বিশ্বনবী'-তে (১৯৪২) এই বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত রূপলাভ করিয়াছে। 'বিশ্বনবী' রসুলুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার গদ্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য : 'রূপের নেশা' (উপন্যাস), 'ভাঙ্গাবুক' (উপন্যাস), 'জয়-পরাজয়' (এখওয়ানুস্-সাফার অনুবাদ), 'ইসলাম ও কমিউনিজম' এবং 'ইসলাম ও জেহাদ'। তিনি মুক্ত ছন্দে 'আল্-কুরআন' নামে কুরআন শরীফের বাংলা তর্জমাও আরম্ভ করিয়াছেন। পাকিস্তান আদর্শবাদের তিনি একজন নিষ্ঠাবান সমর্থক।

১৩। শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী
(১৮৯৫–১৯৪৫)

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার শিবপুরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর বছর পাঁচেক পূর্বে তাঁহার স্ত্রী পরলোক গমন করেন; তখন তিনি স্বর্গীয় স্ত্রীর জন্য যে অশ্রু বিসর্জন করেন, তাহা তাঁহার 'আমার প্রিয়া' নামক শোক-গাথায় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই শোক-গাথাটি বাংলার কাব্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্যতা রাখে।

'আমার প্রিয়া' কবির শেষ কাব্য। ইতিঃপূর্বে, তাঁহার 'পীযূষপ্লাবনী', 'মর্মবাণী' ও 'মুক্তিবীণা' নামে আরও তিনখানি কাব্য এক সময়ে বাংলার মুসলমানকে প্রেরণা যোগাইয়াছিল ও বিশেষ আনন্দ দান করিত। তাঁহার শেষ-জীবনের কবিতাগুলি জাতীয় দোষ-ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। তাঁহার কবিতা গীতধর্মী এবং ভাষা সুন্দর ও মধুর।

কাব্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কয়েকখানি উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ হিন্দু ঔপন্যাসিকগণ বাংলার মুসলমানদের যে মসীলিপ্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি 'বঙ্কিম-দুহিতা' নামক উপন্যাস রচনা করেন। তাহাতে হিন্দু-সমাজের নিন্দনীয় দিকের একটি চিত্র চমৎকার বঙ্কিমচন্দ্রীয় ভাষায় চিত্রিত হইয়াছিল। এক সময়ে এই উপন্যাসটি বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের ঘরে ঘরে

পাঠত হইত। এতদ্ব্যতীত, 'শেখ সংসার', 'দরবেশ-কাহিনী, 'নূতন বৌ', 'আদর্শ গৃহিণী', 'প্রেমের পথে' এবং 'রূপের মোহ' নামে আরও কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়া কবি ইদরিস আলী বাংলার মুসলিম সাহিত্য-সমাজে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

এই যুগের (বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের পরবর্তী যুগের) মুসলিম সাহিত্যিকদের সংখ্যা বহু। তাঁহাদের সকলের কথা এই গ্রন্থে লেখা সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইতেছেন :—

খানবাহাদুর আলহাজ আহসানুল্লাহ্ (জন্ম : ১৮৭৮–১৯৬৫), মুহম্মদ হেদায়েৎ উল্লাহ্ (জন্ম : ১৮৮০–১৯৪৬) সয়িদ ইমদাদ আলী (১৮৮০–১৯৫৬), ফজলুর রহীম চৌধুরী (১৮৯০–১৯৩৩), মৌলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ (জন্ম : ১৮৮৩–১৯৬৮), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (জন্ম : ১৮৮৫–১৯৬৯), মিসেস এম. রহমান, নুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (জন্ম : ১৮৯৪–১৯৭৫) মুহম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৫৮–১৯৩০); শেখ আবদুল জব্বার (১২৮৯–১৩২৬), মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্ (জন্ম : ১৮৯৬–১৯৭৬), কাজী আকরম হুসৈন (১৮৯৬–১৯৬৩), শেখ হবীবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১–১৯৬১), ইব্রাহীম খাঁ (জন্ম : ১৮৯৪–১৯৭৮), আবুল হুসৈন (জন্ম : ১৮৯৬–১৯৩৮), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (জন্ম : ১৮৯৭–১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (জন্ম : ১৮৯৮–১৯৭৯), মাহবুব-উল্-আলম (জন্ম : ১৮৯৮–১৯৮১) ইত্যাদি। অতঃপর, বাংলা সাহিত্যে যে মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইল, তিনি বাংলার খ্যাতনামা কবি নজরুল ইসলাম (জন্ম : ১৮৯৯–১৯৭৬)। তাঁহার আবির্ভাবে শুধু মুসলিম সাহিত্যের নহে, সমগ্র বাংলা-সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল। তিনি বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের অবসান ও নূতন যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করিলেন। তিনি বাংলা-সাহিত্যের 'যুগ-প্রবর্তক কবি' ও সাহিত্যিক।*

(ঘ) আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে যুগান্তর

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাশ্চাত্য-ভাবদীপ্ত যে আধুনিক বাংলা-সাহিত্য ক্রমবর্ধিত হইতে থাকে, তাহা বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১–১৯৪১) হাতে পূর্ণতা লাভ করে। এই দীর্ঘজীবী, অমর প্রতিভাবান কবি আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন, বাংলা-সাহিত্যে কেহ কখনও তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন, এই কথা বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কোন শিক্ষিত বাঙালী ভাবিতেই পারেন নাই। মোট কথা, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর বাংলা-সাহিত্যে মোটামুটিভাবে 'রবীন্দ্র যুগ' চলিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 'যুগপ্রবর্তক কবি' নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রবল রবীন্দ্র-প্রভাবের বাহিরে থাকিয়া মুসলমানদের সাহিত্য-সৃষ্টির সাধনা সফল হইয়াছে।

কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম : ১৮৯৯–১৯৭৬)

১৩০৬ বাংলা সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে) মঙ্গলবার কবি নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে এক প্রাচীন কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

---

*অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সাহিত্যিকের মৃত্যু-সন সংযোজিত হল।

দারিদ্র্যবশতঃ তাঁহার বিশেষ লেখা-পড়া হয় নাই। তবে, বাল্যকালে পারিবারিক পরিবেশে ফারসী-ভাষার চর্চা তিনি করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি গ্রামে 'লেটোর দলে' গান গাহিতেন ও ইহার জন্য গানও বাঁধিতেন। কৈশোর অবস্থায় অর্থাভাবে তিনি স্থানীয় রুটির দোকানে বালক-ভৃত্যের কাজও করিয়াছেন। এই সময়ে ময়মনসিংহের কোন দারোগা তাঁহাকে নিজ বাড়িতে লইয়া যান ও গ্রাম্য ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। তখন তিনি দুরন্তপনায় ও কবিতা রচনায় সকলের সেরা হইয়া উঠেন।

অচিরেই তিনি ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন এবং ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে 'বাঙালী-পলটন' ভুক্ত হইয়া যুদ্ধে যান। করাচীর বাহিরে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার যাওয়ার আবশ্যকতা অনুভূত না হইলেও এইখানেও স্বীয় কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে তিনি সামান্য সৈনিক হইতে 'হাবিলদারের' পদ লাভ করেন। এই সময় তিনি সঙ্গীত-চর্চায়ও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া তিনি 'মোসলেম ভারত' নামক অধুনালুপ্ত মাসিকপত্রে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার মাধ্যমে যখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তিনি 'সৈনিক-কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' নামে পরিচিত।

বাংলা-সাহিত্যে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা, একেবারেই অভাবিতপূর্ব ব্যাপার। রাবীন্দ্রিক কাব্য-কৌমুদী-পরিপ্লাবিত বাংলা-সাহিত্যের কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কেহ স্বতন্ত্র আসন দাবী করিতে পারেন, এই কথা কোন বাঙালী তখন ভাবিতেও পারিতেন না। অথচ, নজরুল ইসলাম যেন এক দিনে বিনা আয়াসে 'বিদ্রোহী' নামক মাত্র একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ হইতে একটি স্বতন্ত্র আসন দখল করিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মৃদু মধুর গুঞ্জন ধ্বনিতে মুখরিত বাংলায় নজরুল ইসলাম যখন অত্যদ্ভুত জোরালো ভাব ও ভাষায় 'বিদ্রোহী' প্রকাশ করিলেন, তখন মহাযুদ্ধের দূরাগত কামান-গর্জনের ন্যায় যে গম্ভীর নিনাদ শ্রুত হইল, তাহাতে ভাববিহ্বল বঙ্গ সচকিত চিত্তে বুঝিল ও বিস্মিত নয়নে দেখিল যে, বাংলা-সাহিত্যাকাশে হঠাৎ একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে 'ধূমকেতু' নামে তাঁহার একখানা অর্ধ-সাপ্তাহিকও প্রকাশিত হইল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতুর' সারথি নজরুলকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন :—

"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গ-শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন!
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন॥"

রবীন্দ্রনাথের দীপ্তিতে নজরুল ইসলাম ম্লান হইলেন না, নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইল না, রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে নজরুল ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া উঠিলেন।

মোটের উপর, রবীন্দ্রনাথের পাশে নজরুল ইসলামের আবির্ভাবেই জাতির মনে মানুষরূপে বাঁচিবার আশা জাগিল, ভাষা স্ফুরিত হইল। নজরুলের আবির্ভাবে বাংলার লোক আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইল, আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইল, ভাবলোকের জীব হইয়াও মর্তে মাটির মানুষরূপে বাঁচিবার উদগ্র বাসনায় উদ্দীপ্ত হইল। রবীন্দ্রনাথও জাতির আত্মচেতনার ব্যাপার সম্বন্ধে সজাগ হইলেন, তাঁহার এই অনুভূতি অভিব্যক্ত হইল—নজরুলের নামে তাঁহার 'বসন্ত' নাটকের উৎসর্গে।

এমন করিয়া জাতীয় জীবনের উদ্‌গাতারূপে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হওয়ায়, বাংলা-সাহিত্যের মোড় ফিরিয়া গেল। তাঁহার মতো এমন করিয়া মনে-প্রাণে, কাজে-কর্মে কোন বাঙালী কবি নিজের দেশকে এবং দেশের জনগণকে ভালবাসিতে পারেন নাই, দেশের জনগণের ভালবাসাও এমন করিয়া আর কেহ পান নাই। কবি যে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করিলেন, তাহাই বাংলা-সাহিত্যে নূতন যুগের ভিত্তি প্রোথিত করিল; তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যে এই বিদ্রোহের সুরই সর্বত্র অনুরণিত হইয়াছে। নিত্য নূতন পথে কত সাহিত্যিক যে অভিনব উপায়ে অভিযান শুরু করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত হিসাব এখনও নির্ণীত না হইলেও, এই কথা সর্ববাদিসম্মত যে, তাহার পুরোভাগে যুগপ্রবর্তক কবিরূপে নজরুল ইসলামই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সাহিত্যে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা চারণ কবির ভূমিকাই বটে। বাংলা হিন্দু ও মুসলমানদের দেশ, তাই কবিকে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সমাজকে এক সঙ্গে জাগাইয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই দায়িত্ব যে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত করিয়াছেন, সে বিষয়ে এখন আর কাহারও মতভেদ নাই।

তাঁহার অধিকাংশ কাব্য নির্যাতিত মানবতার বন্ধন-মুক্তির বেদনায় ভরপুর। এই বেদনা "বঞ্চিত-বুকে পুঞ্জিত ব্যথা ফেনাইয়া" উঠার অনুভূতি। তাঁহার 'সাম্যবাদী', 'বিষের বাঁশী' প্রভৃতি কাব্যে এবং বহু কবিতায় যে নবীন আদর্শের অবতারণার দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অধঃপতিত ও নির্যাতিত মানবের জয়গান তিনি জাতিকে শুনাইয়া দিলেন, তাহা শুধু জাতির প্রাণ স্পর্শ করিল না, জাতির আধুনিকতম সাহিত্যের ভিত্তিও প্রোথিত করিয়া দিল। এখনও বাংলা কাব্য, উপন্যাস ও গল্পে এই নির্যাতিত মানবের বন্ধন-মুক্তির বেদনাই চিত্রিত হইতেছে।

মানুষকে মানুষ হিসাবে মানুষেরই মর্যাদা দিতে হইবে, এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নজরুল একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনিই জাতিকে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান নির্ভীক সেনাপতির মত আদেশ দিয়াছিলেন—মৃত্যুর আতঙ্ক ত্যাগ কর, সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন কর, মিথ্যার মায়াজাল ভেদ কর, তোমরা মেষ নও—মানুষ হও। আজও বাংলা-সাহিত্যের দিক্-দিগন্তে কবির এই বজ্র-নির্ঘোষ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আর আমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি যে, ইহাই নবজাগ্রত ইসলামের সনাতন বাণী।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নজরুল তাঁহার পূর্ববর্তী প্রাচীন ও আধুনিক মুসলিম সূরীদের অনুসৃত নীতি মোটামুটি অনুসরণ করিলেও, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার উপলব্ধি সরল ও বলিষ্ঠের যৌবন-সুলভ উপলব্ধি। তাই দেখা যায়,—ইসলাম দুর্বলের ধর্ম নহে, শৌর্য, বীর্য ও পৌরুষই ইহার প্রাণ; সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমই ইহার সৌন্দর্য; অধিদেশীয়, অধিবর্ণীয় এবং অধিকালীন প্রকৃতিই ইহার পরম বৈশিষ্ট্য, এই সত্য অতি

প্রাচীন হইলেও, নজরুলের সাহিত্য-সাধনায় নূতন রূপ ও অভিনব মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এতদিন বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকেরা যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম ছিল, সমাজ ছিল, ইতিহাস ছিল, সংস্কৃতিও ছিল; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ, প্রকৃত 'সাহিত্য' ছিল না। তাঁহারা যে পরশমণির সন্ধানে যুগযুগান্তর কাটাইয়াছিলেন, হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আসিয়াই যেন নজরুলের মধ্যে তাহা আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে সমস্তই যেন এক নিমেষে সোনা হইয়া গেল, জীয়ন-কাঠির ছোঁয়ায় সাহিত্য জীবন-লাভ করিয়া প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল। মোট কথা, তিনিই বাংলা-ভাষায় এক নব্য ইসলামী-সাহিত্যের ভিত্তি প্রোথিত করিলেন। তাঁহার 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম', 'মুহর্রম', 'খেয়াপারের যাত্রী', 'নতুন চাঁদ', 'খালেদ', 'কোরবানী', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'আমানুল্লাহ্' প্রভৃতি বহু কবিতায় ইসলাম নূতন রূপ লাভ করিয়াছে।

বাংলা-সাহিত্যে গজল-গানের আমদানীও তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। তাঁহারই প্রতিভার কল্যাণে বাঙালী আজ 'ছায়া-ঢাকা, পাখী-ডাকা' বাংলার বুকে বসিয়া পারস্যের গোলাপ-বুলবুলের অনুরাগ, শরাব ও সাকীর মধুর মাদকতা এবং কাব্য-জলসার আনন্দময় উল্লাস অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে। এইভাবে নজরুল ইসলাম মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে সাহিত্যিক রূপ দিলেন এবং ইসলাম ধর্মের যে গভীর মর্মবাণী উদ্‌ঘাটিত করিলেন, তাহাতে বাংলার মুসলমানের চোখ খুলিয়া গেল, হৃদয়ে জাতি হিসাবে বাঁচিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। দেশের স্বাধীনতায় ইহার ফল যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়-ও তাহা রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই দিক হইতে নজরুল ইসলামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বাধ্য হইয়াই বলিতে হয়, তিনিই বাংলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম স্বাপ্নিক। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যেও নানাভাবে কবির স্বপ্ন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া রূপায়িত হইতেছে। আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দের আমদানী করিয়া, ইসলামী ভাব ও চিন্তাধারার আশ্রয় লইয়া মুসলিম উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করিয়া নজরুল বাংলা-সাহিত্যে যে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজও পূর্ব-পাকিস্তানে নানাক্ষেত্রে তাহারই অনুকরণ চলিয়াছে, তাহারই অনুরণন ধ্বনিত হইতেছে।

একমাত্র কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দিলে বাংলাদেশে নজরুল ইসলাম ব্যতীত আর কোন কবি এমন প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। নজরুল একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি, সুরশিল্পী, সংগীত-রচয়িতা, ভাবপ্রবণ-ঔপন্যাসিক, গাল্পিক ও নাট্যকার। তাঁহার সর্বপ্রথম কাব্য 'অগ্নিবীণা' এবং সর্বশেষ কাব্য 'মরু ভাস্কর'। তাঁহার বহুসংখ্যক কাব্যের মধ্যে 'বিষের বাঁশী', 'দোলনচাঁপা', 'ফণি-মনসা', 'ভাঙার গান', 'ছায়ানট', 'সর্বহারা', 'সাম্যবাদী', 'চিত্তনামা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চোখের চাতক', 'চক্রবাক', 'জিঞ্জীর', 'ঝিঙে ফুল', 'সন্ধ্যা', 'চন্দ্রবিন্দু', 'নতুন চাঁদ' প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অধিকন্তু পারস্যের সুফী কবি হাফিজের অনুবাদ 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' নামক কাব্যে এবং কুরআন শরীফের পদ্যানুবাদ 'আমপারা' কাব্যে তাঁহার কাব্যানুবাদের অদ্ভুত শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ব্যাথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' নামক গদ্যকাব্যে তাঁহার যে প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাংলা-সাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল। 'মৃত্যু-ক্ষুধা', 'বাঁধনহারা' ও 'কুহেলিকা' নামক উপন্যাস এবং 'আলেয়া' ও 'ঝিলিমিলি' নামক নাটক

লিখিয়া তিনি বাংলা-সাহিত্যকে এক নূতন পথ দেখাইয়াছেন। 'বুলবুল', 'বন-গীতি', 'জুলফিকার' প্রভৃতি গান-সঞ্চয়নে তাঁহার যে প্রতিভাচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়াছে, তাহা অচিরে ম্লান হইবার নহে।

কবির সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কাব্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় কুড়ি বৎসর (১৯২০–১৯৪১)। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ইসলামী-সঙ্গীত ও কাব্য, হিন্দুয়ানী-গান, বৈষ্ণব-পদ, সূফী-গজল, আরবী-কসীদা, শিশু-সাহিত্য, ব্যঙ্গ-রচনা প্রভৃতি কত প্রকারের রচনায় যে তিনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই, তাঁহার প্রত্যেকটি রচনায় কবির স্বকীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রতিভার মাহাত্ম্য এমনই।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নব প্রাণ, নব শক্তি ও নবীন উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। কবি ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির 'রজত জুবিলী' অধিবেশনে 'সভাপতির ভাষণ' দিতে গিয়া বাংলার মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন,–

"যাঁরা ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য মধুর রূপ দর্শন করছি, তিনি যদি আমার সর্ব-অস্তিত্ব গ্রহণ ক'রে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, তা হ'লে এই বিদ্বেষ জর্জরিত, ভেদজ্ঞান কলুষিত, অসুন্দর অসুর নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর ক'রে যাব; এই তৃষিতা পৃথিবী বহু কাল যে প্রেম, যে অমৃত, যে আনন্দ-রসধারা থেকে বঞ্চিত, সেই আনন্দ, সেই প্রেম, সে আবার ফিরে পাবে। আমি হব উপলক্ষ মাত্র, সেই সাম্য, সেই অভেদ-শান্তি, আনন্দ-প্রেম আস্‌বে আমার নিত্য পরম-সুন্দর পরম-প্রেমময়ের কাছ থেকে। যদি আর বাঁশী না বাজে, আমায় তোমরা ক্ষমা করো, ভুলে যেয়ো। বিশ্বাস করো, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম। সে প্রেম পেলাম না ব'লে নীরব-অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম! শুধু মনে রেখো, পূর্ণত্বের তৃষা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত আত্মা যেন স্বপ্নে তোমার মাঝে কেঁদে গেল!"

ইহার পর কবির সমস্ত সত্তা নীরব হইয়া গেল, তিনি আত্ম-সমাহিত অবস্থায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

কবি নজরুল ইসলাম দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বর্তমানে সম্বিৎহারা। বাংলার হিন্দু-মুসলমান কবির এই অবস্থায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন, বহু অর্থব্যয়ে ইউরোপে পাঠাইয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু, ইউরোপীয় ভিষগ্‌মণ্ডলীও তাঁহার রোগমুক্তির কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। কবিকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনা হইল। কবি এখন ভারত ও পাকিস্তান সরকারের নিয়মিত অর্থ-সাহায্য লাভ করিতেছেন। প্রতি বৎসর ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কবির জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়; সেই উপলক্ষে কবির বহু ভক্ত ও অনুরাগী তাঁহাকে মাল্যভূষিত করিতে গিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন। ইহাই দেশের শেষ সান্ত্বনা।

(ঙ) নজরুল-যুগের বাংলা সাহিত্য

নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাংলা-সাহিত্যে রাবীন্দ্রিক-যুগের অবসান ঘোষণা করিল। সাংস্কৃতিক-ক্ষেত্রে কোন যুগের অবসান এক দিনে ঘটে না, কিছুদিন প্রাচীন যুগের জের

চলিতে থাকে। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে; 'নজরুল যুগে' হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে এই সত্য স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে মুসলিম বঙ্গে তিনজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জন্ম হয়, তাঁহাদের মধ্যে মরহুম কবি শাহাদৎ হুসেন, কবি গোলাম মোস্তফা ও কবি জসীমউদ্দীন প্রসিদ্ধ। শাহাদৎ হুসেন (১৮৯৩–১৯৫৩), কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭–১৯৬৪) ও কবি জসীমউদ্দীন (জন্ম–১৯০২–১৯৭৬) প্রসিদ্ধ। শাহাদৎ হুসেন ও গোলাম মোস্তফা সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করিয়াছি; নিম্নে জসীমউদ্দীন সম্বন্ধে বলিতেছি।

প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে এত সাহিত্যিক ও লেখকের আবির্ভাব ঘটে যে, তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা সম্ভবপর নহে। এই দলের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী, মাহমুদ হোসেন, আশরাফ আলী খান, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, সৈয়দ মোহাহের হোসেন চৌধুরী, মীর ফজলে আলী, আবুল হাশেম, সা'দত আলী আখন্দ, সাজেদা খাতুন, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, আজিজুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা ফেরদৌস মহল সিরাজী, গোলাম কাসেম, শো'এব আহমদ, মীর্জা সুলতান আহমদ, দিদারুল আলম, মুহম্মদ হবিবুল্লাহ বাহার, মুহম্মদ কাসেম, মতিনউদ্দীন আহমদ, কাজী দীন মোহাম্মদ, চৌধুরী শামসুর রহমান, আবুল হাসানাৎ, আজিজুল হাকিম, আবুয-যোহা নুর আহমদ, ফজলুর রহমান, মোহাম্মদ আবু বকর, সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা শিরাজী, মোয়াহেদ বখ্ত চৌধুরী, রিয়াজউদ্দীন চৌধুরী, সুফী মোতাহার হোসেন, আবদুর রাজ্জাক, ইমাউল হক, আজহারুল ইসলাম, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, ওইীদুল আলম, কে. এম. শমসের আলী, মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ, আবদুর রহমান, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আবদুল মওদুদ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জসীমউদ্দীন
(জন্ম : ১৯০২–১৯৭৬)

ফরীদপুর জেলার 'তাম্বুলখানা' নামক গ্রামে কবি জসীমউদ্দীনের জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলা-ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়েই কয়েক বৎসর পল্লীগান সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-ভাষার অধ্যাপকরূপে কয়েক বৎসর কাজ করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগের 'সঙ্গ পাবলিসিটি অর্গানাইজার' পদে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতি ও যোগ্যতার সহিত সরকারী প্রচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করেন। এখন তিনি ঢাকা শহরের 'কমলাপুর' অঞ্চলে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া স্থায়িভাবে ঢাকায় অবসর জীবন যাপন করিতেছেন।

কবি মনে-প্রাণে পল্লী-দরদী বলিয়া পল্লী-অঞ্চলের সুখ-দুঃখের চিত্র তাঁহার লেখনীতে যেমন চমৎকারভাবে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাংলার আর কোন কবির লেখায় তেমনটি হয় নাই। বাংলা-ভাষার পল্লীসাহিত্যে তাঁহার অবদান সত্যই তুলনাবিহীন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা-ভাষার প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁহার প্রতিভার সর্বপ্রথম সমঝদার। তাঁহার 'যাঁদের দেখেছি' নামক গ্রন্থে আরও কয়েকজন খ্যাতনামা হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকের নিকট হইতে তাঁহার উৎসাহ লাভের

কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'চলে মুসাফির' নামক একখানা চমৎকার ভ্রমণ-কাহিনীতে তিনি দেশ-বিদেশের বহু কথা লিখিয়াছেন।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'রাখালী', 'বালুচর', 'ধানখেত', 'রূপবতী', 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি' প্রভৃতি বাংলা-সাহিত্যের অক্ষয় সম্পৎ। 'মাটির কান্না' নামক তাঁহার যে কাব্যখানি কিছুদিন আগে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার পল্লী-প্রেম ক্ষীণ হইয়া আসিলেও, মার্জিত রুচি ও ভাষায় এই কাব্য তাঁহার অন্যান্য কাব্য হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। তাঁহার 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ইংরেজীতে "The Field of the Embroidered Quilt" নামে অনূদিত হইয়াছে। শিশু-সাহিত্য-রচনায়ও তাঁহার বেশ হাত আছে। তাঁহার 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাশী' নামক শিশু-কাব্য বাংলার শিশু-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

নাটক রচনায়ও তাঁহার হাতযশ আছে। তাঁহার 'বেদের মেয়ে' একটি চমৎকার গীতি-নাট্য। একাঙ্কিকা লেখায়, মুর্সিদা, ভাটিয়ালী, জারী প্রভৃতি গান রচনায় ও সংগ্রহে তাঁহার দান বিশিষ্ট ও স্মরণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা-সাহিত্যে পাকিস্তান-যুগ

(১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭)

১৯৪৭ ইংরেজীর ১৪ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করিয়া দেশ বিভক্ত হইল। অত্যধিক সংখ্যায় মুসলিম-অধ্যুষিত 'পূর্ববঙ্গ' পাকিস্তানের অংশরূপে গণ্য হইয়া 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামে অভিহিত হইল। দেশের এই রাজনৈতিক বিভাগ কিভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা-সাহিত্যে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রতিধ্বনি জাগাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করাই এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

দেশ-বিভাগের পূর্বে কলিকাতা সমগ্র বাংলার রাজধানী হওয়ায়, ইহা দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুতরাং দেশের সমস্ত সাহিত্যিক কর্মতৎপরতা কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত ছিল। যে-সমস্ত সাহিত্যিক তখন প্রতিষ্ঠা-অর্জনের আকাঙ্ক্ষী হইতেন, তাঁহারা কলিকাতার সাহিত্য-সমাজে পরিচিত হইতে উৎসুক হইয়া উঠিতেন। এই কলিকাতাতেই তাঁহাদের সাহিত্যিক-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত অথবা চিরতরে বিলুপ্ত হইত। দেশ-বিভাগের মুখেই, পূর্ব ও পশ্চিম–উভয় বঙ্গ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠে। বাংলার জনসাধারণ মনে করিল যে, ইহা রাজনৈতিক সংগ্রাম মাত্র। কিন্তু দেশ-বিভাগের মৌলিকভিত্তি আদর্শগত বলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাংস্কৃতিক-বিবর্তনে ইহার প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য, তাহা একরূপ স্থিরনিশ্চিত ছিল।

দেশ-বিভাগের ফলে, জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেশ-ত্যাগের (হিজরতের) হিড়িক পড়িয়া গেল। বাঙালী হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে উন্নততর ও অগ্রগামী ছিল বলিয়া, তাহাদের দেশত্যাগে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক-জীবনে একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হইল। মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শাহাদৎ হোসেন, আকবরউদ্দীন, কাজী কাদের নওয়াজ, আবদুল মওদুদ, শওকত ওসমান প্রভৃতির ন্যায় কতিপয় মুসলিম সাহিত্যিক পশ্চিম-বঙ্গ হইতে আসিয়া এই শূন্যতা আংশিকভাবে পূর্ণ করিলেন বটে; কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ূন কবির, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রভৃতির ন্যায় কতিপয় খ্যাতনামা মুসলমান সাহিত্যিক পশ্চিম-বঙ্গে রহিয়া গেলেন অথবা পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম- বঙ্গে চলিয়া গেলেন।

সে যাহা হউক, ইহা প্রকৃত অবস্থার একটা সাময়িক রূপ মাত্র। অতঃপর, পূর্ববঙ্গে তরুণ সাহিত্যিকদের একটা বৃহৎগোষ্ঠী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা এক নূতন সাহিত্যিক-রীতি বা ধারা প্রবর্তনে বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। ফলে, বাংলা-বিভাগ যে

আদর্শভিত্তিক এই সত্য বাস্তবমূর্তিতে দ্রুতই দেখা দিতেছে। নূতন সাহিত্যিক-রীতি বা ধারাও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে বটে, তবে ইহার সংজ্ঞা-দান অথবা রূপ-রেখার পরিচয় প্রদান সহজ ব্যাপার নহে; তবে এই কথা সত্য যে এই সাহিত্যিক-রীতি বা ধারার গতি নূতন পথে, অভিনব রূপে পরিচালিত হইতেছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা যে 'বাংলা',–এই কথা এখন একান্তই সুস্পষ্ট এবং এখানকার বাসিন্দাদের সাহিত্যিক প্রকাশের প্রধান বাহন যে 'বাংলা', তাহাও সর্বস্বীকৃত সত্য। বাংলা-ভাষার ভাবীরূপ সম্বন্ধে অনেক কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে বটে,–বিভিন্ন দল, বিভিন্ন মত, এমন কি বিরোধী মতও প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন বটে, তবু এদেশের ভাষা যে বাংলা হইবে,–আরবী, ফারসী বা উর্দু হইবে না, এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই।

এই বিষয়ে মধ্যপন্থীদের মত এই যে, স্বাভাবিকভাবেই কালক্রমে পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাভাষা বিবর্তিত হইয়া পশ্চিম-বঙ্গের ভাষা হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। এই বিবর্তনমূলক পার্থক্য কতখানি বাস্তব ও কার্যকর হইয়া উঠিবে, তাহা আমাদের মধ্য হইতে আবির্ভূত সাহিত্যিকদের শিক্ষা-দীক্ষাগত গুণাগুণের উপরই নির্ভর করিবে; কেননা একমাত্র তাঁহারাই ভাষায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ।

এই কথা এখন একরূপ সর্বস্বীকৃত যে, পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য ভবিষ্যতে ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও মুসলিম অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং স্বাভাবিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও আদর্শ এই সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। ইতিমধ্যেই সমসাময়িক বহু রচনায় জাতীয়তাবাদের প্রবণতা দেখা দিয়াছে।

বাংলা-সাহিত্যে নূতন প্রেরণা-সঞ্চারের এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে ইহার উন্নতি-বিধানের ঐকান্তিক ও সক্রিয় প্রচেষ্টার সহিত স্থানে স্থানে পথভ্রষ্টদের আদর্শগত বিভ্রান্তির চেষ্টাও দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত রচনা যে শুধু অস্পষ্ট-উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপোষক তাহা নহে, ইহারা অস্বাস্থ্যকর মনের পরিচয়ও বহন করিতেছে। এই রচনাগুলিতে ব্যবহৃত বাঙ্ময়তা ও কল্প-রূপিতা Expression and imagery যেমন অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল, আদর্শবাদিতাও তেমন ঝাপসা ও এলোমেলো।

কাব্যে ক্রমবর্ধমান গদ্য-প্রীতি সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার। মনে হয়, ইহা আমাদের ছন্দোহারা জাতীয় জীবনের অব্যবস্থিত অবস্থার বহিঃপ্রকাশ। প্রাচীন-ধারার অনুসরণে এখনও যে-সমস্ত কবি ছন্দোবদ্ধ কবিতা লেখেন, তাঁহারা তরুণ মনে ভাবের-তরঙ্গ তুলিতে অসমর্থ হন, এবং অত্যাধুনিক জনপ্রিয় গদ্য-কবিতাও প্রাচীন সাহিত্যিকদের মহাহতাশার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যবর্তী ব্যবধান দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর বড় হইয়া দেখা দিতেছে।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ব হইতে অনেক বেশী পরিমাণে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের অনেক লেখা জনসাধারণের বুভুক্ষা ও দুঃখ-দুর্দশাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও, এইগুলিতে মানুষের প্রতি মানুষের দরদ, ভালবাসা ও সহিষ্ণুতার

চেয়ে মানুষের প্রতি মানুষের জিঘাংসা প্রবৃত্তির উদ্রেক করার প্রচারণাই অধিক। কতিপয় তরুণ কবি ও লেখকের রচনার বহুস্থানে সাহিত্যকে রাজনৈতিক প্রচারণার অস্ত্ররূপে ব্যবহারের প্রবণতাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

(ক) কাব্য

১। **ফররুখ আহমদ (১৯১৮–১৯৭৩)** :– ইনি কাব্যক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা চালাইয়া যাইতেছেন। দোভাষী-পুঁথির আদর্শ তাঁহার কাব্য-সাধনার মধ্যে অন্যতম। তিনি এই আদর্শের পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। 'হাতেম তাই' নামক কাব্যের কয়েকটি সর্গে তিনি দোভাষী-বাংলাকে পুনরুজ্জীবন দানের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার 'সাত-সাগরের মাঝি' ও 'আজাদ করো পাকিস্তান' প্রাক্-পাকিস্তান যুগে তাঁহাকে কবি হিসাবে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। পাকিস্তানোত্তর কালে প্রকাশিত 'সিরাজাম-মুনীরা', 'নসীহত-নামা', 'তসবীর-নামা' প্রভৃতি কাব্যে তিনি নূতন নূতন কাব্য-কৌশল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

২। **মহীউদ্দীন (১৯২০–১৯৭৫)** :– মহীউদ্দীন বিপ্লবী কবি। তাঁহার প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'পথের গান' পড়িলেও মনে হয় যে, তিনি নজরুল ইসলামের ভাব-শিষ্য। ইনি নানা সাময়িক কাগজে অজস্র কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

৩। **আহসান হাবীব (১৯১৭–১৯৮৬)** :– প্রাক্-পাকিস্তান যুগে তিনি 'রাত্রিশেষ' কাব্য লিখিয়া সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই জাতীয় কবিতার মধ্যে 'ধন্যবাদ', 'সন্ধিপত্র', 'একরার-নামা' ও 'হকনাম ভরসা'-র নাম করা যায়। তাঁহার 'প্রেম' শীর্ষক কবিতাটিতে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গল্প এবং উপন্যাস রচনায়ও মনোযোগী। তাঁহার 'জাফরাণী রং পায়রা' একখানি সুন্দর উপন্যাস।

৪। **সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম–১৯২২)** :– প্রাক্-পাকিস্তান যুগ হইতে কাব্যের সাধনা করিলেও, তিনি এখন কাব্য-সমালোচক ও প্রবন্ধকার হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া মনে হয়। এখন তিনি পদ্যে গদ্যভঙ্গী প্রবর্তনে বিশেষ সচেষ্ট। তাঁহার এ-ধরনের কবিতার মধ্যে 'প্রার্থনা', 'কাব্যলোক', 'সঙ্কেত', 'সংবাদ' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'চাহার দরবেশ' উদ্দেশ্যমূলক কাব্য। কাব্য বলুন, প্রবন্ধ বলুন আর সমালোচনাই বলুন, তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পশ্চাতে যে ভাব ক্রিয়া করিতেছে, তাঁহার নিজের কথাতেই তাহা প্রকাশ করিতেছি :

"নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজবো। সে সঙ্গে এটাও সত্য যে, আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তো বা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশী। শিল্প আজ আমাদের কাছে তত্ত্বহেতু। নিছক সাহিত্য-বিলাস খুব কম লোকই এখন করছে। বর্তমান পরিবেশে রাষ্ট্রীয় অনুভূতিকে ভুলে যেয়ে আমাদের পক্ষে সাহিত্যচর্চা করা সম্ভবপর নয়। দুনিয়ার কোন মহৎ সাহিত্যই শুধুমাত্র সৌন্দর্য-সৃষ্টি ক'রেই ক্ষান্ত হয় না। পূর্ববাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের উত্তরাধিকার হলো, ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্য, অগণিত অমার্জিত পুঁথি সাহিত্য, অজস্র গ্রাম্য-গাথা,

বাউল ও অসংস্কৃত অঙ্গের পল্লীগান। এই পুঁথি-সাহিত্যকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কিছু কিছু কাব্য-কাহিনী লিখিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও লিখিত হবে। যদি এসব লেখা চেষ্টাকৃত হয়, তবু এতে অকল্যাণ কিছু নেই, কেননা ইচ্ছাপ্রসূত রচনার মধ্য থেকেই একদিন সত্যিকার সাহিত্যের উদ্ভব হবে।"– ('মাহে-নও'–আগষ্ট, ১৯৫১)।

৫। **ছদরুদ্দীন** (১৯১৭–১৯৯০):– গদ্য-কবিতাই ইঁহার প্রধান উপজীব্য। তাঁহার 'পয়গাম' ও 'এক ফালি চাঁদ' নামক কাব্য দুইখানি গদ্য-কবিতারই সমষ্টি। পাকিস্তানী ভাবধারার প্রকাশ করিয়া তিনি এখন কবি-সমাজে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন।

৬। **শেখ সাইফুল্লাহ** (জন্ম–১৯৩০) :– ইনি একেবারেই তরুণ, অথচ সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে বাউল, মুর্শিদা ও মারফৎ-পন্থী। তাঁহার 'সঙ্গীত-লহরী', গুলবাগ', 'দিলবাগ', 'অশ্রুধারা', 'অভিযান' ও 'ঝঙ্কার' এই ছয়খানি কাব্য পাকিস্তান-পরবর্তীকালে রচিত ও প্রকাশিত। তিনি একজন গায়ক এবং গান রচয়িতা। তিনি উচ্চ শিক্ষিত না হইলেও, স্বাভাবিক কবিত্ব-প্রতিভায় ভরপুর। তাঁহার রচনায় সমাজ-সংস্কারের আগ্রহ থাকিলেও তিনি আসলে কবি।

৭। **আশরাফ সিদ্দিকী** (জন্ম–১৯২৫) :– তাঁহার কবিখ্যাতি এখন সুবিদিত। তাঁহার 'তালেব মাষ্টার' অনেকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। তিনি পাকিস্তান-পরবর্তী কবিতা সঙ্কলনেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; তাঁহার সম্পাদিত 'নতুন কবিতা' একটি সুন্দর কাব্য-সঞ্চয়ন।

৮। **আবুল হোসেন** (জন্ম ১৯৩২) :– ইঁহারও বেশ কবিখ্যাতি আছে। ইকবালের কাব্যানুবাদে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য। 'মেহেদীর জন্য', 'মধ্যপ্রাচ্য', 'আমার সোনার দেশ' প্রভৃতি গদ্য কবিতায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাঁহার 'নব বসন্ত' কাব্যে তিনি সমিল-গদ্য রচনারও প্রয়াস পাইয়াছেন।

৯। **রওশন ইজদানী** (১৯২৪–১৯৬৭) :– ইনি মৈমনসিংহ গীতিকার ভাষাকে কাব্যে প্রয়োগ করিয়া সার্থকতা অর্জনের প্রয়াসী। তাঁহার 'চিনু বিবি', 'রঙ্গিলা বন্ধু' ও 'বজ্র-বাণী' প্রসিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত, আজিজুর রহমান, মতিউল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮–১৯৭৫), তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, সদরুদ্দীন, সানাউল হক, আ. কা. শ. নূর মোহাম্মদ, আবদুল হাই মাশরেকী, আবদুল রশীদ খান, মযহারুল ইসলাম, শামসুর রাহমান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১০। **মহিলা কবি** :– (ক) পূর্ব পাকিস্তানের মহিলা কবিদের মধ্যে বেগম সুফিয়া কামালের (জন্ম-১৯১১) স্থান বিশিষ্ট। তাঁহার 'সাঁঝের মায়া' ও 'মায়া-কাজল' নামক কাব্য দুইটি সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার চিন্তাধারা স্নিগ্ধ ও কোমল ভাব-চিত্রণে বিশেষ উপযোগী।

(খ) **মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাও** (১৯১০–১৯৮১) :– কবিতা রচনায় যশস্বিনী। তাঁহার 'পশারিণী' প্রাক-পাকিস্তান যুগে প্রকাশিত হইলেও একখানা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। সম্প্রতি তিনি গদ্য-কবিতা রচনাতেই অধিক মনোযোগ দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে হোসনে আরা, রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী, লুৎফন্নেসা হারুন, শাহেদা খানম, জাহানারা আরজু, লতীফা রশীদ, লতিফা হক প্রভৃতির নামও স্মরণীয়। ইঁহারাও নানা সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিয়া পরিচিতা হইয়া উঠিতেছেন।

(খ) কথা-সাহিত্য

বাংলা-সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্র হইতেছে কথা-সাহিত্য–বিশেষ করিয়া গল্প ও উপন্যাস। বর্তমান কালের বুদ্ধিজীবীর চিন্তার গতিধারা অনুধাবন করিতে হইলে কথা-সাহিত্যের আলোচনা অপরিহার্য। এই ক্ষেত্রে বিচরণশীল সাহিত্যিকের সংখ্যা এত বেশী যে, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করাও সম্ভবপর নহে। তাই নিম্নে মাত্র কয়েকজন প্রসিদ্ধ কথা সাহিত্যিকের নাম দেওয়া যাইতেছে :

১। **শওকত ওসমান** (১৯২১–১৯৯৮) :– পূর্ব-পাকিস্তানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে শওকত ওসমান অন্যতম। সামাজিক গলদ ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের চিত্র তাঁহার কোন কোন গল্প ও উপন্যাসে চমৎকার রূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'জুনু আপা' (গল্প সঞ্চয়ন), 'সাবেক কাহিনী' (গল্প-সঙ্কলন), 'ওটেন সাহেবের বাংলো' (গল্প), 'ডিগবাজী' (গল্প), 'বেড়ী' (উপন্যাস), 'বনী আদম' (উপন্যাস) প্রভৃতি গ্রন্থই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

২। **আলাউদ্দীন আল্ আজাদ** (জন্ম–১৯৩৪) :– ইনিও সমঝদারদের সমাদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গল্পগুলিতে প্রতিশ্রুতির ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁহার রচিত 'জেগে আছি', 'ধান-কন্যা' ও 'মৃগনাভি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ। 'অন্যমুখ' তাঁহার প্রকাশিত উপন্যাস।

৩। **আবু রুশ্‌দ** (জন্ম–১৯১৯) :– তরুণ কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে ইঁহার খ্যাতি আছে। ইনি জনসাধারণের সহিত বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার লেখায় শহুরে আবহাওয়া ও আধুনিক সমাজের চিত্রই বেশী ফুটিয়াছে। তাঁহার 'রাজধানীতে ঝড়', 'প্রথম যৌবন', 'এলোমেলো' ও 'সামনে নূতন দিন' প্রভৃতি কথাগ্রন্থ অনেকের প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

৪। **বুলবুল চৌধুরী** (১৯১৬–১৯৫৩) :– আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্য-শিল্পী বুলবুল চৌধুরী চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায়ও তাঁহার হাত ছিল। তাঁহার 'প্রাচী' নামক উপন্যাসে উজ্জ্বল প্রতিভার ছাপ দেদীপ্যমান।

৫। **নূরন্নাহার** (জন্ম-১৩৩০ বঙ্গাব্দ) :– ইনি ছোট গল্প, নাটিকা, উপন্যাস ও কবিতা লিখিয়া অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার ছোট গল্প ও কবিতা বুদ্ধিদীপ্ত নয় বটে, তবে প্রাণ-প্রাচুর্যে উজ্জ্বল। তাঁহার 'আছর', 'বোবামাটি', 'ঘড়িয়াল', 'ফর্দ-মাফিক' প্রভৃতি প্রাণধর্মী গল্প।

৬। **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ** (১৯২০–১৯৭১) :– ইনিও একজন কথা-সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'লাল সালু' নাম-করা উপন্যাস। 'নয়নতারা' তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ।

৭। **আকবর হোসেন** (১৯২৬–১৯৮১) :– উপন্যাস লেখায় ইনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'কি পাইনি', 'মোহমুক্তি', 'অবাঞ্ছিত' প্রকাশিত হইয়াছে, এই উপন্যাসগুলিতে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত, শাহেদ আলী, মবিনউদ্দীন আহমদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, খালেকদাদ চৌধুরী, কাজী আবুল হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আশরাফ-

উজ্জামান খান, হামেদ আহমদ, মফিজ উল্-হক, দৌলতুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, বেদুইন শমসের, সরদার জয়েন উদ্দীন, কাজী আফসারউদ্দীন আহমদ, আবু ইসহাক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

(গ) নাট্য-সাহিত্য

পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্য-সাহিত্য প্রাচুর্যে ভরপুর না হইলেও নানাদিক হইতে বিচার করিয়া বলিতে পারা যায়, ইহা ভাবী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এবং বর্তমান সৃষ্টিতেও দীন নহে। পূর্ব পাকিস্তানে কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ও পেশাদার নট-নটী ন্যই। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মধ্যে মধ্যে সখের নাট-মঞ্চ স্থাপনে ও নাট্যদলের উৎসাহে এখানে নাটক অভিনীত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সাহিত্যের এই বিভাগে যাঁহারা সার্থক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শওকত ওসমান (১৯২১–১৯৯৮), নূরুল মোমেন (১৯১৬–১৯৯০), আসকার ইবনে শাইখ (জন্ম–১৯২০), নাজীর আহমদ, আকবর উদ্দীন (১৮৯৬–১৯৭৮), ইবরাহীম খলীল (জন্ম–১৯১৭), ওবায়দুল হক, আবদুল জব্বার খাঁ, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান, মুনীর চৌধুরী (১৯২১–১৯৭১), আলী মনসুর, কবীর চৌধুরী, সায়িদ সিদ্দিকী, সিকান্দার আবু জাফর (১৯২২–১৯৭৫), অধ্যক্ষ আজিমউদ্দীন প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। শওকত ওসমানের 'তস্কর ও লস্কর', 'আমলার মামলা', 'বাগদাদের কবি', 'কাঁকরমণি' প্রভৃতি সার্থক সৃষ্টি। আসকার ইবনে শাইখের 'বিরোধ', 'পদক্ষেপ', 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'দুরন্ত ঢেউ' প্রভৃতি নাটক নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করিতেছে। নূরুল মোমেনের 'রূপান্তর' ও 'নেমেসিস' নাট্যকলা ও সৌষ্ঠবে বিশিষ্ট। তাঁহার নাটকের সংলাপ-ভাগ সত্যই চটুল, শালীন ও হৃদয়গ্রাহী। আকবরউদ্দীনের (১৮৯৬–১৯৭৮) 'সিন্ধু বিজয়' ও 'নাদির শাহ' সুপ্রসিদ্ধ। ইবরাহীম খলীলের 'সখীনা', 'মুসা' ও ফিরিঙ্গি রাজ' ঐতিহাসিক-পটভূমিকায় রচিত হইলেও প্রাণবন্ত। ওবায়দুল হকের 'দিগ্বিজয়ী চোরাকারবারী' ও 'এই পার্কে' নূতন জীবনের সমস্যার চিত্র তুলিয়া ধরার চেষ্টা প্রশংসনীয়। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'বুনিয়াদ' ও 'আশিয়ানা' সমঝদারদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। নাজীর আহমদ একাধারে নাট্যকার, সিনেমা প্রযোজক ও শিল্প-সমালোচক হিসাবে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

(ঘ) প্রবন্ধ ও সাময়িক সাহিত্য

পাকিস্তান-পরবর্তী সময়ে বাংলা-সাহিত্যের এই বিভাগে অনেক লেখক বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের সাধনায় আমাদের সাহিত্যের এই বিভাগ বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে আবদুল্লাহ্ আল্-মুতী (জন্ম–১৯৩০), আবদুল জব্বার (নূতন বই–'বিশ্ব-রহস্য সন্ধানে', 'বিশ্ব-রহস্যে নিউটন ও আইনষ্টাইন') ও শাহ্ ফজলুর রহমান; ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় মৌলানা মুস্তাফিজুর রহমান (১৯১৫–১৯৬০), মোহাম্মদ আবুল কাসেম (১৯২০–১৯৯১), মোহাম্মদ আজরফ, হাসান জামান, আবদুল গফুর প্রভৃতি; শিক্ষা-বিজ্ঞানে মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, ফেরদৌস খাঁ, খানবাহাদুর আবদুল হাকিম (জন্ম–১৯০৫–১৯৮৫), ছদরুদ্দীন প্রভৃতি; ধ্বনিতত্ত্বে মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯–১৯৬৯), সমালোচনায় ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭–১৯৮১), সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩–১৯৫৬), ড: সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন,

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০২–১৯৮৭), নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২০–১৯৭১), মুজীবর রহমান খাঁ (১৯১০–১৯৮৪), সৈয়দ আলী আশরাফ, প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় আহমদ শরীফ, আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, আদম উদ্দীন আহমদ (১৯১০–১৯৮৭), অধ্যাপক আলী আহমদ, আবদুল লতিফ চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানে নূতন করিয়া নবীন উৎসাহে সাহিত্যচর্চা শুরু হইয়াছে। ইতোমধ্যেই কলিকাতার 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'সওগাত' ঢাকা হইতে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'দিলরুবা', 'মাহে-নও' নূতন মাসিক পত্রিকা হইলেও এখন একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। 'আজাদ', 'সংবাদ', 'ইত্তেফাক', 'মিল্লাত' প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকা এবং 'বেগম', 'সৈনিক', 'কাফেলা' প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

(ঙ) কতিপয় বিশিষ্ট লেখক

পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাক-আজাদী ও আজাদী-উত্তর, এই দুই যুগের সন্ধিস্থল রূপেও কতিপয় সাহিত্যিক বর্তমান। ইঁহারা যুক্ত-বঙ্গেই সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সাহিত্যিক দান নানা দিক হইতেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইঁহাদের মধ্যে এই কয়জনের নাম করা যায় :

১। **আবদুল গফুর সিদ্দিকী** (১৮৭৫–১৯৫৯) :– ইনি এখন প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে এন্তেকাল করিয়াছেন। এখনও মধ্যে মধ্যে ইঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। পুঁথি-সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বে ইঁহার দান বিশিষ্ট। তাঁহার সম্প্রতি-প্রকাশিত 'বিষাদ-সিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি' মূল্যবান গ্রন্থ।

২। **মৌলনা মুহম্মদ আকরম খাঁ** (১৮৬৮–১৯৬৮) :– ইনি খ্যাতনামা রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। সাংবাদিকতায় তাঁহার দান পশ্চিমবঙ্গ ভুলিতে পারিবে না, পূর্ব-পাকিস্তানও নহে। তাঁহার 'মোস্তফা-চরিত', 'মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য', 'উম্মুল-কেতাব' ও 'আমপারার তফসীর' বাংলা ভাষার ইসলামী সাহিত্যে এখনও অতুলনীয়। 'সমস্যা ও সমাধান' গ্রন্থটিও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৩। **ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ** (১৮৮৫–১৯৬৯) :– ইনি প্রধানতঃ বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। ভাষাতাত্ত্বিক হইলেও অনুবাদ, ছোট গল্প, গবেষণা, সমালোচনা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে আজীবন কৃতিত্বের সহিত লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁহার দান বিশেষ মূল্যবান। তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলা-সাহিত্যের কথা' ও 'বিদ্যাপতি-শতক' অতি মূল্যবান পুস্তক।

৪। **ইব্রাহীম খাঁ** (১৮৯৪–১৯৭৮) :– রস-রচনা ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখায় ইঁহার কৃতিত্ব অধিক। নাট্যকার হিসাবে তিনি গোড়ায় 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার পাশা' লিখিয়া সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিলেও, এখন ভ্রমণ-কাহিনী ও ছোটগল্প লেখায় অধিকতর প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন। অবশ্য নাটক তিনি এখনও লেখেন, 'কাফেলা'-ই তাহার প্রমাণ। প্রবন্ধ রচনায়ও তাঁহার হাত মন্দ নয়; তবে তাহাতে প্রজ্ঞার চেয়ে আলাপের ভাগই যেন অধিক। তাঁহার 'হীরক-হার' একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

৫। **মুহম্মদ বরকতুল্লাহ্** (১৮৯৮–১৯৭৬) :– ইনি মূলতঃ প্রবন্ধকার। তাঁহার ভাষা মধুর ও বলিষ্ঠ। 'পারস্য-প্রতিভায়' তিনি পারস্য-সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে একজন দার্শনিক, 'মানুষের ধর্মে' তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি এখনও প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

৬। **বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ** (১৯০৮–১৯৬৩) :– আমাদের মহিলা গদ্য-লেখিকাদের মধ্যে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। প্রাক্-পাকিস্তান যুগে ইনি 'পুণ্যময়ী', 'রোকেয়া-জীবনী', 'বেগম-মহল', 'শিশুর শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রতি-প্রকাশিত 'আমার দেখা তুরস্ক' সরস ভ্রমণ-কাহিনী।

৭। **আবুল ফজল** (১৯০৩–১৯৮৩) :– লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-শিল্পী ও ঔপন্যাসিক; নাটক রচনায়ও ইঁহার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি প্রাক্-আজাদী যুগে 'মাটীর পৃথিবী' ও 'আয়শা' নামক গল্পগ্রন্থ, 'কায়েদে আজম' নামক নাটক প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী এখনও অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে 'চৌচির', 'সাহসিকা', 'প্রদীপ ও পতঙ্গ', 'জীবন-পথের যাত্রী' এবং নাটকের মধ্যে 'একটি সকাল', 'আলোকলতা' ও 'প্রগতি' প্রসিদ্ধ।

৮। **আবুল মনসুর আহমদ** (১৮৯৮–১৯৭৯) :– ইনি রচনা করেন কম, কিন্তু খ্যাতি অর্জন করেন অধিক। তাঁহার 'আয়না' ও 'ফুড্ কনফারেন্স' অত্যন্ত চমৎকার ব্যঙ্গ-রচনা। 'সত্য-মিথ্যা' ও 'জীবনক্ষুধা' নামে তাঁহার দুইখানা উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। 'সত্যমিথ্যা' উপন্যাসখানি ইংরেজী গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে রচিত।

৯। **বন্দে আলী মিয়া** (১৯০৬–১৯৭৯) :– তাঁহার কবি-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ঔপন্যাসিক, গাল্পিক, নাট্যকার ও শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেও খ্যাতি তাঁহার আছে। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার 'ময়নামতীর চর' ও 'অনুরাগ' নামক দুইখানি কাব্য, 'আমানুল্লাহ্' নামক নাটক, 'অস্তরাগ' ও 'বয়সের দাবী' উপন্যাস বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১০। **কাজী কাদের নওয়াজ** (১৯০৯–১৯৮৩) :– কবি হিসাবে ইনি বিশেষ খ্যাতনামা। তাঁহার 'মরাল' একখানি চমৎকার কাব্য। তিনি এখনও নানা সাময়িক কাগজে পাকিস্তানের পট-ভূমিকায় কবিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার 'হারানো টুপি'-র মতো কবিতা বাংলা-সাহিত্যে বিরল; কবি রবীন্দ্রনাথও এই কবিতাটি তৎসম্পাদিত সঙ্কলনে স্থান দিয়াছেন।

১১। **আবদুল কাদির** (১৯০৬–১৯৮৪) :– ইনি কবি, ছান্দসিক, সাহিত্য-সমালোচক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তি। তাঁহার প্রতিটি লেখায় বৈদগ্ধ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁহার 'দিলরুবা' নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য। 'কাব্য-মালঞ্চ' নামে তৎসম্পাদিত কাব্য-সঞ্চয়নটি সুধী-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি তৎসম্পাদিত 'কাব্য-বীথি' আজাদী-সংগ্রাম ও পাকিস্তান-আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কবিতার সঙ্কলন। তিনি এখনও সময় সময় কবিতা লেখেন। মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া থাকেন।

১২। **বেনজীর আহমদ** (১৯০৩–১৯৮৩) :– নজরুল ইসলামের অনুকারীদের মধ্যে কবি বেনজীর আহমদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ

মহকুমার 'ইল্‌মদি' গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার 'বন্দীর বাঁশী' ও 'বৈশাখী' কাব্যে নজরুলের অনুসরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'ইসলাম ও কম্যুনিজম' নামে তাঁহার একটি প্রবন্ধ পুস্তকও আছে।

১৩। **মাহবুব-উল-আলম** (১৮৯৮–১৯৮১) :– ইনি প্রধানতঃ গাল্পিক ও গৌণতঃ ঔপন্যাসিক। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তিনি মধ্যে মধ্যে বিচরণ করেন। তাঁহার 'মোমেনের জবানবন্দী' সাহিত্য হিসাবে অনবদ্য হইলেও উপন্যাস নহে; ইহা লেখকের জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনার অপূর্ব বর্ণনা মাত্র। 'মফিজন' তাঁহার উপন্যাস-ধর্মী বড় গল্প। 'তাজিয়া' ও 'পঞ্চঅন্ন' গল্পসঞ্চয়ন। তাঁহার 'পল্টন-জীবনের স্মৃতি' বেশ উপভোগ্য গ্রন্থ। 'গোঁফ-সন্দেশ' তাঁহার কয়েকটি ব্যঙ্গ রচনার সমষ্টি; এতদ্ব্যতীত, তিনি 'বর্মার হাঙ্গামা' ও 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' রচনায়ও এক সময় মন দিয়াছিলেন। তিনি এখনও গল্প ও আলাপ-আলোচনা-মূলক বিষয়ে নামজাদা লেখক।*

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, আজাদী-উত্তর যুগে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতেছে। এখানকার প্রাকৃতিক, ভাষা-তাত্ত্বিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ পশ্চিম-বঙ্গ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক বলিয়া এখানকার সাহিত্য পশ্চিম-বঙ্গ হইতে নানা দিক দিয়া কালক্রমে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়িতে বাধ্য। ভবিষ্যতে পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্য পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য হইতে পৃথক হইয়া এক নূতন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঐতিহ্য সৃষ্টি করিবেই। ইতিমধ্যে কয়েক বিষয়েই এই প্রবণতা দেখা দিয়াছে। যতই দিন যাইতে থাকিবে, ততই এই বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট হইতে থাকিবে। এমনও হইতে পারে যে, কাজী নজরুল ইসলামের মতো একজন অসাধারণ প্রতিভাবান কবি ও সাহিত্যিক অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানে আবির্ভূত হইয়া এখানকার সাহিত্য-ধারায় এক নূতন বৈপ্লবিক-পরিবর্তন আনয়ন করিবেন।

---

*মৃত্যু-সনগুলো সংযোজিত হল।

নাম-সূচী